কালী প্রসঙ্গে কালী পরিকল্পনা

ভবানী মুখোপাধ্যায়

জ্ঞানোদয়

১০/২ বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট

কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারী ১৯৬৩

প্রচ্ছদ : সুবোধ দাশগুপ্ত

জ্ঞানোদয়ের পক্ষে শ্রীমতী রত্না রায় কর্তৃক ১০/২ বি, রমানাথ
মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯ থেকে প্রকাশিত ও জগন্নাথ
ঘোষ, নিউ রামকৃষ্ণ প্রেস, ৬৩এ/২ হরি ঘোষ স্ট্রীট,
কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত

সূচিপত্র

□□□ কোন্ শালা বলে দেশে দুর্ভিক্ষ নাই রে □□□

'তোমার হাতে যদি কেউ একটা বন্দুক তুলে দেয়, তুমি সেই বন্দুক দিয়ে কি করবে ?'

আমার প্রথম প্রশ্নটা শুনেই রামদেও মুড়ি চিবোনো বন্ধ করলো। তারপর বোধহীন জ্বরকাতর একটি দিনের মতো চোখদুটি তুলে জবাব দিল 'দুশমন কো খতম কর দুঙ্গা।' তাহলে রামদেও এরও দুশমন থাকতে পারে। আমি কথাটা নোট করে নিলাম। রামদেও ঠোঙা থেকে একটু একটু করে মুড়ি বের করে চিবোতে থাকে। আমি ওকে এক ঠোঙা মুড়ি খেতে দিয়েছিলাম। আমি অনল বসাক সাপ্তাহিক 'বিবর্তন'-এ সবে কাজে ঢুকেছি। দুমাস হলো। আমার কাজ বিভিন্ন বিষয়ে মানবিক আবেদনে সাড়া জাগাতে পারে এমন ফিচার লেখা।

আড়ালে ডেকে নিয়ে চড়ারোদ দুপুরবেলায় রামদেও-এর একটি সাক্ষাৎকার নিচ্ছিলাম। রামদেও থাকে বড়বাজারের পোস্তা পেরিয়ে একটা গলির মুখে। কিছু দূরে রেল লাইন। প্রশ্ন এগিয়ে নিয়ে যাই, বলি 'কারা তোমার দুশমন ?' আশ্চর্য এমন সুন্দর জবাব দিতে পারে রামদেও। জবাবটা বাংলা করলে এরকম দাঁড়ায়ঃ যাদের হাতে বন্দুক আছে, জমি আছে, থানাপুলিশ আছে, তারাই আমার দুশমন।

আবার প্রশ্ন, 'কেন ওরা তোমার কি ক্ষতি করেছে ?' হিন্দী-বাংলা মিশিয়ে রামদেও উত্তর দেয়, 'তাহলে শুনিয়ে বাবুজী। আমি বিহারী। জমিদার গঙ্গানারায়ণ হামলোক কা গ্রাম জ্বালিয়ে দেয়। আর শালা দুবলা সিং মহাজন হামলোক কা বাস্তু জমি জবরদস্তি কেড়ে নেয়। আর ঐ বেটা অর্জুনপ্রসাদ হামলোক কা নেতা, কহা থা হামাকে চাকরি দিবে। চাকরি না দিবে, তবু গ্রাম জ্বালানো কা লিয়ে হামারা নাম মিছা মিছা পুলিশে বলিয়ে দেয়। জো শুনা, হাম দেশ মে ভাগকে চলা আয়।'

রামদেও তারপর তার অতীত জীবনের ইতিহাসের কপাট একটু একটু করে পুরোটাই খুলে দেয়। ভিতরে প্রবেশ করেই দেখি সামনেই রামদেও। ওর চোখদুটো জ্বলছে। চোখে রাগ ক্রোধ ঘৃনা। চোখের আগুনে ইতিহাসের অন্ধকার খুপরি ঘরটা উজ্জ্বল।

আমার নাম রামদেও। ছোটবেলা থেকেই বাবার সাথে আমি গঙ্গা-নারায়ণের বেনামী জমিতে চাষ করতাম। একদিন বিনোবা ভাবেজী আমাদের গ্রামে এলেন। গঙ্গানারায়ণ কিছু বেনামী জমির দানপত্র বিনোবা ভাবেজীর হাতে তুলে দিলেন। সে সময় অনেক ফটোর আলো জ্বলে উঠে

ছিল। সাংবাদিক সংবাদ টুকে নেয়। বিনোবাজী সেই জমি বিলি করলেন। যাদের জমি নেই, তারা জমি পেল। আমরাও পেলাম। কিন্তু একবছর যেতে না যেতেই গঙ্গানারায়ণ ঐ জমিতে কাউকে চাষ করতে দেয় না। আমার চোখের সামনে এইসব দৃশ্য, গঙ্গানারায়ণের হাসি, বিনোবার না-হাসা মুখের ছবি, সাংবাদিকদের ব্যস্ততা, সাফারি জিনস্-পরা ফটোগ্রাফারদের কায়দা, চকমকি প্যান্ডেল, মাইক, প্রশংসামূলক বক্তৃতা ইত্যাদি যেন খড়ির গুঁড়া তিসিব তেল সহযোগে প্রস্তুত পলস্তারা। আমাদের গ্রাম্য নেতা অর্জুন সিং-কে গ্রামের ভূমিহীন চাষিরা নালিশ করে।

নালিশ, প্রাচীন আমগাছ, ফল ফলায় না। তবু অর্জুনপ্রসাদ আমার কাছে আসে। আসে অন্ধকার রাতে। এসে বলে 'ভাই গান্ধীব চেলা ভাবিস নে, লড়াই করে জমি রেখে দেব। সবাইকে বলে দিস। তোর কথা, তোর বাপের কথা গ্রামের মানুষ মান্য করে।' অর্জুনের এই কথাগুলো অন্ধকার ছিনিয়ে নেয়। 'কে গান্ধীর চেলা?'—রামদেওর আত্মজীবনী শুনতে শুনতে তন্ময়তা থেকে বেরিয়ে এসে প্রশ্ন করি।

গ্রামের লোক আমাকে গান্ধীর চেলা বলে ডাকতো। একসময় আমি সর্বহারা মানুষদের বোঝাতাম, ভাই লড়াই করে কিছু আদায় করা যায় না। অহিংসার পথেই সব কিছু আদায় করতে হবে। অহিংসার পথেই আমরা গঙ্গা-নারায়ণের বেনামী জমির দখল নেব। কিন্তু একটা দল আমার কথা শুনলো না। তারা জমি চষতে গেল। দাঙ্গা শুরু হলো। গ্রামে আগুন লাগলো। গঙ্গানারায়ণের লোক মরলো। আমাদের লোক মরলো। পুলিশ এলো। গ্রামের পুরুষদের ধরে নিয়ে গেল। কয়েকজনের নামে খুনের মামলা আনা হলো। আমি পালিয়ে এলাম। আমার বাবা দাঙ্গায় মারা গেল। আমাদের বাস্তু পুড়ে গেল। জমি চলে গেল। বাকি খাস জমি দুবলা সিং নিয়ে নিল।

দুবলা সিং ভারি শয়তান। বাবা মারা গেলে শালা দুবলা বলে কিনা আমার বাবা ধার রেখে গেছে। সুদে আসলে মিলে কয়েক হাজার টাকা। সব মিছা কথা। বাবা আমাকে মারা যাবার সময় বলে গেছে। বলে গেছে, দুবলাকে তিনশটাকা দিয়ে দিবি। তালেই জমি খালাস পাবি। কিন্তু জমি খালাস করতে পারলাম না। গুন্ডাবাজী করলে হয়তো থাকতে পারতাম, পেট চালাতে পারতাম। কিন্তু আমাকে গ্রামের সবাই গান্ধীর চেলা বলে, জোচ্চরী করতে পারবো না। তারপর এই কলকাতায় চলে এলাম। আমাদের গ্রামের কিছু লোক এই দাঁত নড়বড়ে বস্তিতে থাকে। আমিও থাকি সিমেন্টের চত্বরে শুই। বর্ষায় কষ্ট পাই।

শুনেছিলাম কলকাতায় কাজের অভাব নেই। দেখলাম মিছা কথা। মাথায় বোঝা তুলতে গেলাম, হঠাৎ কোথা থেকে একটা লোক ছুটে এসে আমাকে ধাক্কা

মেরে বোঝা তুলে নিল। বোঝা তোলার লোক শুনি এখানে ঠিক করা থাকে। এদের আবার ইউনিয়ন আছে। যে কোন কাজের জন্য ঘুরলাম। কেউ আমাকে নিল না। তবু চলে যায়, একা লোক। কেউ ডাকলে কাজ করে দিয়ে আসি। ডাক আসে।

রামদেও ধীরে ধীরে ইতিহাসের কপাট বন্ধ করে দেয়। আমি অনল বসাক রামদেও সম্পর্কে যাবতীয় জীবনবৃত্তান্ত নোট করে 'চলি রামদেও' বলে ইতিহাসের দুয়ার পেরিয়ে চলে আসি আশি দশকের কলকাতার জুতো আটকানো দুপুরের রাস্তায়। রামদেওকে নিয়ে মনে মনে একটি রংদার সাক্ষাৎকার তৈরী করি দুপুরের রাস্তা পেরিয়ে একটি নির্জন চায়ের দোকানে বসে যা হয়ে ওঠে কখনও বাস্তব, কখনও অবাস্তব, কখনও কাল্পনিক। রামদেও, তুমি কোন্ রাজ্যের লোক ?

ম্যায় বিহার প্রদেশ কা আদমী।

তোমাদের গ্রামে নদী আছে ?

মেরা গাঁও মে কৈ নদী নেহি।

রামদেও, তুমি খুব ভোরে পাখির ডাক শোন ?

হ্যাঁ জী।

কোনদিন সূর্য উদয় দেখেছো ?

ইয়াদ নেহি।

তুমি কোনদিন গান করেছো ?

হ্যাঁ জী, হাত মে পতাকা লেকে মিছিল মে বহুৎ গানা গায়া থা।

তুমি কোনদিন ভালবেসেছ ?

হ্যাম্ এক লেড়কি সে সাদি করনা চাতাথা। লেকিন হামারা কাম ভি নেহি, জমিন ভি নেহি। উসলিয়ে লেড়কি চলি গয়ি।

তোমার কি ঐ একটা জামা ?

হ্যাঁ জী। এ জামা পিন্‌কে হ্যাম দেশ ছোঁড়াথা।

শীতকালে কি করো ?

জারে মে কাঁপ রহেতা হ্যাঁয়।

কোন মাসে তোমার ভীষণ কষ্ট হয় ?

বরিশ মে। রাস্তা, বারান্দা সব ভিগ্ যাতা হ্যাঁয়। খানা নেহি মিলতা।

তোমার জামাটার কি রঙ ছিল ?

সবুজ।

তুমি কবে দেশ ছেড়েছ ?

এক বরষ।

তোমার পরনের কাপড়টাতো সব জায়গাতেই ছেঁড়া।

এ কাপড়া পিন্ কো হ্যাম দেশসে ভাগ কে আয়া।

তুমি স্নান কর ?

কভি কভি ।

তুমি কতোক্ষণ ঘুমোয় ?

নিদ্ আতা হ্যায় থোরা থোরা

স্বপ্ন দেখা ?

দেখ্তা ।

কিসের স্বপ্ন ? বল রামদেও ।

এক থালা গরম ভাত কা সপ্না ।

তোমরা তো ভাত খাও না ।

বহুৎ বিহারী আদমী ভাত খাতা হ্যায় ।

রামদেও তোমাকে আর বিরক্ত করবো না । আমার আর দুটি প্রশ্নের জবাব দাও । তুমি এ ভাবে বেঁচে আছ কেন ?

এক থালা ভাত কে লিয়ে

ঐ তো শালপাতায় ভাত দেখছি ।

এক আদমী দিয়া ।

আমার কলম থামে । চায়ের দাম দিয়ে বাসরাস্তায় । সেখান থেকে দাঁড়িয়ে দেখি রামদেও একটা টিনের কৌটো নিয়ে গামছা পরে বোধহয় ফুটপাতের ধারে গঙ্গার জলে স্নান করতে যাচ্ছে ।

আমি বাস স্টপে গিয়ে দাঁড়াই । মনে মনে ভাবছি আজই ফিচারটা বিবর্তনে' জমা দেব । জমা দিলেই ত্রিশটা টাকা । পেলেই মাংস খাব । বহুদিন মাংস খাই না । মিতালি আজ দাঁড়াবে । সরাসরি স্কুল থেকে চলে আসবে । মিতালি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়ায় । অল্প বেতন । আমার খিদে পায় । বাস আসে না । ভাবি, ফিচারটার নাম দেব, রামদেও এর জীবনবৃত্তান্ত এবং মনোহর সাক্ষাৎকার । নির্জন দুপুরটা রোদের যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে অবশ হয়ে পড়ে আছে আমার চোখের সামনে । অবশ দুপুরকে সাজিয়ে তুলেছে তিন জন মহিলা, দুজন তরুণী, দুজন যুবক, আরেকজন এ্যালকোহলিক সুঠাম দেহী বয়স্ক ভদ্রলোক । এবং আমি । এ কজন ছিলাম বাসস্টপের আশেপাশে । নীবক্ত দুপুরে শাসন না-মানা স্তন, জিনসের টাইট প্যান্ট এবং কানচাপা চুল, গেঞ্জির বুকে ব্রুস লীর পৌরুষ, মহিলার চওড়া খোলা কোমরে বিন্দু বিন্দু ঘাম, বয়স্ক ভদ্রলোকের হাতে দামী এ্যাটাচী এবং চোখে হাল্কা রঙের সোনালী ফ্রেমের দামি চশমা—এইসব অলংকার আমার মনে হয় ক্ষুধায় কাতর অবশ দুপুরকে সাজিয়ে রেখেছে ।

বাসস্টপের কাছেই শনিঠাকুরের ঠেক । সেখানে দশ পয়সা ছুঁড়ে দিয়ে দুহাত কপালে ঠেকিয়ে আমার পাশে এসে দাঁড়াল ময়লা ধুতি পাঞ্জাবী পরা এক

বাঙালী ভদ্রলোক। মেয়েদুটো আর ছেলেদুটো এখন আর দুহাত তফাতে নেই। খুবই কাছাকাছি। একটি মেয়ের কথা শোনা যায়, টিকিট পাব না। দ্যাখ বিশ মিনিট দাঁড়িয়ে আছি। এখনও বাস আসছে না।' একটি যুবক উত্তর দেয়, 'আমরা আছি! ঠিক ম্যানেজ করে দেব।' কথা শুনে হাসে একটু ওদের দিকে তাকিয়ে দুটো মেয়েই। তারপর একটি মেয়ে বলে, 'ট্যাক্সি হলে চলে যাওয়া যেত।' দুটি যুবকের চোখ মুখ ম্লান হয়। বোবা চোখে ইশারা হয়। ট্যাক্সী, সিনেমার টিকিট, তারপর মেয়েদুটোকে খাওয়ানো, ইত্যাদি ব্যাপারগুলোর জন্য যত অর্থের প্রয়োজন তা ওদের নেই ওরা এবার মেয়েদুটোর কাছ থেকে সরে আসে। ঠিক এ সময় এ্যালকোহলিক সুঠাম দেহী প্রৌঢ় ভদ্রলোক হাত তুলে ট্যাক্সি থামায়। মেয়েদুটোর দিকে তাকিয়ে ইশারা করে। ভদ্রলোক দরজা খুলে ভিতরে ঢোকে। মেয়েদুটো এগিয়ে আসে। সবাইকে শুনিয়ে বলে, 'একটা লিফট্ দেবেন প্লিজ, এসপ্লানেড।' ভদ্রলোকের দাঁড়ি গোঁফ কামানো মসৃণ টান্‌টান্ মুখে পাকা টস্‌টসে হাসি। 'আসুন' বলেই ট্যাক্সির পাল্লা খুলে দেয়। বেকার যুবকদুটি এসব দেখে 'শালা বানচোৎ' গাল দেওয়া ছাড়া আর কিছু করার সামাজিক ক্ষমতা অর্জন করতে পারে নি।

আ! ঠিক সে সময় দুপুরের নরম নীরবতার পোষাক টেনেহিঁচড়ে ছিঁড়ে ফেলে খুলে নের এক মোটর বাইকের তীব্র শব্দ। বাসস্টপের বিপরীত ফুটে আচমকা ব্রেক শব্দ তুলে বাইক থেমে যায়। বাইক থেকে নেমে যুবক মাথার হেলমেট্টা পেছনে বসা আটোসাটো জীনস আর ঢোলা হলুদ সার্ট পরা যুবতীর হাতে দিয়েই দুবার শব্দ তোলে, ওয়াক, ওয়াক।' প্রায় এক থালা ভাতের সমান ভাত, মাংসের টুকরো পেটের থলে থেকে বমি হয়ে বেরিয়ে আসে। বাইকের পেছনে বসা যুবতী দুবার হাত দিয়ে স্যাম্পু করা ওড়া চুল পেছন দিকে ঠেলে দিয়ে হাই তোলে। কথাগুলো টুকরো টুকরো করে বলে, 'সুমন তোমাকে আমি বারবার বারণ করলাম এই গরম দুপুরে পেগ টেনো না। তবুও শুনলে না।' পুনরায় শব্দ করে বাইক চলে যায়।

তারপর স্বাধীন ভারতের হঠাৎ এক বিচ্ছিন্ন দৃশ্য আমাকে এমন ঘুষি মারল যে আমার আহত মুখের ভাষা মুহূর্তে ছিনিয়ে নিল কলকাতার এই ভয়ানক প্রাগৈতিহাসিক দৃশ্যটি। ময়লা ছেঁড়া শার্ট, সুতো ফ্যাসে যাওয়া চেক লুঙ্গি এবং ঘাড়ে গামছা একটা মানুষ, অর্থাৎ একজন উদ্বৃত্ত ভারতীয় নাগরিক বমিটার কাছে হাঁটুগেড়ে বসে খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে মাংসের টুকরো এবং ভাত। পানের দোকান থেকে দুপুরের সংবাদ, এখন ভারত পৃথিবীর বিশটি দেশে চাল সরবরাহ করছে। ভারত এখন খাদ্যে স্বয়ম্ভর।

হঠাৎ দেখি রামদেও, একটু আগে যার সাক্ষাৎকার নিয়ে এসেছি, ওকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে বমি-খাওয়া ভিখিরীটার গলা চেপে ধরেছে।

আমি তখনি ছুটে যাই। বলি, 'রামদেও ওকে ছেড়ে দাও। ওতো তোমার মতই খেতে পায় না।' বলেই রামদেওকে ছাড়িয়ে আনি। রামদেও আমার হাত ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করে। বলে, 'হ্যাম উস্‌কো নেঁহি ছোড়েঙ্গা। ও হামারা দেশওয়ালী আদমী। হ্যাম উসকো মালুম হ্যায়। হ্যামকো সাথমে আও।' বলেই দুর্ভিক্ষপীড়িত খিদের মানুষটাকে টানতে টানতে নিয়ে যায় নিজের ফুটপাথের আস্তানায়। আমিও ওদের পিছু যাই। দেখি রামদেও নিজের ভাত থেকে অর্ধেকটা ওকে খেতে দেয়।

আর আমার মনে তখনি এক রাগী যুবক হঠাৎ জেগে উঠে চেঁচায়, 'কোন্ শালা বলে দেশে দুর্ভিক্ষ নাই বে। এ যে মশাই, এই দৃশ্য দেখে এখনও যারা দাঁড়িয়ে আছেন, যারা বসে আছেন, যারা ঝিমোচ্ছেন, যারা মেয়েছেলের শরীরের স্বপ্ন দেখছেন, শুনুন এক রাগী কণ্ঠস্বর। আমি শুনতে পাচ্ছি, তা আপনারা শুনতে পাচ্ছেন না? শুনতে পাচ্ছেন না, 'কোন্ শালা বলে দেশে দুর্ভিক্ষ নাই বে?'

হ্যাঁ এরপরও বাস আসে। আমাদের নিয়ে বাস চলে যায়। দৃশ্য পিছনে পড়ে থাকে। আমি 'বিবর্তন' অফিসে গিয়ে সাক্ষাৎকারটার নাম বদলে 'কোন্ শালা বলে দেশে দুর্ভিক্ষ নাই বে' রেখে সম্পাদকের টেবিলে জমা দিতে যাই। গিয়ে দেখি সম্পাদকমশাই তখন মোগলাই পরোটা ও মাংস দিয়ে টিফিন সারছেন। আমি 'দুঃখিত' বলে ঘর থেকে বেরিয়ে আসি। আমি আমার টেবিলে বসে আরেকবার আর্টিক্যালটা পড়ি। দু একটা শব্দ পাল্টাই। আমার খিদে পেয়েছে, সেহেতু আর দেরি না করে আবার সম্পাদকের চেম্বারে যাই। 'বসুন' বলেই আর্টিক্যালটা পড়তে থাকে। আমি চুপচাপ বসে থাকি। ত্রিশটাকা পাবতো? ভাবি। সম্পাদকের মাঝে মধ্যে দাঁতখোচা লক্ষ্য করি। সম্পাদকের পড়া শেষ হয়। তিনি বলেন, 'চমৎকার। বমি-খাওয়া ঘটনাটা বিচ্ছিন্ন হলেও, এই দৃশ্যটা দেশে দুর্ভিক্ষ চলছে প্রমাণিত না হলেও পাঠক চমৎকার খাবে।' বলেই তিনি আর্টিক্যালটার মাথায় কি যেন লিখে একটি সই করে বললেন, 'নিয়ে যাও কম্পোজ সেকশনে। এ সপ্তাহেই বেরোবে।' আমি হাত বাড়িয়ে লেখাটা ধরি। তারপর বলি, 'অশোকদা, বলেছিলেন আজ কিছু টাকা দেবেন।' 'আজ নয়, আগামীকাল।' অশোকদা আমার মুখের দিকে না তাকিয়ে বলেন। আমার ভেতরের অনল বসাক বলতে পারলো না অশোকদা আমার খিদে পেয়েছে। টাকাটা দরকার।

আন্তর্জাতিক ছোটগল্প ॥ ১৯৮২

□□□ হার্ট-অ্যাটাক □□□

শালা আ অলকেশ, পত্রিকার ত্রিশটা টাকা মেরে দিল। এতো কষ্ট করে একটা লিটল্ ম্যাগাজিন চালাচ্ছি—দেখছে, বুঝছে, তবু টাকাটা দিচ্ছে না, ঘোরাচ্ছে। এক বছর হতে চললো, শুধু ঘুরেই ঘাম ঝরাচ্ছি। টাকার কথা তুললেই মেয়েছেলে প্রসঙ্গে চলে যায়। শালা-আ অলকেশ, বলতে লজ্জা করে না, 'মাগীর পেছনে মাসে আমার খরচ দুশো টাকা।' পোদে মারবো দু'লাথি। কি করে তুই বড়াই করিস 'আমার মেয়ে দুটোতে লেটার নিয়ে ফার্স্ট ডিভিশনে পাশ করেছে। ওতে তোর ক্রেডিট কি রে? তুই তো মদ মেয়েছেলে আর টাকার গোলামী করে বেড়াচ্ছিস। ভিটামিন ট্যাবস্ খেয়ে পঞ্চাশের কাছাকাছি ঝুনো গতরটাকে হাতীর মতো ধরে রেখেছিস। আসলে ক্রেডিট যদি পাওয়ার থাকে, মেয়ে পাবে। তোর স্বভাব জানলে মেয়েটা আত্মহত্যা করতো রে ছুঁচো কোথাকার। আজ যদি টাকা না পাই শালা-আ, তোর পিতৃত্বের মুখোশ খান্ খান্ করে দিয়ে আসবো তোর মেয়ের কাছে।

গ্রীষ্মের রোদ্দুর আমার মনে গরম জল ঢেলে দিচ্ছে। ফলত ক্রোধের চিন্তাগুলো শুয়োরের বাচ্চার মতো বৃদ্ধি পাচ্ছে। ঘটনাটা হচ্ছে কি, আমাদের একটি লিটল্ ম্যাগাজিন আছে। পনের বছর আগে আমরা পাঁচজনে মিলে গল্প-কবিতা-প্রবন্ধ-সমালোচনার ত্রৈমাসিক পত্রিকা বের করেছিলাম। উদ্দেশ্য ছিল আমরা বড় কাগজে যাব না। লিখবো না। পণ্য হবো না। গোলামী করবো না। উদ্দেশ্যছিল অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে সুস্থসংস্কৃতি, যে সংস্কৃতি শোষণভিত্তিক সমাজের বিরুদ্ধে লড়াই করে—এমন সংস্কৃতি গড়ে তুলবো। দশ বছর চালাবার পর আমাদের দুজন সদস্য বিয়ে করে চলে গেল এস্টাব্লিশমেন্টের চোরাগলিতে। আমরা তিনজন এখনও আছি এবং দিন গুণছি কবে আমরা দধীচিতে পরিণত হবো। অলকেশ আমার অনেক দিনের বন্ধু। সে নানারকম লোহার পাইপের অর্ডার সাপ্লায়ারের কাজ করে। ওর কোম্পানীর নাম অরবিন্দ এণ্টারপ্রাইজ। আমাদের কাগজ 'দিক নির্দেশ'-এ সে দুবার বিজ্ঞাপন দিয়েছে। প্রথমবারের টাকাটা চেকেই পেমেণ্ট করেছে। দ্বিতীয়বারের টাকাটা ঘোরাচ্ছে।

গ্রীষ্মের প্রচণ্ড উত্তাপ সরে যেতেই বুঝলাম নেতাজী সুভাষ রোডের দালানের পাশ দিয়ে ছায়াঘেরা ফুটপাথ ধরে চলে এসেছি ডালহৌসী এরিয়ার অলকেশের ছোট চেম্বারটায়। ব্রিটিশ আমলের নড়বড়ে কাঠের সিঁড়ি ডিঙিয়ে দোতলায় এই ছোট্ট চেম্বারে এক বছরে যে কতবার গেছি তা গুণে রাখলে হয়তো ক্রোধের গালাগালটা অশ্লীলতার সীমা ছাড়িয়ে আমাদের 'দিক-নির্দেশের' উদ্দেশ্যটাই পাল্টে যেত।

আজও যখন ওর ছোট্ট চেম্বারটায় গিয়ে দাঁড়ালাম, তখন একঘেয়ে নির্লিপ্ত ভদ্রলোকের গলায় অলকেশ বললো—বোস্। টেবিলে রাখা মোমের আলো যথেষ্ট আলো ছড়াতে পেরেছে এই ছোট্ট চেম্বারটায়। একটা লম্বা টেবিল পেছনে একটা আলমারী এবং সামনে পাশে পাঁচটি চেয়ারেই চেম্বারটা ফুরিয়ে গেছে। আমি বসতেই নে ধর' বলেই অলকেশ একটা হাত পাখা এবং সাথে সাথেই দামি সিগারেট অফার করে। আমার সামনের চেয়ারে জ্বলন্ত সিগারেট হাতে একজন বয়স্ক ভদ্রলোক বসে আছে। ওকে এক নজরে দেখে নিয়ে অলকেশের হাতের চেটোয় ঢাকা আগুনে ধরিয়ে নিই আমার সিগারেট। সিগারেট ধরিয়ে প্যাট হয়ে চেয়ারে বসে একটা টান মেরে বলি –'আজ দিবি তো ?' আমার কথা না শোনার ভান করে এবং গুরুত্ব না দিয়ে অলকেশ সিগারেটের ছাই ঝেড়ে আমার সামনে বসা ঝিমোনো ভদ্রলোকটিকে আমার সম্বন্ধে বলছে—'আমাব বন্ধু প্রিয় বসু। প্রিয় বসু ফ্যানটাসটিক কবিতা লেখে। প্রিয়র একটি বিখ্যাত কবিতার লাইন শোন—'ম্লান মেঘের বেড কভার/ঢেকে দেয় ব্রিশের তনুশ্রীর/দগ্ধ কুমারী শরীরটাকে।' প্রিয়, ওর নাম কনক বিশ্বাস। প্রেসিডেন্সির ব্রিলিয়ান্ট ষ্টুডেন্ট ছিল। ইংরাজীতে অনার্স।' ভদ্রলোকের দিকে ফিরে তাকাই। নমস্কার জানাই। প্রতি নমস্কার পাই না। বলি পুনরায় অলকেশকে—'এক বছর হয়ে গেল। কাগজটা নিয়মিত বের করতে পারছি না। টাকাটা দে।'

অলকেশ সিগারেটের ছাই ঝেড়ে আবার শুরু করে—'প্রিয় একটা নামী লিটল্ ম্যাগাজিনের সম্পাদক বুঝলি কনক। থাকলে একটা কপি দেনা কনককে। বিজ্ঞাপনের সোর্স আছে। ও খুব কবিতা পছন্দ করে। সেদিন বুঝলি প্রিয়, আমার মেয়েকে জীবনানন্দ দাশের রূপসী বাংলা বোঝাচ্ছিলাম। আঃ, কি সুন্দর কবিতা রে। যেন আস্ত বাংলা দেশটা আমার বুকের ভেতর উঠে এসেছে।'

আমি ওর কথায় কান না দিয়ে খুব ব্যস্ত হয়ে পুনরায় স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি —অলকেশ বিজ্ঞাপনের টাকাটা। অনেক ঘুরেছি, আর নয়।

অলকেশ খুবই স্বাভাবিকভাবে এড়িয়ে গিয়ে বলে — জানিস কনক, প্রিয়র বাবা একজন প্রফেসর। ইকনমিকসের উপর অগাধ পাণ্ডিত্য। একবার দিল্লী থেকে সরকার প্ল্যানিং কমিশনে পাঠিয়েছিল। স্টেটসম্যান-এ তুই প্রিয়র বাবার লেখা নিশ্চয়ই পড়ে থাকবি।'

কনক আমার বাবার নাম জানতে চাইলে আমি সংক্ষেপে জবাব দেই - 'সুনীতি বসু। আপনি কি করেন?' কনক বিশ্বাস চোখের পাতা কুঁচকে দেয় –'Importers of Carbon from West Germany. তারপর কিছু কিছু জিনিস তৈরী করি যেমন ধরুন ব্রাশ হোল্ডারস্, স্প্রিংস এসব আর কি।'

আমি কনক বিশ্বাসের ব্যবসা সংক্রান্ত বিষয় কিছুই বুঝতে পারলাম না। তবে এটা আন্দাজ করতে পারলাম বিদেশী ব্যবসায়ী বিনিয়োগের সাথে এর সম্পর্ক আছে। গত বছর আমাদের কাগজে এ বিষয়ে একটা প্রবন্ধ বের হয়েছিল 'ভারতে বিদেশী পুঁজি'। প্রবন্ধের অংশ ঃ

১৯৬৪ থেকে ১৯৭৪ এই দশবছরে ভারতবর্ষে সরকারী এবং বেসরকারী খাতে মোট বিদেশী ঋণ ৮,৯১১ কোটি টাকা হয়েছিল। এই বৈদেশিক সাহায্য আমাদের দেশে দুভাবে আসে ঋণ এবং অনুদান হিসেবে। এই বিদেশী সাহায্য বিনিয়োগ হয় প্রধানত সরকারী উন্নয়ন প্রকল্পগুলিতে। এ ছাড়া বেসরকারী ও যৌথ উদ্যোগের ক্ষেত্রেও এই বৈদেশিক সাহায্যের একটা অংশ নিযুক্ত হয়। এসব বিদেশী সাহায্য আসে মূলত আমেরিকা, পশ্চিম জার্মানী, জাপান, বৃটেন, সোভিয়েত রাশিয়া এবং বিশ্বব্যাঙ্ক থেকে যা প্রধানত আমেরিকার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

কনক বিশ্বাস ঘড়ি দেখে অলকেশকে বলে —'আমরা তো তিনটের উঠবো। তিনটে তো বাজে। উঠে পড়।'

আমি পুনরায় স্মরণ করিয়ে দেই—'আজ টাকাটা দিবি তো?' এবার অলকেশ চেয়ার ছেড়ে উঠে বললো—'আরে দেবো, দেবো। আজিই দেবো। এখন চ, আমাদের সাথে। মমতার ফ্ল্যাটে আড্ডা মেরে আসি। লোডশেডিং। কাজ করতে ভাল্ লাগছে না। সাড়ে চারটার মধ্যে আবার ফিরে আসতে হবে কনক।' কনক সিগারেটটা এ্যাসট্রেতে গুঁজে দেয়। চেম্বারের বাইরে এসে আমরা সবাই দাঁড়াই। অলকেশ চেম্বারে তালা লাগাতে লাগাতে বলে—'জানিস্ প্রিয় মমতা ডিভোর্সী মহিলা। পাঁচ বছর হলো ওদের ডিভোর্স হয়েছে। একটা মেয়ে আছে। লরেটোয় পড়াশোনা করে-থিন্-তে। ল্যান্সডাউন রোডে নিজেদের ফ্ল্যাটে থাকে। মমতার মা বাবা কেউ নেই, একাই। ফ্যানটাস্টিক চেহারা। তোর ভাল লাগবে।'

তবুও আমার মনের পর্দায় মমতার শরীর ভেসে ওঠে না। শুধু একটা কৌতূহল আমাকে টানছে। লোক-ভীড় রাস্তায় নেমেই দেখি কনক বিশ্বাসের প্রাইভেট কার। ভিতরে ড্রাইভার। গাড়ির দরজা খুলে কনকবাবু প্রথমে, তারপর অলকেশ, শেষে আমি। অলকেশ হাত বাড়িয়ে দরজা বন্ধ করে।

'ল্যান্সডাউন রোড'—গাড়ি স্টার্ট নেবার সাথে সাথেই কনকবাবু বলে দেয়। অলকেশ বলে—'জানিস প্রিয়, কনকের বয়স কিন্তু আমাদেরই মতো পঞ্চাশের কাছাকাছি। টাক্ পড়াতে আমাদের চেয়ে বেশি বয়স বলে মনে হয়। ওর ছেলে ডাক্তারী পড়ছে। জয়েন্ট এন্ট্রেন্স প্রথম দশজনের মধ্যে একজন হয়েছে।' কনককে উদ্দেশ্য করে পরে অলকেশ বলে—'তুই তো তখন থেকে ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে কথা বলছিস। পানীয়ের মাত্রাটা কমিয়ে দে। এ্যালকোহলিক ফ্যাট শরীরের

পক্ষে খুবই খারাপ। তোর গিন্নীর মেজাজের খবর কি?' অলকেশের কথা শুনে ভোঁতা দৃষ্টি মেলে কনক ছলাৎ ছলাৎ শব্দের মতো কথা বলে—'আমার আর ভাল্ লাগছে না অলকেশ সামন্ত। ফ্রাসট্রেশনের বন্দীশালা থেকে আমি মুক্তি চাইছি। এতো পয়সা কামাচ্ছি তবুও স্ত্রীকে কাছে পাই না। দিনরাত ঘুরে বেড়াচ্ছে, মারকেটিং করছে খুশীমতো। কোথায় যাচ্ছে, কি করছে কিছুই বুঝতে পারছি না। ওর ঐ আগুনের মতো উজ্জ্বল শরীরের খিদে সে কোথায় মেটায়? আমার কাছে একমাস আসে না, অলকেশ। কিছু বলতে গেলেই তর্কাতর্কি শুরু হয়ে যায়। চরম অশান্তি, দিনের পর দিন বাপের বাড়ি পড়ে থাকে। ছেলেমেয়েরা এখন বড় হচ্ছে, আর ভাল্ লাগে না। কাল অলকা রাত নটায় ফিরেছে। মনে হল যেন ড্রিংক করেছে। ভাবলাম কিছু বলি। বলতে পারলাম না। মেয়েটা পড়ছিলো। সবই সামলে নিলাম। এলিয়টের 'ওয়েস্ট ল্যাণ্ড' টেনে নিয়ে পড়তে লাগলাম।' কনকবাবু পরিবেশটা শোক মিছিলের মতো গম্ভীর করে তুললেন। সেই গম্ভীর পরিবেশে অলকেশের গলার স্বর যেন আরও ভারী মনে হল 'আমরা একটু একটু করে যেন খুবই আপনজনদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছি। গোটা সমাজ ব্যবস্থাটাই যেন এলিয়েনেশনে ভুগছে।'

কনক চোখ বুজে বলছে—'আমার এই মুহূর্তে মনে পড়ছে জাঁ পাল সার্ত্রের স্মরণীয় উক্তি His enemy neighbour one is MAN·· he has been transferred by man into a convict for their use. আজ মানুষের মনে তীব্র সন্দেহ আর হতাশা। সমাজ পরিবার এসবের প্রতি অবজ্ঞা আর বিতৃষ্ণা। আমাদের মধ্যে ভালবাসাবোধও নেই ঘৃণাবোধও নেই। সব লোপাট। পরিবর্তে আমাদের মধ্যে কেনাবেচার সম্পর্ক গড়ে উঠছে।' অলকেশ পুনরায় সিগারেট ধরিয়ে বলে—'আসলে কনক, আমরা সবাই এণ্টি-লাইফ লিড্ করছি।

গাড়ি ছুটছে। দেয়ালের শ্লোগান ''বেকার ভাতা, বেকার বৃদ্ধি, ধর্মঘট, হরতাল, ময়দানে জমায়েত, মালিকের শোষণ, শ্রমিকের আন্দোলন'' সট্ সট্ সরে যাচ্ছে। আবার কখনও যানজটে পড়ে যেন হাওয়ার বিরুদ্ধে গাড়ি চলছে। তখনই ভালভাবে নজরে আসে ফুটপাথের পরিবার। ঘরের ঝুলের মতো এদের বৃদ্ধি। এ সব পেরিয়ে ল্যান্সডাউন রোডের সামনে এসে কনক বিশ্বাসের গাড়ি দাঁড়ায়। পাশেই ব্যালকনির নিচে এক ফুটপাথ পরিবার। তিনটি মেয়েছেলে। দুজন উকুন বাছে। একজন চুল আচড়াচ্ছে, সাজগোজে ব্যস্ত। তিনজন শিশু। হাতে ওদের রুটির টুকরো। একজন মরদ ঘুমোচ্ছে। এদের ডিঙিয়ে পথচারীরা যাচ্ছে, আসছে। আমরা তিনজন ওদের ডিঙিয়ে যে অ্যাপার্টমেণ্টের সামনে দাঁড়ালাম তার দরজায় সাটা মিসেস সাহা।

এজেণ্ট : গোল্ডেন ফিনান্স কর্পোরেশন।' তাহলে কি এখানেও বিদেশী পুঁজির লেনদেন চলে? আমার আবার 'দিক-নির্দেশের লেখাটার কথা মনে পড়ে।

এক। ব্যবসায়ী বিনিয়োগের প্রায় পুরোটাই আসে বিভিন্ন বিদেশী বেসরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান থেকে. সেগুলোর মধ্যে প্রধান হল বিভিন্ন একচেটিয়া বহুজাতিক কোম্পানী।

দুই। আমাদের দেশে কারিগরী সহযোগের ক্ষেত্রে বিদেশী বিনিয়োগকারীদের প্রভাব কাজ করে ঋণ মারফৎ এবং কারিগরী সরবরাহ সংক্রান্ত চুক্তি মারফৎ। কারিগরী 'সহযোগ'-এর ক্ষেত্রে বিদেশী বিনিয়োগ নিযুক্ত হয় পুরোপুরি 'ফিনান্স' হিসাবে।

তিন। এভাবে বিদেশী পুঁজির উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়লে বিপদ বাড়তে পারে। কারণ বিদেশী ঋণের কাছে দেশের প্রতিটি নাগরিকের মাথার মূল্য একশ সত্তর টাকা. একাশি সাল পর্যন্ত হিসেব ধরলে :

অলকেশ কলিং বেল বাজায়। খানিকটা সময় যায়। আমি পা নাচাই। অলকেশ রুমাল বের করে ঘাড়-মুখ মোছে। ওর বালকি বাড়িতে ঘাম ঝরে বেশি। কনক হাতের আঙুল ফাটায়। কপাট খোলে মিসেস সাহার কিশোর নেপালী। আমরা ঢুকে যেতেই দরজা বন্ধ হয়ে যায়। সোফা. কোচ্. ডিভান দিয়ে সাজান সামনের ঘরটা। জয়পুরী কাজ করা দামী পিতলের স্ট্যাণ্ডিং ল্যাম্পের সুন্দর ঢাকনার আড়াল থেকে আলো বের হয়ে আসছে। ওর মাথার উপর ছুটন্ত ঘোড়ার ওয়েলপেন্টিং। পেন্টিং-এর নিচে লেখা আছে প্রেজেণ্ট বাই কি একটা সিগ্নেচার করা. দূর থেকে স্পষ্ট বোঝা গেল না। মনে হয় বোম্বে ডাইং বা মফৎলালের ভারি পর্দা। এসব চাদর দিয়ে সাজানো ঘরটা।

এক বৃদ্ধ বসে পেস্তাবাদাম. ছোলা. ডিমভাজা খাচ্ছে। সামনের এ্যাটাচ্ড্ টেবিলে মদের বোতল এবং গ্লাস। বৃদ্ধ লোকটিকে আমি লক্ষ্য করছি। বৃদ্ধ লোকটির আসল দাঁত নেই, নকল দাঁত। মাথায় চুল নেই, নকল চুল। শ্রবণ শক্তি নেই. কানে হিয়ারিং। দৃষ্টি শক্তি নেই. চোখে পাওয়ার ফুল চশমা। মেদের উপর মেদের চাপে বৃদ্ধের শরীরটা ছোটখাটো একটা চালের বস্তার মতো। নিশ্চয়ই বড়দরের ব্যবসাদার বা শিল্পপতি। যখন অন্য ঘরের ভারী পর্দা সরিয়ে মমতা হাল্কা হলুদ রঙের পাতলা সিফনের ম্যাক্সী পরে বসার ঘরটায় ঢোকে, তখন বৃদ্ধের জড়ানো কণ্ঠস্বর শোনা যায়। 'মমতা. আমি আরও একবার তোমার কাছে যাব। এই নাও আগাম টাকা।'—বলেই বৃদ্ধ বুক পকেট থেকে এক বাণ্ডিল টাকা বের করে তার থেকে একশ টাকার একটা নোট মমতার হাতে দেয়। মমতা সেটা নিয়ে বুকে গুঁজে রাখে। এবং বলে—

'যাবেন। যাবেন'। এখন যা করছেন করুন। এখন তো কারখানায় ধর্মঘট চলছে। কোথায় যাবেন ? বসুন।'

বৃদ্ধ খাচ্ছে। চিবোনোর কট্‌কট্‌ শব্দ শোনা যায়। মাতালরা যেভাবে বলে বৃদ্ধ ঠিক সেভাবে বলে—ইনকাম্‌ ট্যাক্সের আর কাস্টমসের লোকেরা বড্ড ঝামেলা করছে মমতা। তুমি একটু সামাল দাও না, তোমাকে আমি আরও টাকা দেব।

মমতা উত্তর দেয়--সব ঠিক হয়ে যাবে। এখন চুপচাপ বসেন তো। আমার আরও খদ্দের এসেছে।

বৃদ্ধ আবার স্মরণ করিয়ে দেয়--আমি কিন্তু আরেকবার যাব মমতা।

মমতা বৃদ্ধের ঐ কথায় আর গুরুত্ব না দিয়ে বলে--'অনেকদিন বাদে এলে তোমরা।' কনকের দিকে তাকিয়ে—'কি ব্যাপার কি? বিজনেস খারাপ যাচ্ছে? টাকা ধার চাই? কত সুদ্‌ দেবে বল? বিদেশী সাহায্য চাই? বলতো. যোগাযোগ করে দিতে পারি।'

কনক দ্রুত উত্তর দেয়—আপাতত কিছুই চাই না। শুধু তোমাকে চাই। চলো। আয় অলকেশ।

ইতিমধ্যে মমতা একটা সিগারেট ধরিয়ে নিয়েছে, বলছে—তার মানে? দুজনে একসাথে? তা মন্দ হবে না। চলো।

মমতার সিফনের ভিতর সোনার জল ছিটানো শরীরের প্রতিটি ভাজ কথা বলছে, যেন আবৃত্তি করছে রবীন্দ্রসদনে কোন কবির গলায় -'শরীরকে ঘৃণা করো না। যেমন কোন মানুষ খাবারকে ঘৃণা করে না। আমার শরীরকে কিনে নাও। যেমন মানুষ দামী জিনিষ কিনে ঘর সাজায়। তুমিও সাজাও তোমার মনকে' এরকম চিন্তাভাবনায় আমি যখন মগ্ন ছিলাম তখনই শুনতে পেলাম অলকেশ বলছে— তুই বোস প্রিয়। আমাদের হয়ে গেলে তুই যাবি। তোর টাকাটা আমিই দিয়ে দেবো।

আমি উঠে দাঁড়াই। বলি কঠোরভাবে- 'অলকেশ, দেওয়ার ইচ্ছে না থাকলে, স্পষ্ট বলে দিবি দিতে পারছি না। খুশী হবো। কিন্তু পত্রিকার পাওনা টাকায়, আমি মমতার শরীরকে ভোগ করবো, ভাবলি কি করে? আমি চলে যাচ্ছি। আমার কাজ আছে।' আমার ঠাণ্ডা মেজাজে বারুদের কারখানা বিস্ফোরণ ঘটায়। অলকেশ আমার কথার কোন উত্তর না দিয়ে ভিতরের ঘরে চলে গেল। আর তখুনি বৃদ্ধ বলছে আপনার কি পত্রিকা?

আমি একটু বসি বৃদ্ধের সাথে দু-একটা কথা বলার জন্য। প্রশ্ন করি' আপনার কিসের ব্যবসা?'

'সারের। কৃত্রিম সার'—বলেই বৃদ্ধ 'অ্যা' শব্দ তুলে বুকে হাত দিয়ে ঢলে

পড়ে। সোফার ধারে মাথাটা কাত হয়ে যায়। হাত থেকে খাবারের প্লেটটা পড়ে ঝন্ ঝন্ শব্দ হয়। কিশোর নেপালীর কণ্ঠস্বর—'মাইজী, মাইজী।' আমার কণ্ঠস্বর—'অলকেশ, এই অলকেশ।' ভেতরের দরজায় ধাক্কা মারে। খানিকবাদে দরজা খুলে বের হয়ে আসে মমতা, জামা খোলা অলকেশ এবং কনকবাবু। কনকবাবু দ্রুত বৃদ্ধের হাতটা তুলে নেয়। পাল্স দেখে। চারদিকে লাসকাটা ঘরের নীরবতা। অবশেষে কনকবাবু বলেন -'পাল্স পাওয়া যাচ্ছে না।' আর সেই মুহূর্তে লোডশেডিং। অন্ধকারে কারোর মুখে হার্ট অ্যাটাক জনিত কোন উদ্বেগের ভাষা আমি বুঝতে পারি না। চটপট মমতা নেপালী কিশোরের সাহায্যে দুটো মোটাসোটা লাল মোমবাতি জ্বালায়। মুহূর্তে মোমের কিশোর আলো বর্ষার জলের মতো প্রত্যেকের ঝুকে পড়া মুখে বিষণ্ণতা ছড়িয়ে দেয়।

কনকবাবুর মাথা থেকে চিন্তাটা বের হয়ে আসতেই মমতা ছাড়া সবাই ধরাধরি করে শিল্পপতি বৃদ্ধকে দোতলা থেকে একতলায় নামিয়ে আনলাম। রাস্তায় পার্ক করা বৃদ্ধের দামি সাদা মোটর গাড়িতে বসিয়ে দিলাম। বুঝতে পারলাম ক্রমশ বৃদ্ধের শরীর ঠান্ডা হয়ে আসছে। এমনভাবে পিছনের সিটে বসিয়ে দিলাম যেন মনে হয় মদে বেহুশ হয়ে এলিয়ে পড়েছে ভারী শরীরটা। বৃদ্ধের ড্রাইভার প্রথমে কোন সন্দেহ করলো না। কারণ এরকম ঘটনার সাথে সে পরিচিত। তবু সে কনকবাবুর কথা শুনলো—'সোজা হাসপাতালে নিয়ে যাও। শরীর অসুস্থ হয়ে পড়েছে। হাসপাতালে বলবে অফিস থেকে আসছি। রাস্তাতেই অসুস্থ হযে পড়েছেন। বাবুর পরিবারের কথা ভেবে কখনো এ বাড়ির কথা বলবে না। এ বাড়িটা খারাপ মেয়েছেলের বাড়ি। বললে, বাবুব ইজ্জত থাকবে না।' বলেই ওপরের দিকে তাকাল কনকবাবু এবং অলকেশ। দেখল দোতলার ছোট্ট বারান্দায় দাঁড়িয়ে মমতা সিগারেট টানছে। মুখে হাসির কনা। একটু হেসে, কনকবাবু এবং অলকেশ পুনরায় দোতলায় চলে গেল। 'অলকেশ আমি চলে যাচ্ছি আমার কাজ আছে'—বলেই আমি রাস্তা দিয়ে হাঁটতে থাকি বাস ধরার জন্য। ভাবছি কলকাতা শহরের বুকের ওপর দিয়ে একজন মৃত শিল্পপতিকে নিয়ে একটা মোটর হাসপাতালের দিকে ভীড় এবং যানজট ঠেলে এগিয়ে যাচ্ছে। শুনতে পাচ্ছি দিক-নির্দেশের ভারতে বিদেশী পুঁজির শব্দাবলীর কণ্ঠস্বর : ষাটের দশকের প্রথম থেকেই বড় বড় দানবের মতো তেল কোম্পানিগুলি সারশিল্পে বিনিয়োগ করতে থাকে এবং তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে সারের বাজার বাড়ানোর চেষ্টা চালায়।

হঠাৎ এক অন্ধ পথচারীর ধাক্কায় আমার চিন্তাভাবনা কাঁচের মতো ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। আমার চোখের সামনে লম্বা দেয়ালে রাজনৈতিক শ্লোগান বড় বড় অক্ষরে লাল রঙ দিয়ে লেখা 'সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক্।'

একাল ॥ ১৯৮৪

□□□ রক্তের স্বাদ □□□

আগে ভদ্দরনোকেরা বলতো ঝি। এখন সমাজের উপরতলায় হাওয়া পাল্টেছে। ভদ্দরনোকদের গায়ে কমিনিস্টের হাওয়া নেগেছে। এখন বলে, জগাই একটা কাজের নোক দেখে দিতে পার? এখন ঝি-মাগীদের বলে কিনা কাজের নোক। উদেরকে এখন আর বাবুরা ছোটনোক বলে না। কথায় কত দরদ বলে কি না, ওরাওতো মানুষ, গরিব নোক ওরা। এখন উপরতলায় কমিনিস্টের হাওয়া নেগেছে। রাজনীতিঅলা বাবুদের দলে থাকলে এখন অনেক সুযোগ সুবিধা পাওয়া যায়। নির্বাচনে জেতার সুবিধা হয়। অনেকে আবার তাও পায় না। সুযোগসুবিধা পাইয়ে দেবার অনেক রকম কৌশল আছে। জগাই বলে, আমার কারখানা খুললো। আমি আর ঢুকতে পারলাম না। আমার মতো অনেকে ছাটাই হইয়ে গেল। আমার বৌ প্রমীলাকে চাকরি দেবে বলে নিয়ে গেল। অনেক রাতে ফিরে বৌ বললে—ইতর চাকরী দেবে না ছাই! দূর দূর! কাইটে ফেলতে ইচ্ছে করে বাবু-দালালদের। জগাই বলে—কেনরে, কি অইল?' প্রমীলা রাগে উত্তর দেয়—'ও তুমি বুঝবি নি, ধম্মাবতার যুধিস্থির। আমার ঝি-এর কাজই ভাল।' প্রমীলা জগাইকে অশুদ্ধ উচ্চারণে যুধিস্থির বলে। কারণ স্বামী জগন্নাথ মাঝি কারোর সাতেপাচে থাকে না। কোন ধর্মঘটে, কোন আন্দোলনে থাকে না। রাগ নেই, ক্রোধ নেই। সেজন্যই বাপ স্বভাবের সাথে তাল রেখে নাম রেখেছে জগন্নাথ। সত্যি সত্যি ঠুটো জগন্নাথ।

জগন্নাথ ও প্রমীলা সকলের সাথে মিলেমিশে রেল লাইনের পশ্চিম ধারে রেলের জমিতেই যাযাবরদের মতো ছোট ছোট খুপরি বেঁধে অনেক বছর ধরেই আছে। ভদ্দরনোকেরা বলে, ছোটনোকদের বস্তী। রেল লাইন পেরিয়ে পুবদিকে বাবুদের পল্লী। ছোট-বড়-মাঝারি অনেক ধরনের দালান। একতলা দোতলা তিনতলা। আর সরকারী ফ্ল্যাট। বাবুদের পুবের পল্লীতে বাড়ির কাজ প্রমীলার মতো অনেকেই করে। ভোরবেলা যায়, দুপুরে আসে। আবার বিকেলে যায়, সন্ধায় ফেরে। প্রমীলা কাজ করে ঘোষেদের বাড়ি।

ভোর হয় হয়। কারখানার ভোঁ এখনও পড়ে নি। ভোঁ বাজবে ছটায়। তার অনেক আগেই ঘুম থেকে উঠে পড়ে প্রমীলা। চার হাত বাই তিন হাত অন্ধকার খুপরিটার ভেতরে ঘরের কাজ সারে প্রমীলা। প্রথমেই কুপি জ্বালায়। কাজ সারে আর গজরায়, ফুসলায় প্রমীলা। দিনগুলো যত দ্রুত পুজোর দিকে যেতে থাকে তার চেয়ে বেশী দ্রুত ছুটে আস প্রমীলার রাগ, ক্রোধ, ক্ষোভ। গত

বছর ঘোষগিন্নী বলেছিল শাড়ির সাথে সায়া ব্লাউজ দেবে। এ কথা বলে বলে ঘোষগিন্নী মিষ্টি কথায় অনেক বাড়তি কাজ করে নিত। কোন কারণে ফ্ল্যাটের জল বন্ধ হয়ে গেলে এই প্রমীলাই স্নানের জল খাবার জল বাইরে থেকে নিয়ে আসতো। বাড়তি সায়া ব্লাউজ পাবার আশায় বাড়তি কাজ করে শেষমেশ পুজোর দিন দুই আগে একটা সস্তা দামের ডুরে শাড়ি দিয়ে বলে এম-এ পাশ ঘোষগিন্নী—'উত্তমের মা, শাড়িটা নাও। পরে সায়া ব্লাউজটা দেবোখন।' সেই 'পরে' আর এল না। কত মাস চলে গেল ঘোষগিন্নীর মিষ্টি কথা ফুটো করে দিয়ে এবং প্রমীলার ক্রোধকে পাশ কাটিয়ে। কিন্তু সায়া ব্লাউজ আর পাওয়া গেল না। আবার আরেকটা পুজো আসছে। আর একমাস বাকি। এবার যদি মাগী ছেনালি করতে আসে প্রমীলা ঠিক করে রেখেছে, গালাগালে যমের দুয়ার দেখিয়ে দেবে। এই গেল একনম্বর জ্বালা। আর এই জীবনে জ্বালা-যন্ত্রণার শেষ কি আছে। প্রমীলার একমাত্র ছেলে। মরতে মরতে তিনটি সন্তানের পর একমাত্র ছেলেতে এসে ঠোক্কর খেয়েছে! ছেলের নাম উত্তম। নামটা কে রেখেছে প্রমীলাও জানে না। প্রমীলা ভোরের কাজ করে আর রাগে গজরায়, 'আমার ছেলের নাম উত্তম। তায় তোদের কিরে ছেনালির পো। কেন নাগতে আসিস ঝি-মাগিদের ছাওয়ালের সাথে। তোরা তো ভদ্দনোকের বেটা, তোদের নজ্জা করে না ওকে 'দাঁতাল উত্তম, দাঁতাল উত্তম' বলে খেপাতে। না হয় আমার বেটার সামনের দাঁতগুলো উঁচুই। তায় তোদের জ্বালা ধরায় কেনেরে। বেটাটাও হয়েছে বাপের মতো যুধিষ্ঠির। মারের বদলে মার দিতে জানে না। ও রকম ছেলে থাকার চেয়ে না থাকাই ভাল।'

শেষের কথাটা শুনতে পেয়েছে জগাই। কাশতে কাশতে বলে—'আ মলো যা। মাগীর কতা শোন। ভগমানের হাত থেকে একটা ছেলে রক্ষা পেলে, তায় আবার মা হয়ে শাপ শাপান্ত। তুই মর্ মাগী।' প্রমীলা আরও রেগে যায় পতি পরম গুরুর কথা শুনে, 'বলবে না। এই যে মারটা খেয়ে এল, কার এতো অস্ত গেল? উত্তমের, না ঐ ছেনাল মাগীর বেটাগুনোর। উত্তমের মাতায় ব্যান্ডিজ দেখেও নজ্জা করে না। গিয়ে একবার ঘোষবাবুকে বলতে পারলে না?'

প্রমীলা রেগে গেলে ঘোষগিন্নীকে ছেনাল মাগী বলে। প্রমীলা নিজের চোখে দেখেছে, দেওর আর দেওরের বন্ধুর সাথে ঘোষগিন্নীর শারীরিক কেলোর কীর্ত্তি। মুখেতে মিষ্টি ভাষা, গতরে গরল ঠাসা। বলিহারী যাই, ছেনাল মাগী তোর রঙ্গরস দেখে।

ছেনাল মাগীর দুছেলে গতমাসেই 'দাঁতাল উত্তম দাঁতাল উত্তম' বলে খেপাতে খেপাতে মাথায় মারল ইট। রক্ত বের হল। ঘোষগিন্নীই ছুটে গিয়ে তুলো দিয়ে মাথা পরিষ্কার করে পেনিসিলিন ট্যাবলেট খাইয়ে মাথায় ফেট্টি বেঁধে

দিলে। বাঁধছিল আর ঘোষগিন্নীকে বলছিল—'সত্যি তোমার ছেলের দাঁতগুলো এতো অস্বাভাবিক উঁচু দেখলে ভয় করে, ঘেন্নাও করে। কোনদিন দাঁত মাজে না।' হলদে ছোপ দাঁতের একতিল জায়গাতেও ফাঁক রাখেনি। উত্তমের নোংরা দাঁতে আর লালায় যেন কুকুরের বিষ লেগে আছে। দাঁত মাজনের পয়সাও দিয়েছিল। প্রমীলা সেই পয়সায় অন্ধকার খুপরির জন্য কেরোসিন কিনে ফেলেছে।

প্রমীলা কাজ করে আর গজরায়। আমরা ওতো বোকা নই। তোমরা ভেবেছ, আমার ছাওয়ালকে দয়া দেখালে। আসলে থানা পুলিশের ভয়ে, ইজ্জতের ভয়ে তোমরা এসব করেছো। ঘোষগিন্নী আছ সুখে। কত্তা ঘুষ খাচ্ছে, কালোটাকার পুঁজি বাড়াচ্ছে, আর তুমি দেওর আর দেওবের বন্ধুকে নিয়ে ছেনালি করছ। তোমরা হুজ্জতি চাইবে কেন? আহা, লোকদেখানো দরদ। লোকে বলবে ঘোষগিন্নীর গরিবের প্রতি কত দরদ। কিন্তু মাগী আমি তো জানি—মুখে মিষ্টি ভাষা, গতরে গরল ঠাসা। প্রমীলা এভাবে ফুসলায়। কারখানায় একটা কাজ পেলে, ঘোষেদের কাজটায় মুতে দিয়ে বের হয়ে আসবো! মা-ছেলের পেটটাব জন্য এতো জ্বালা, যন্ত্রণা কিন্তু প্রমীলা তো জানে এসবের চেয়ে মস্ত যন্ত্রণা পেটের খিদে। পেটের খিদে এমন যে ছেলের মাথা ফাটা দেখেও, মুখ বুজে সহ্য করে। কিন্তু রাগে ক্রোধে ছেলেকে বলতে ছাড়ে না—'যুধিষ্ঠিরের পোলা যুধিষ্ঠির, তুই মারতে পারলি না রে। তুই কি চিরকাল, এভাবেই মার খেয়ে মার খেয়ে বাবার মতো জীবন কাটাবি।'

আসলে প্রমীলা এসব শোনাচ্ছে জগাইকে। কারখানায় সবাইকে নিল। মালিক নিল না জগাইকে এবং আরও কয়েকজনকে। অথচ এই জগাই সাতেও থাকে না, পাঁচেও থাকে না। মালিকের কোন স্বার্থেতে ক্ষতিতে কাজে লাগে না জগাই। এমন কি ইউনিয়নের সাথে মিলেমিশে লড়াই করতেও এগোয় না। এককথায় নিরীহ, গোবেচারী। আর একেই কিনা চিরকালের জন্য বরখাস্ত। আর তারই ছেলে উত্তম বাপের মতো হয়েছে। জগাই শুয়ে শুয়ে নিয়মিত বৌয়ের এসব কথা শোনে। আর খক্ খক্ করে কাশে। মাঝে মধ্যে উত্তর দেয়। আবার কখনও কখনও গজর গজর শুনতে শুনতে পুনরায় ভোরের দিকে ঘুমিয়ে পড়ে। অন্ধকার খুপরির মধ্যে কুপির মিটমিটে আলোটা নিবু নিবু হয়ে উঠছে। প্রমীলা কুপিটা নাড়া দিয়ে দেখে, তেল ফুরিয়ে আসছে। তেল যতই ফুরিয়ে আসছে, ততই প্রমীলার কাজের ব্যস্ততা বাড়তে থাকে। এরই মধ্যে আলুর দম আর ঘুগনীর কাজ সেরে ফেলেছে। ছটার মধ্যে ঘোষেদের বাড়ি যেতে হবে। স্বামী লোকটা যে জেগে আছে, খক্ খক্ একটানা কাশির শব্দে বুঝতে পারে প্রমীলা। বুঝতে পারে লোকটা কাশির জন্য রাতে ভালো ঘুমোতে

পারে না। লোকটার জন্য মাবা হয প্রমীলার, স্বামী নামক লোকটার অনেক কিছুই খারাপ লাগে প্রমীলার। কিন্তু একটা স্থানে লোকটা 'পতি পরম গুরু'র মতো প্রমীলার বুকের ভিতর অবস্থান করে আছে। কারণ কোনদিন এই অসুস্থ লোকটা স্ত্রী প্রমীলার নানান অভাব অনটনের মধ্যেও গায়ে হাত তোলে নি। অথচ প্রমীলা নিজের চোখে দেখেছে, ঘোষগিন্নীর গায়ে স্বামী হাত তুলেছে। আর দুঃখ করতে করতে শিক্ষিতা ঘোষগিন্নী প্রমীলাকেও বলেছে: নারী জাতি হিসেবে এই সমাজ ব্যবস্থায় তুই যেখানে আছিস তার চেয়েও নিচে আমাদেব স্থান।

ঘোষগিন্নীর স্বামীর চেয়ে ওর স্বামীর ব্যবহার যে অনেক ভাল,সেটা প্রমীলা ভাল বোঝে। অথচ এরা সবাই প্রমীলাদের মতো বামপন্থীদের ভোট দেয়, সেটাও প্রমীলা ভাল জানে। নিজের সংসারের কাজ শেষ হয়। কাকের ডাক কানে আসে। এবার প্রমীলা উত্তমকে ডাকে। উত্তম শুয়ে আছে বাবার গায়ে পা ছড়িয়ে। মাথায় এখনও ব্যান্ডেজ বাঁধা। ঘা'টা শুকিয়ে আসছে। উত্তমকে ডাকতে গিয়ে প্রমীলার বুকের ভেতর সযত্নে রাখা নিয়মিত দুঃখের দীর্ঘ নিশ্বাস বের হয়ে আসে।

তিনটি ছেলেমেয়ে খেতে না পেয়ে মারা গেছে। একমাত্র এখন এই উত্তমই কলজের জোরে মাতৃস্নেহ ধবে রেখেছে। আহা রে উত্তম, তোকে ঘোষেদের ছেলেরা কত মারধোর করে, তামাশা করে। তুই বাপের মতো চুপটি মেরে থাকিস্। মার খাস্। তুইও কি সোনা আমার বুঝতে পারস, প্রতিবাদ করলে, পাল্টা মার দিলে পুজোর আগে তোর মায়ের কাজটা যাবে। তোর খাওয়ায় টান পড়বে। আমিও ওদেব কিছু বলতে পারি নি যদি কাজটা চলে যায়। আমাদের হয়ে কে প্রতিবাদ করবে সোনা আমার? আমাদেরই করতে হবে।

বাবা শুয়ে থাকে। মায়ের ডাকে, নরম ধাক্কায় উত্তম ঘুম থেকে ওঠে। চোখে মুখে জল দেয়। কুলকুচি করে, দাঁত মাজে না। ময়লা জমেই থাকে। একটু কবে আলু আর ঘুগনি খায়। কুপির আলো নিভিয়ে দিয়ে প্রমীলা জগন্নাথকে বলে—"আমরা চলি গো। তোমার দোকান ঠিক করে বেখেছি।" আলুঘুগনির দোকান দিয়ে বসবে জগাই কারখানার গেটের সামনে সকাল আটটার মধ্যে। কারখানার সকল শ্রমিক জগাইকে ভালবাসে। ভালবাসাটুকুর জন্যই জগাই-এর আলুর দম ও ঘুগনি পড়ে থাকে না। যেহেতু ইউনিয়নের স্বার্থে জগাইকে কাজে লাগানো যায় না, সেহেতু শ্রমিকদের ভালবাসা থাকলেও ইউনিয়নের নেতারা জগাই-এর ছাটাই-এর বিরুদ্ধে উচ্চবাচ্য করে না।

এস্কিমোদের ঘরের মতো ঘর থেকে নিচু হয়ে বের হয়ে এসে বাইরে দেখে

মাতাপুত্র, চাল ধোওয়া জলের মতো চারদিক এখন ফরসা। প্রমীলার মনের মধ্যে অনেকদিন ধরে যে দ্বন্দ্ব চলছে 'যথা, উত্তমের শরীরে অনর্থক অত্যাচারের চিহ্ন। ব্লাউজ-সায়া দেবে কথা দিয়েও কথা না রাখা। বাড়তি কাজ করিয়ে নেওয়া' সেসব পুনরায় চাগিয়ে ওঠে। মনের মধ্যে কে যেন বলে কাজটা ছেড়ে দে, কাজটা ছেড়ে দে। মনের মধ্যে আরেক প্রমীলা ভাবে, ঘুগনি বেচা পয়সায় এক বেলাও তিনটি পেট ভরতি হয় না। একদিকে অত্যাচার ও প্রতারণা, অপর দিকে অনিশ্চিত সংসারের বোঝা ও খিদের কামড়। প্রতিবেশী সংগ্রামী সাথীরা বলে, 'ছেড়ে দে, আমরা তোকে কাজ খুঁজে দেব।' অন্যদিকে স্বামী জগন্নাথ বলে—'আগে পাবি। তারপর ছাড়বি। আমরা গরিব, আমাদের সহ্য করতে হবে।' এসব কাপুরুষের কথাবার্তা শুনলে প্রমীলা রেগে যায়।

রেগে গিয়ে জগাইকে শোনাতে ছাড়ে না—'তালে প্রতিবাদ করবো নি? কেনে উরা নিজেদের ছেলেমেয়েদের শাসন করবে নি। উত্তমতো আগ বাড়িয়ে বলতে যায় নি? আর কেনেই বা উরা কথা দেয়। আমিতো আগ বাড়িয়ে বলতে যাই নি আমায় সায়া দাওগো, ব্লাউজ দাওগো।' তারপর ঘোষগিন্নীব গলার স্বর নকল করে বলে উঠতো—'প্রমীলা তোর কাজ কি সুন্দর, কি পরিষ্কার। এবার পুজোয় তোকে একটা ব্লাউজ একটা সায়া দেব। যাতো দোকান থেকে দুটো কাটলেট নিয়ে আয়। উত্তমকে সাথে করে নিয়ে যা ওকেও কিছু কিনে দিস্। ডাণ্ডি-নণ্টির বাবার বন্ধু এসেছে, যা নিয়ে আয়। তাড়াহুড়ো করতে হবে না।' তিনটের পর বাবুর বন্ধু আসে কেনে, আমরা বুঝি নে? ওসব ভন্দরনোকের বৌদের ফষ্টিনষ্টি, বড়নোক বন্ধুদের কাছ থেকে দামি জিনিস আদায়ের কায়দা। ছেঃ ছেঃ মরে যাই, শরীল নষ্ট করে পয়সা আনা। তুদের আবার পয়সার অভাব! আসলে নোভ। আমাদের ঘরের মেয়েবৌরা না হয় খিদের কামড় সহ্য করতে না পেরে শরীল নষ্ট করে। কিন্তু তুরা? তুরা তো টাকার রাক্ষুসী। মুদের খাটিয়ে ঠকিয়ে ঘুষ খেয়ে দিন দিন টাকা পয়সা জমিয়ে জমিয়ে পাহাড় কবিস। তাপ্পর তুদের নরম শরীল খাটাস্। নজ্জা করে না!

এইসব রাগের কথা ভাবতে ভাবতে, ক্রোধের ফুলকির ছ্যাঁকা খেতে খেতে প্রমীলা আর উত্তম সকাল সাড়ে ছটায় ঘোষবাবুদের নতুন দোতলা বাড়ির সদর দরজার কলিং বেলে চাপ দেয়। প্রমীলা জানে, চল্লিশ বছরের ঘোষবাবু পাজামার গিট লাগাতে লাগাতে দরজা খুলবে। অশ্লীলভাবে তাকাবে। ঠোঁটে আঠার মতো লেগে থাকবে বদমাইশি হাসি। ভন্দরনোকতো! আশায় আশায় থাকে যদি প্রমীলা একটু হাসে। কিন্তু গু-খেকোর বেটা জানে না তো প্রমীলার বুকের ভিতর সর্বদা কিসে তোলপাড় করে। জানেনা তো, প্রমীলার বুকের ভিতর সর্বদা একটা মারমুখো মন ঘাপটি মেরে বসে থাকে।

এরা জানে না, নকশাল আন্দোলনের সময় কি ভাবে বস্তির মেয়ে-বৌরা প্রমীলার নেতৃত্বে পুলিশদের প্রতিরোধ করেছিল। আজও ঘোষবাবু দরজা খোলে। পাজামার গিট লাগায়। অশ্লীলভাবে তাকায়। ঘুম ঘুম গলায় বলে —'তোমার ছেলেটা বুঝি তোমাকে ছাড়া থাকতে চায় না?' একমাত্র 'হু' ছাড়া এ প্রশ্নের আর কোন জবাব না দিয়ে প্রমীলা উত্তমের হাত ধরে ঘোষবাবুকে পাশ কাটিয়ে ভিতরে যায়। উত্তমকে দেখে ঘোষ বিরক্ত হয়।

বিশেষ করে উত্তমের না-মাজা হলদে উচুদাঁতগুলো দেখে। কত বিষ যে জমা আছে ঐ দাঁতে। উনোন ধরাবার কাজ প্রমীলার নয়। তবু মাঝে মধ্যে ধরাতে হয়। উনোনের গ্যাস ফুরিয়ে গেলে নিয়মিত কয়েকদিন তোলা উনোন ধরাতে হয়। মিষ্টি কথায় ঘোষগিন্নী এসব কাজ করিয়ে নেয়। মাঝে মধ্যে নিজের খাবার থেকে ঘোষগিন্নী ভালমন্দ খাবার প্রমীলা বা উত্তমের জন্য সরিয়ে রাখে। প্রমীলা এসব ভালবাসার লক্ষণ মনে করে না। এই সব হয় বাড়তি গতর খাটাবার বিনিময়ে ভাত দেয় না ভাতারে ভাত দেয় গতরে।

উত্তম তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে, ঘোষদের ছেলেরা ব্রাশ দিয়ে দাঁত মাজছে। মুখ দিয়ে বিনাকার মিষ্টি মিষ্টি সুন্দর গন্ধ বের হচ্ছে। মুখ ধোওয়ার পর দাঁতগুলো চক চক করছে। উত্তম নিয়মিত দেখে আসছে এরপর এরা চেয়ারে বসে খাবার টেবিলে দুধ খাবে। ফলের টুকরো খাবে, সন্দেশ বা রসগোল্লা খাবে। উত্তমের মা দুধ গরম করছে। উত্তম দেখে, মা ঘোষের দুছেলের জন্য গ্লাসভর্তি দুধ নিয়ে যাচ্ছে টেবিলে। ওরা কত খায়।

মোটর বাইকের শব্দ শুনলেই প্রমীলা বুঝতে পারে, ঘোষবাবু নিজের কারখানায় যাচ্ছে। ইঞ্জিনিয়ারীং পাশ করে ভাল মাইনের চাকরি ছেড়ে দিয়ে ঘোষবাবু কারখানা খুলেছে নিজেই। প্রমীলার কানে এসেছে, ঘোষবাবু যখন চাকরি করতেন, তখন মোটা টাকার ঘুষ খেতেন এবং অনেক টাকা চুরি করে চাকরী ছেড়েছেন, ঘোষবাবু চলে গেলেই ঘোষবাবুর ছেলেদুটো পড়া ছেড়ে বাড়ির সামনে ছোট মাঠটায় উত্তমকে ডেকে নিয়ে খেলতে চলে যায়। দোতলার ঘরে ঘোষবাবুর ছোট ভাই থাকে। কলেজে পড়ায়। তার ঘরে লেনিন এবং মার্কস সাহেবের ছবি আছে। ভগবান বিশ্বাস করে না। তবে মাদুলী, পলা, পোকরাজ এসবে বিশ্বাস আছে। সে ঘরে বন্ধুদের সাথে ছোট ভাই-এর তর্ক চলছে। প্রমীলার কানে মাঝে মাঝে কথার টুকরো ভেসে আসে যথা কৃষক, শ্রমিক, সংগ্রামী মানুষ, বিপ্লব, আন্দোলন এমন কি প্রমীলার নাম 'এই যে আমাদের ঘরে বাসনমাজার কাজ করে প্রমীলা, ওর কথাই ধর না কেন' ইত্যাদি। ঘোষগিন্নী রেডিওতে রবীন্দ্র সংগীত শুনছে এখন। প্রমীলা বাসন মাজে।

ঘোষদের দুই ছেলে পড়া ছেড়ে বাড়ির সামনের একফালি মাঠটায় খেলা করছে। উত্তমকেও ডেকে নিয়ে গেছে।

প্রমীলার কানে আসে বাতাসে বাতাসে, 'এই উত্তম সিনেমা করবি। সুচিত্রা সেনকে সাথে নিবি। কিন্তু তোর যে দাঁত উঁচু। কি নোংরা রে! বমি আসে। দাঁতাল উত্তম, দাঁতাল উত্তম।' প্রমীলা বুঝতে পারে ঘোষবাবুর ছেলেরা এবং ওদের বড়লোক বন্ধুরা উত্তমের পিছনে লেগেছে। মায়ের মন ভাবতেই পারে যে ওরা হয়তো উত্তমের গায়ে ছোট ছোট ঢিল ছুড়ছে। প্রমীলার মনটা খারাপ হয়। এর কিছুদিন আগেই ওরা উত্তমের মাথা ফাটিয়েছে। প্রমীলার ছেলেটাও হয়েছে তেমনি। বারণ করলেও শোনে না। ঘোষগিন্নী মাঝে মধ্যে ছেলেদের ওপর ওপর ধমক দেয়। মায়ের অভিনয় ছেলেরা বুঝতে পারে।

হঠাৎ উত্তম মায়ের কাছে ছুটে আসে। প্রমীলার বাসন মাজার কাজ তখনো শেষ হয় নি। সামান্য ষ্টিলের চামচও ঘোষগিন্নী রেখে দেয় মাজার জন্য। অর্থের বিনিময়ে গতর খাটিয়ে নেওয়া বুঝতে পারে প্রমীলা। কাঁদতে কাঁদতে বলে উত্তম—'ওরা আবার আমার পিছু নেগেছে মা। আমি খেলব না বললেও শোনে না। মাথায় চাটি মারে।' রাগে দুঃখে ক্ষোভে ধমকে ওঠে ছেলেকে 'তুই মারতে পারিস না। যা ভাগ, এখান থেকে। বাপের মতো হয়েছে ধম্মো পুত্তুর যুধিষ্ঠির।' মুখে বললেও মনে মনে ভাবে, আর কয়েকটা দিন রে উত্তম, পুজোর পরই এবার ছেড়ে দেব। দেখি সায়া ব্লাউজ দেয় কি না। না দিলে একটা হেনস্থা করে কাজ ছাড়বো।

উত্তম পুনরায় মাঠে চলে যায়। চুপচাপ মাঠের কোনায় নিমগাছের ছায়ায় বসে থাকে। তবুও ঘোষগিন্নীর ছেলেরা উত্তমের পিছু লেগেছে। ছেলের গলার আওয়াজ শুনতে পায় প্রমীলা। ঘর পুছতে ঘোষগিন্নীর ঘরে যায়। ঘোষগিন্নী সিনেমা পত্রিকার পাতা ওল্টাচ্ছে। অধ্যাপকের দোতলায় বন্ধু-বান্ধব বসে আছে। ঘোষগিন্নীর এই অধ্যাপক দেওরটির রেকর্ড প্লেয়ার আছে। সে রবীন্দ্রসংগীত শুনছে 'ক্ষম হে ক্ষম'। প্রমীলা ঘোষগিন্নীকে বলে—'তোমার ছেলেগুলান ফের উত্তমের পিছু নাগতে শুরু করেছে। মারধোর করছে।' ঘোষগিন্নী মুখ না তুলে উত্তর দেয়—'এ একটু আধটু হয়েই থাকে। বাচ্চারা বাচ্চারা খেলছে, খেলুক। তারপর ঘোষগিন্নী উঠে বসে। সিনেমা পত্রিকাটি পাশে রাখে, বলে, 'এ বছরটা হচ্ছে আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ। ভাবছি তোর ছেলেকে একটা টেরিকটের প্যান্ট দেবো। হ্যাঁরে প্রমীলা মাথার ঘাঁটা শুকিয়েছে?' প্রমীলা এসব কথার উত্তর দেয় না। গম্ভীর হয়ে শুধু স্মরণ করিয়ে দেয়—'গত বছর বলেছিলেন পুজোয় সায়া বেলাউজ দেবেন। দিলেন কৈ?' ঘোষগিন্নী আবার নরম বিছানায় অর্ধেক শুয়ে সিনেমা-পত্রিকার দিকে চোখ রেখে উত্তর দেয়, 'দেবো রে, দেবো। অতো ব্যস্ত কিসের? শাড়ি যখন পেয়েছিস, সায়া ব্লাউজ পাবি। না হয় আমার একটা পুরনো ব্লাউজই দেবো। তবে আরেকটু পুরনো হোক, তারপর দেবো।'

এসব আজালি কতার উত্তর দিতে ঘেন্না হয় প্রমীলার। ছেঃ ছেঃ। ছেলে ভুলানো মিষ্টি কতার পোদে মার নাথি। ঝেটা মারি তোর কপালে। কাজের বেলায় গলায় মালা। কাজ ফুরালে ঢ্যামনা শালা। গা পিত্তির জ্বলে যায়। কাজ নেই, কম্মো নেই। শুয়ে শুয়ে আলকোটানী ঢেমনী বায়োস্কোপের পাতা ওল্টাচ্ছে লা। এ ভাবেই মনে মনে ফোঁস ফোঁস করে প্রমীলা। এমন সময় প্রমীলা, ঘোষগিন্নী এবং দোতলার দেওর একটা তীব্র চিৎকার শুনতে পায়— 'আঃ গেলুম। ছাড়্ ছাড়্। মা। মা আ আ গো লাগছে গোওও।' ঘোষগিন্নীর ছেলে ডান্ডির গলা না? ডান্ডির বাবা গান্ধীর 'ডান্ডি অভিযান'-এ অনুপ্রাণিত হয়ে ছেলের নাম রেখেছে ডান্ডি। লাফ দিয়ে উঠে পড়ল ঘোষগিন্নী। মা আ আ মাগোও ও উত্তম ছাড়ছে না। উঃ লাগছে। জ্বলে গেল। আর করবো না। ছেড়ে দে উত্তম। তোর পায়ে পড়ি।' হ্যাঁ ডান্ডির গলা। সবাই বুঝলো ডান্ডির গলা। এমন কি করছে উত্তম যে পায়ে পড়তে হবে। ভেবেই এক ছুটে ঘোষগিন্নী সদরের দরজা খুলে মাঠে যায়।

ঘোষগিন্নীর দেওর সেও দোতলা থেকে ছুটে এল সামনের ছোট মাঠটায়। রেকর্ড বেজে চলছে 'ক্ষম হে ক্ষম'। সবাই এক নজরে দেখে নিল, উত্তম ডান্ডির হাতের মাংসটা কামড়ে আছে। কিছুতেই দাঁতের কামড় ছাড়াতে পারছে না ডান্ডি এবং ডান্ডির বন্ধুরাও। নন্টি উত্তমকে মারছে, চুল টানছে, ঠেলে ফেলে দিচ্ছে, কিন্তু কিছুতেই কামড় ছাড়াতে পারছে না। প্রমীলা ছুটে এসে দৃশ্যটা দেখে আর এগিয়ে গেল না। ঘোষগিন্নী ছুটে গিয়ে উত্তমের নোংরা চুলের গোছা ধরে ডানদিকে বাঁদিকে টান মারতে লাগল। তবুও উত্তম মরণ কামড় দিয়ে আছে। আর ডান্ডি চেঁচাচ্ছে—"মা, মাগো, লাগছে, তুমি ওরকম কর না।" অবশেষে ডান্ডির অধ্যাপক কাকু উত্তমের কোমরে প্রচণ্ড এক লাথি মারল। উত্তম ছিটকে পড়ল। আর ঠিক সেই সময় ডান্ডির কাকুর পিঠে এসে পড়ল একটা ঢিল। আশেপাশে আরও রেলের পাথরের ঢিল পড়ছে। পিছন ফিরে দেখে সবাই, লাইনের ওপারে বস্তির একদঙ্গল ছেলে উত্তমেরই বয়সী হাতে ইট, পাথর, ভাঙা কাঁচের গ্লাস, বোতল নিয়ে রেল-লাইনের ধারে দাঁড়িয়ে আছে। ওদিকে নজর পড়তেই, ডান্ডি ও নন্টিকে নিয়ে ঘোষগিন্নী দেওরকে বলতে বলতে "বিষের দাত, শিগ্‌গীর ডাক্তার রায়কে ফোন কর" ঘরে ফিরে গেল। দেওর ঘোষগিন্নীর কথার উত্তর দেয়, 'ছোটবেলা থেকেই বৌদি আমাদের ঘরের ছেলেদের বিনাকা মাখিয়ে মাখিয়ে দাঁতগুলো ভোতা করে ফেলেছ। বড় হলে এরা যে কি করবে?'

প্রমীলা দেখল, ওকে না ডেকেই ঘোষগিন্নী সদরের দরজা বন্ধ করে দিল। অর্থটা স্পষ্ট। কারোর হাত দিয়ে মাসের মাইনেটা পাঠিয়ে দেবে ঠিক। প্রমীলাও ভুলে দ্বিতীয়বার তাকাল না ঘোষগিন্নীর বাড়ির দিকে। সে এখন সন্তানের হাত

শক্ত করে ধরে অনেক দিন, অনেক মাস পর একটু মুচকি হেসে পুত্রকে প্রশ্ন করে—'হ্যারে উত্তম, বড়নোকদের অন্তের স্বাদ কেমন?' অভিজ্ঞ লোকের মতো উত্তম জবাব দেয়—'আমারে মতোই, নোনতা।'

আর কোন কথা হয় না। রেল-লাইনের দিকে দ্রুত হাঁটতে হাঁটতে ওরা এবার খুব কাছ থেকে দেখে, ছোটনোকদের বস্তির নোংরা, পুরো খেতে না পাওয়া উদোম গা বালক-সেনারা তখনও ইট, পাথর ভাঙা কাঁচ হাতে নিয়ে উত্তমকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য দাঁড়িয়ে আছে।

□□□ লক্ষ্মীর কথা □□□

লক্ষ্মীর পাঁচালী অভাব-মুক্তির পাঁচালী। এটি দুঃখমোচনের পাঁচালীও বটে। অন্নের অভাবে মানুষ দিন দিন রোগা হয়। রোগা হতে হতে শক্তিহীন হয়ে পড়ে। তারপর আর উপায় না দেখে মানুষ যা খুশী করে। অন্নের অভাবে নিজের পুত্রকন্যাদের ছেড়ে চলে যায়। পিতামাতা কেউ কেউ মরে। মানুষের পেটে জ্বলতে থাকে দুর্ভিক্ষের আগুন। চল্লিশ বৎসরের রমানাথের কানে বাবার এই কথাগুলো এখনও ভেসে আসে। রমানাথ বস্তির খাটো টিনের ঘরে বসে বিড়ি টানতে টানতে যখন নিজের দিনরাতের অভাবের কথা, দুঃখের কথা ভাবে, তখন বাবার কথা মন কাঁপায়। বাবা কি সঠিক বলতেন, 'লক্ষ্মীর ব্রতকথা প্রতি গুরুবার নিয়মিত পাঠ করলে অন্নের অভাব, জীবনের দুঃখ কষ্ট, হিংসা-বিদ্বেষ, কাম ক্রোধ-লোভ, অহংকার দূর হবে?' কই রমানাথের বৌ লক্ষ্মীতো প্রতি গুরুবার নিয়মিত লক্ষ্মীর পাঁচালী পড়ে, 'যে রমণী ব্রত করে প্রতি শুক্রবারে। অভাব মরিবে সেথায় আমার বরে।' তবুও তো ওর ঘর থেকে অভাব পালায় না। এ কথাটি রমানাথ লক্ষ্মীকে বোঝাতে পারে না।

আজও দুজনের মধ্যে লক্ষ্মীপুজো নিয়ে মাকড়সার জালের মতো রাগ-বিদ্বেষ ও মন কষাকষি। সময়ের ফ্রেমে আঁটা ফেলে আসা দিনের কথা ভাবে রমানাথ। 'বড় কষ্ট রে রমা। পুজো করে আর সংস্কৃত পড়িয়ে দিন আর চলতে চায় না।' ঘরের কোনায় বসে বিড়ি টানতে টানতে আজকের রমা বাবার মৃত-আত্মার জবাব দেয় মনে মনে, 'আমিও বাবা আর কষ্ট সহ্য করতে পারছি না। সাত সাতটা মাস চলে গেল, এখনও কারখানা খুলছে না।' এরপরও লক্ষ্মীর এক জেদ, 'পুজোয় যখন ছেলে মেয়েদের কাপড়চোপড় কিনে দিতে পার নি, অন্ততপক্ষে লক্ষ্মীপুজোর টাকাটা জোগাড় করে লক্ষ্মীপুজোর বাজারটা করে নিয়ে এসো।' কারণ এখনও লক্ষ্মী আশা করে রমানাথের দিন ফিরবে যখন 'দেবীর কৃপায় বহু সম্পদ লভিল। দরিদ্রতা দূরে গেল বিপদ খণ্ডিল।' কত বুঝিয়েছে রমানাথ, 'কি হবে বৌ, হপ্তায় হপ্তায় ওসব পাঁচালী পড়ে। হপ্তায় হপ্তায় তেল-সিঁদুর-ফুল-কলা নকুলদানা এসব কিনতেও তো একশটা পয়সা লাগে। সে পয়সায় আটা কিনলে পেট ভরবে।' না, লক্ষ্মী শোনে না। বলে চোদ্দ পুরুষ পুজো করে এসেছে তোমাকেও করতে হবে। দুঃখের ঘরের প্রবাদ, কষ্ট করো, কেষ্ট পাবে।' রমানাথও ছেড়ে কথা কয় না, 'এ না হলে মেয়েছেলের বুদ্ধি, হচ্ছে কথাটা লক্ষ্মীদেবীকে নিয়ে। চলে এলো কেষ্ট ঠাকুরের কথায়।'

দাওয়া থেকে লক্ষ্মী বেশি কথা বলে না। শুধু বলে, 'চা হয়েছে।' শারদ দুপুরের হাওয়া ঘরে যেন ঢুকতে চায় না। যেমন লম্বা চওড়া মানুষ রমানাথের টিনের ঘরের খাটো দরজা দিয়ে ঢুকতে কষ্ট পায়, তেমনি বাইরের হাওয়াও রমানাথের জালিকাটা জানলা দিয়ে ঢুকতেও যেন কষ্ট পায়। রমানাথই বাইরে আসে। ছেলে মানব বিশপয়সার চা ও গুঁড়ো দুধ এবং দশ পয়সার ভেলি গুড় কিনে আনার পর রোজ বিকেল চারটের সময় লক্ষ্মী চা করে।

লক্ষ্মী আবার পুজোর কথা তোলে, 'আমি যখন পাঁচালী পড়তাম আমায় বলতে নাঃ লক্ষ্মী পাঁচালীতে শুধু ধর্মের কথা নাইরে। অনেক কর্মের কথাও আছে। ''লক্ষ্মীর ভাণ্ডার স্থাপি প্রতি ঘরে ঘরে। রাখিবে তণ্ডুল তাহে একমুষ্টি করে।'' তাই ভাবি কেন তুমি রোজ একমুঠো চাল হাড়িতে চাপাবার আগে সরিয়ে রাখ?'

রমানাথ শোনে। উত্তর দেয় না। চা খায়। সুপ্ সুপ্ শব্দ হয়। লক্ষ্মীর ভাঙাচোরা মুখে শুনশান নীরবতা। ছেলেমেয়েরা বাইরের গলির রাস্তায়। একটা নেংটি ইঁদুর উঠোন পেরিয়ে ঘরে ছুটে যায়। বাইরে দু একটা বাজি ফাটাবার শব্দ। রমানাথের দীর্ঘনিশ্বাস। একটু হাওয়া বয়। এক-টুকরো সাদা পাতা ওড়ে। রমানাথের শান্ত গলা, 'আর চাল সরাবার কথা? সাত মাস কারখানা বন্ধ। তিনমাসের বাড়িভাড়া বাকি। লজেন্স বিক্রির সামান্য পয়সায় এখন একবেলা পেটপুরে ভাতই জুটছে না। তোমাকেও লোকের বাড়িতে সমাজের চোখে ধুলো দিয়ে রাঁধুনির কাজ করে দিয়ে আসতে হয়।'

এসব কথা ভেবেই রমানাথ পুজো তুলে দিতে চায়। দুঃখের এই সময়ে সে সামান্য পয়সাও বাজে খরচ করতে রাজি নয়। কারখানা লক-আউট হওয়ার পর প্রথম প্রথম চাঁদা তুলে কোন রকমে চালাতো। তোলা-আদায় কমে আসতে আসতে এখন আর কেউ দিতে চায় না। ছোট্ট পরিচিত এলাকায় এরকম অসুবিধা হয়েই থাকে। তাছাড়া টিনের কৌটো নিয়ে টিকিট কাটতে আসা রেল যাত্রীদের কাছে লক-আউটের তোলা চাইতে এখন যেন কেমন ভিখিরি ভিখিরি মনে হয় রমানাথের। চেয়ে চেয়ে বাঁচার চেয়ে খেটে খাওয়ার ইজ্জত আছে। তাই রমানাথ ট্রেনের হকারদের সাথে বোঝা পড়া করে নিয়ে একবেলা, তাও আবার দিনের প্রথম ভাগে লজেন্স ফিরি করে।

এইসব ভাবে রমানাথ। চা খাওয়া শেষ হয়। লক্ষ্মী চায়ের কাপ, বাটি ধুতে নিয়ে যায়। রমানাথ দুহাত ভাঁজ করা হাঁটুর উপর লম্বা করে রাখে। নির্বিকার শান্ত গলায় লক্ষ্মীকে যুক্তি দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করে, 'দেবদেবীর পুজো করলেই দুঃখকষ্ট চলে যাবে একথা যেমন বলেছে তেমনি পুজো করে কিছু লাভ নেই এ কথাওতো পাঁচালীতে লেখা আছে। 'ধনজন, সুখভোগ যা

হয় এ ভবে. সকলই শ্রমলভ্য পুজিলে কি হবে ?' ঐ শ্লোকে 'শ্রমলভ্য' কথাটার মানে বোঝো ? মানে হচ্ছে, শ্রম দ্বারা লভ্য বস্তুই মানুষের জীবনে নিয়ে আসে সুখ ভোগ। তোমাদের ঐ সব ধম্মো কম্মো পুজো আচ্চা নয়। অতএব শোন লক্ষ্মী, এবার আর লক্ষ্মীপুজো করতে হবে না।'

বালতির তোলা জলে চায়ের কাপ, বাটি ধুতে ধুতে জবাব দেয় লক্ষ্মী 'পাপ আর ঘরে ঢুকিও না। একবেলা উপোস দিলেই, লক্ষ্মীপুজোর খরচ উঠে যাবে। কালকের চাল ডাল আটার যে কটা পয়সা আছে তা দিয়েই পুজোর বাজার করে নিয়ে এসো '

কথা আর বাড়ায় না রমানাথ। লক্ষ্মী তো বিবাহিত জীবনে রমানাথের কাছে কিছুই চায় নি। ভালো শাড়ি না দুগাছা সোনার চুড়িও না, ভাল সায়া ব্লাউজ না, প্রতি রোববারে মাছ না (মাংসের ভাবনা ওদের নেই) সিনেমা না, থিয়েটার না। শুকনো ডালের মতো ফর্সা হাতে লাল পলার চুড়ি এবং প্লাস্টিকের শাঁখা। গলায় একমাস আগেও ছিল রুপোর চিকন-সরু চেনের হার। সেটাও ধারে না বিক্রীতে গেছে রমানাথ জানে না। বিশাল অভাব শোনতে চায়ও না। রমানাথ ভাবে লক্ষ্মীর জীবন কেটেছে গোছা গোছা কচুর ডালপালা এবং নানান রকম শাক-সব্জী কুটতে কুটতে. খুদ থেকে ধান বাছতে বাছতে ময়লা গম থেকে খড়কুটো কুলোয় ঝাড়তে ঝাড়তে। আর রমানাথের জীবন কেটেছে মিছিলে, ময়দানে. শ্লোগানে. প্রতিবাদে. প্রতিরোধে। এখনও লক্ষ্মীর জীবন এভাবেই কাটছে। এরপরও লক্ষ্মী চায়, কারণ একটা অভাব. দুটো অভাব, তিনটে অভাব, এমনিভাবে শত শত অভাব যখন জীবনটাকে রাইফেলের গুলির মতো ঝাঁঝরা করে দেয় তখনই বোধহয় লক্ষ্মীর মতো মেয়েরা চায় দুঃখময় জীবনটাকে পাল্টাতে। ধর্ম দিয়ে হোক দেহ দিয়ে হোক, নানান রকম ব্রত দিয়ে হোক, বা মিছিল প্রতিবাদ প্রতিরোধ দিয়েই হোক, যেমন করেই হোক জীবনটাকে তারা পাল্টাতে চায়।

রমানাথের এসব ভাবনা-চিন্তা যখন মাথার শিরা উপশিরা থেকে কেঁচোর মতো নিশ্বাস হয়ে নাকের ফুটো দিয়ে বেরিয়ে আসে তখনই নিঃশব্দে টিনের-দাওয়া থেকে বাইরে আসে। বাইরে এখন দুর্বল রোদ। রমানাথ হাঁটে। হাঁটতে হাঁটতে বাজারের কাছাকাছি আসতেই দেখে অফিসের বাবুরা লক্ষ্মীর সরা কিনছে. ছোট কলাগাছ এবং কলা গাছের খোল কিনছে, ফুল-ফল কিনছে। দশকর্ম ভাণ্ডার এবং ভুষিওলার দোকানে সওদা করছে। সর্বত্রই ছোটখাটো ভীড়। বাবুদের দর কষাকষি এবং তক্কাতক্কি। ভেতর থেকে বাজার বাইরে অনেকদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে। তবে সকালের চেয়ে এখন ভীড়টা পাতলা। চারদিকে একটা গৃহস্থদের ঘরের পুজোর হাওয়া বাইরে বেরিয়ে এসেছে। হঠাৎ এই পরিবেশটা রমানাথের চিন্তায় হুল ফোটায়। রমানাথের মনটা যন্ত্রণায়

নেতিয়ে যায়। হু হু হাওয়া বয় বুকের ভেতর। বুকের ভেতরটাকে সেই হাওয়া নাড়া দেয়। বাবার কণ্ঠস্বর মনের হাওয়ায় ভেসে আসে, 'মম ব্রত কর তুমি সংসারে প্রচার। অচিরেই হবে তব বৈভব অপার ॥ পুত্রবধূগণ বশে আসিবে আবার। সুখ শান্তিময় হবে তোমার সংসার ॥'

এই মুহূর্তে উদাসী রমানাথ সুবোধবাবুর গলার স্বরে চমকে যায়। তিনি বলছেন, 'কি রে রমা, কারখানা খুললো?' সুবোধবাবু কমিউনিস্ট পার্টি করেন। পরনে চক্‌চকে পাজামা পাঞ্জাবী। দুহাতে পলিথিনের থলি ভর্তি লক্ষ্মীপুজোর সওদা। বললেন, 'রাতে যাস। খিচুড়ী পায়েস প্রসাদ খেয়ে যাসিস্।' ওসব কথা না শুনে হঠাৎ রমানাথ বলে উঠলো, 'সুবোধদা আমাকে দশটা টাকা ধার দেবেন? কারখানা খুললেই দিয়ে দেবো। সামনের মাসেই, কারখানা খুলছে? মাইনেও কিছু বাড়বে। দাবির তিন ভাগের এক ভাগেতেই য়ুনিয়ন রাজি হয়েছে। আর কষ্ট করতে পারছি না সুবোধদা। আমরাও রাজি হয়েছি।' সুবোধদা হাঁটছিলেন, তবে আস্তে আস্তে। পিছু পিছু রমানাথ। তিনি বললেন 'সাত মাসে লোকের কাছ থেকে কত ধার করলি? শুধবি কি করে? আমার পাঁচ টাকাতো এখনও শোধ করতে পারলি না।' রমানাথের মনে হয় ধার পাবে, এই আশায় এক ঝাঁক উজ্জ্বল শান্তির পায়রার মতো উজ্জ্বলতা রমানাথের মুখে ছড়িয়ে পড়ে। সে বলে 'কথা দিচ্ছি সুবোধদা। কারখানা খোলা মাত্রই আপনার পনেরো টাকা একেবারে শোধ দিয়ে দেব।' সুবোধদা বলতে বলতে হাঁটে, 'নারে রমা, আজ অসুবিধে আছে, দিতে পারছি না।' রমানাথ সুবোধদার কথাগুলো গিলে ফেলে। তারপর থমকে দাঁড়ায়। সুবোধদার এগিয়ে যাওয়া দেখে। কিন্তু সুবোধদা এগোতে পারেনা, রিক্‌সায় ওঠে।

প্রচণ্ড একটা শব্দ ঠিক রমানাথের পেছনে। রমানাথ চম্‌কে পেছনে ফিরে তাকায়। একটা প্রাইভেট কার ব্রেক কষেছে। রমানাথ সট্‌কে বাঁ দিকের ফুটপাথে সরে যায়। একটু এগিয়ে গেলেই গলি। গলির শেষ প্রান্তে হরেনের বাড়ি। বাড়িটার দেয়াল ইঁটের। ছাদ এস্‌বেস্‌টাসের। সেই গলি ধরে হাঁটতে হাঁটতে রমানাথ ভাবে, যদি হরেনের কাছে দশ টাকা পাওয়া যায়। হরেন ওরই সহকর্মী। একই কারখানার শ্রমিক। ওর কাছ থেকে আগেই পাঁচ টাকা ধার নেওয়া আছে। হরেনের স্ত্রী সেলাই এর দোকানে কাজ করে। হরেন আবার কংগ্রেসের লোক। রমানাথ কমিউনিস্ট পার্টি করলেও হরেন রমানাথকে ভালবাসে। কারণ বোধহয় দুজনে একই শ্রেণীর মানুষ। কারণ ওরা দুজনেই ভাল বোঝে ওরা উৎপাদন করছে বলেই, মালিক মুনাফা করতে পারছে। এসব ভাবতে ভাবতে সে হরেনের বাড়িতে আসে। 'হরেন' বলে ডাকে। শুনে হরেনের ছোটমেয়ে সানু বাইরে আসে। রমানাথকে দেখে

বলে, 'বাবা নেই, মা আছে।' লেবুর সরবতের মতো পড়ন্ত দুপুরে হরেনের মেয়ের কথা প্রাথমিক ভাবে গরম চায়ের মতো ছ্যাঁকা লাগায় রমানাথের মস্তিষ্কের গভীরে। তারপর একটুক্ষণ অন্তর-জ্বালা সহ্য করে বলে 'মা কি করছে রে?' সানু উত্তর দেয়, 'আলপনা দিচ্ছে।' হঠাৎ গাছের হাওয়া রমানাথের গায়ে লাগে। হরেনের বাড়ির পাশেই বড় একটা নিমগাছ। নিমগাছের ডালপালার ছায়া রমানাথের সারা শরীরে কাঁপছে। 'চলো' বলেই রমানাথ ভিতরে যায়। গিয়ে দেখে হরেনের বৌ লক্ষ্মীর পা আঁকছে। পাশে একবাটি সাদা চালগুড়োর রঙ। ওর স্ত্রী মুখ না তুলেই বলে, 'কি ব্যাপার?' কোন দ্বিধা নেই, কোন দ্বন্দ্ব নেই, সটান্ বলে ফেলে রমানাথ, 'দশটা টাকার জন্য হরেনের কাছে এসেছিলাম। হবে?' এবারও হরেনের স্ত্রী মুখ তুললো না। হাতের আঙ্গুল দিয়ে লক্ষ্মীর পায়ের আঙ্গুল বসাতে বসাতে হরেনের বৌ উত্তর দেয়, 'আজকের দিনটা না হলে চেষ্টা করে দেখতাম। কিন্তু আজকেতো হবে না দাদা। দু-তিন দিন বাদে অসুন চেষ্টা করে দেখবো।'

রমানাথের মনের মধ্যে তাৎক্ষণিক হতাশা জমাট বাঁধতে শুরু করেছে। কিন্তু রমানাথের প্রতিরোধ রমানাথের পুনশ্চ বলার ভঙ্গিতে পরিষ্কার—'আমার যে খুবই দরকার। আমার যে আজই ভীষণ দরকার। আমাকে পেতেই হবে, চলি।' রমানাথের শরীরের ভিতর ঝড় উঠেছে। রমানাথ দাঁড়ালে শুনতে পেত হরেনের বৌ-এর কণ্ঠস্বর, 'রাতে আসবেন। লক্ষ্মীর প্রসাদ খেয়ে যাবেন।' রমানাথ তখন রাস্তায়। এবার সে কার কাছে যাবে? ভাবতে ভাবতে ঠিক করে যার কাছে এতো কষ্টের মধ্যেও কোনদিন হাত পাতে নি তার কাছে যাবে। তার নাম প্রিয়নাথ। রমানাথের নিজের দাদা, তাহলে লক্ষ্মীর লক্ষ্মীপুজো করার সাধটা পূরণ করা যায়।

হায় রমানাথ! তোমাকে কে ধার দেবে? এ সমাজে ধার যে নেয় তারও যে একটা আইডেনটিটি থাকে। সমাজের দরজার সামনে যক্ষরাজার যে চেলা দাঁড়িয়ে আছে তাকে আইডেনটিটি কার্ড দেখাতে পারলে তুমি রমানাথ ভেতরে ঢোকার অনুমতি পাবে। তুমিতো একজন নিঃস্ব শ্রমিক। তোমার সেই আইডেনটিটি কোথায়? তুমিতো এখন প্রিয়নাথের কাছে যাবে স্থির করেছো, যাও। তোমার দাদা প্রিয়নাথ ব্যাঙ্কে কাজ করে। ব্যাঙ্কের পয়সায় দামি বাড়ি করেছে। একসময়তো তোমরা একসাথে থাকতে। তারপর গরিব ঘরের বদ্যির মেয়ে শ্রীমতী লক্ষ্মীকে বিয়ে করে সংসারের অশান্তি এড়াতে চলে এলে বস্তির ঘরে। যাও, রমানাথ যাও। দ্যাখো একবার চেষ্টা করে, প্রিয়নাথ তোমাকে এই সমাজ ব্যবস্থায় আইডেনটিফাই করে কি না?

রমানাথ একটু দ্রুত হাঁটে। মনে হয় দিন আরও বেশি দ্রুত সন্ধ্যার কাছাকাছি পৌঁছে যাচ্ছে। যদি প্রিয়নাথ দেয় তাহলে লক্ষ্মীপুজোর বাজার করে

□□□ রক্ত গোলাপের চাষ □□□

বিশাল রক্ত গোলাপফুলের জমিটার মাঝের সরু পথ দিয়ে বৃদ্ধ রাসবিহারীর বড় ছেলে বনবিহারী ধীরে ধীরে আসছেন। পায়ে পায়ে আসছে স্প্যানিয়েল, একটা ছোট সাদা কুকুর। হাতে সোনার হাতল লাগানো কালো রঙের তেল চকচকে বাবার ছড়িখানা। বনবিহারীর পেছন পেছন আসছে হরিচরণ। গোলাপ-বাগিচার শ্রমিকেরা লোহার গেটের সামনে দাঁড়িয়ে বড়বাবুর আসার দিকে লক্ষ্য রাখছে। গেটের কাছে আসতেই নিমেষে ছড়ি একবার ঘুরিয়ে বনবিহারী ওদেরকে বললেন—'তালে তোরা আজ কেউ কাজ করবি না?' সুবল সবার হয়ে দ্রুত জবাব দেয়, 'কইরবো। কইরবো না ক্যান? রতিকে কাজে লিয়ে ন্যান। ওর ইট্টুখানি অপরাধ ক্ষমা কইরে দ্যান।'

বনবিহারী সুবলের কথাগুলো মনে মনে ওজন করে বলে—'শুনলি হরি, তোর ছেলে কি বলে। রতি আমার বাগিচার ফুল চুরি করবে যে ফুল বিক্রী করে আমি তোদের অভাব মেটাই, আর আমি কি না ওর অপরাধ ক্ষমা করবো?' সুবল সামান্য ইতস্তত না করেই জবাব দেয়—'রতির মাইনে থিকে টাকা কাইটে ন্যান। কিন্তু ছাটাই করা চলবি না।' এবার একটু রেগে যায় বনবিহারী। ছড়িটা শক্ত করে ধরে। এই ছড়ি দিয়ে বনবিহারীর বাবা রাসবিহারী অনেক শ্রমিককে শায়েস্তা করেছিল একসময়। রেগে গিয়ে সুবলকে বলে—'ছাটাই কি আমি করেছি? নাকি আমি করতে চেয়েছি? শালা তোর বাবাই না আমার বাবাকে চুকলি করেছে, আমার বাবার কান ভাঙিয়েছে। নালিশ করেছে রতির বিরুদ্ধে। তারপরই আমার বাবা আমাকে বললে রতিকে দূর করে দে। নালে কোম্পানি ডকে উঠবে। তুই না শালা, হরিচরণের ব্যাটা। তোর লজ্জা করে না ধর্মঘট করতে?'

রেগে একটানা এতো কথা বলতে গিয়ে বনবিহারী হাঁপায়। সুবল মাথা উঁচু করে সংক্ষেপে জবাব দেয়— বাবা যদি দালালি করে, ছেলেকেও কি তা হতি হবি নাকি বড়বাবু?' বাবার সামনেই সুবল চোখ তুলে বলে।

এমন সময় বনবিহারীর বড় ছেলে নীতু ছুটতে ছুটতে এসে বলে—"বাবা বাবা শিগ্গির ঘরে চলো। ঠাকুরদা অজ্ঞান হয়ে গেছে।'

যাওয়ার আগে মুখ ঘুরিয়ে বনবিহারী প্রশ্ন করে, 'তালে তোরা আজ আর কাজ করবি না? ধর্মঘট করবি?' প্রায় ষোলসতেরো জন খেটে খাওয়া ছেলে-মেয়ে মজুর এককণ্ঠে জবাব দেয় 'রতিকে নিলেই কাজ করতি লাগবো।' নইলে —' আর শুনলো না বনবিহারী। পিতার ছড়িটা একপাক ঘুরিয়ে চলতে

থাকে। পেছনে পেছনে হরিচরণও বড়বাবুর পিছু দ্রুত হাঁটে। মনে মনে সুবলের মঙ্গল কামনা করে।

রতি রাসবিহারী এণ্ড কোম্পানির চার টাকা রোজের একজন মহিলা মজুর : পনের-ষোলটা রক্ত-গোলাপ চুরি করার অপরাধে এককথায় ছাটাই হয়ে যায় রতি। রাসবিহারীর ফুলের বাগিচায় ফুল চাইলে পাওয়া যায় না। অথচ বাইবে থেকে পছন্দ মতো ফুল কেনার পয়সা রতি বা হারুর নেই। কিন্তু আছে ফুলশয্যা রাতের এক আকাশ গভীর স্বপ্ন। সেই স্বপ্নের প্রলোভনে রতি না বলে নিজের হাতে চাষ করা কয়েকটা গোলাপ তুলে নিয়েছিল দারোয়ানের চোখে ধুলো দিয়ে। পারে নি একজনের চোখকে। সে চোখ রাসবিহারীর বিশ্বস্ত অনুচর হরিচরণের, সুবলের বাবা। সুবল ফুল-বাগিচার ইউনিয়নের এখন নেতা।

হরিচরণ কত্তাবাবুর কাছে দালালি না করলে কার বাপের সাধ্যি ছিল যে বুড়োকত্তা রাসবিহারী টের পায়। ক্ষ্যামতা ছিল বুড়োর? আর এ চুরি তো অভাবের চুরি নয়। শখের চুরি। ভালবাসার জন্য চুরি। চুরি করে বাইরে ফুল বিক্রি করে অন্য সব লেখাপড়া জানা বাবুদের মতো তো এরা বাড়তি টাকা ঝাড়ছে না। দিনমান খেটে খাচ্ছে। রীতিমতো গতরখাটা পয়সা। এখন রতির উপায়টা কি? মাত্র বিয়েটা করলো রতি, ভালবাসার বিয়ে। এখন হারুর সামান্য পয়সায় চালাবে কি করে রতি? মনে হতেছি পরভাতী হরিচরণের গলাটা চেপে ধরি ম্যাইরে ফেলি।

এসব ফিসফাস কথাবার্তা এখন চলছে খেটে খাওয়া মানুষগুলোর মধ্যে। ওরা দেখল, বড়বাবু কর্তাবাবুর অসুখের সংবাদ শুনে দ্রুত চলে গেল।

বিশাল দালানের ভিতর দিয়ে অন্দরে প্রবেশ করতেই টুপটাপ বৃষ্টির ফোঁটার মতো টুকরো টুকরো কথাবার্তা বনবিহারীর কানে আসতে লাগলো, যথা, হরলিকস্ খাওয়ার পরই বুকে ব্যথা জাগে। হরিচরণকে ডাকে। হরিচরণ কাছে ছিল না। পরিবারের লোক কাছে আসতেই বলে, ডাক্তার। তারপরই অজ্ঞান হয়ে যায়। বনবিহারী লক্ষ্য করছে ডাক্তারের সকল রকম পরীক্ষা। পরিবারের বিশ্বাসযোগ্য বিলেতফেরত ডাক্তার। রাসবিহারীর দামি পালঙ্কের চারদিকে সবাই দাঁড়িয়ে আছে। রাসবিহারীর পুত্রেরা এবং তাদের স্ত্রী, কন্যাগণ এবং দুতিনজন অনুগত অফিস কর্মচারী। বসতবাটির সম্মুখভাগেই কোম্পানির হেডঅফিস। ছোটখাটো দুটো শাখা অফিস আছে। একটা কলকাতায়, অপরটা শ্যাওড়াফুলিতে। হেডঅফিসটি উত্তরপাড়ায়। ছেলে-মেয়ে স্ত্রী কর্মচারি সবাই ডাক্তারের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। বুকের মধ্যে ধুকপুকানি। ডাক্তারের রায় শোনার আগ্রহ সবার মধ্যে। বনবিহারী ধরেই নিয়েছিল হার্টঅ্যাটাক। ছমাস আগে একবার বুকে যন্ত্রণা হতেই

বনবিহারী বাবার কার্ডিয়লোজি করিয়ে এনেছিল। দোষ পেয়েছিল এবং খুবই সাবধানে থাকতে বলেছিল। বনবিহারী বুঝল, রতির গণ্ডগোলটাই বাবার হার্টকে নড়বড়ে করে দিয়েছে। বনবিহারী কতবার বাবাকে বুঝিয়েছে কোম্পানি নিয়ে তোমার মাথা ঘামাতে হবে না। এখন হাওয়া পাল্টেছে। আমাদের বুঝেসুঝে চলতে হবে। আগের মতো মারমুখো, যখন তখন ছাটাই এসব করলে এখন চলে না। আর ঘটনাটা এমন কিছু বড় নয়।

যতই ডঃ দত্তের পরীক্ষা হতে থাকে ততই বনবিহারী মনে অন্যরকম ভাবে, ছোট ভাই-এর বৌতো আবার খাবারের সাথে বিষ মিশিয়ে দেয় নি? সন্দেহ দানা বাঁধে। বিলেত থেকে ঘুরে এসে ছোট ভাইটি পরিবার থেকে একটু আলাদা হয়েছে। বড়দরের চাকরি করলেও সেই টাকা জুয়াতে মদেতে মেয়েছেলেতে উড়িয়ে দেয়। এসব কারণে বাবা ছোট ছেলের প্রতি বিরক্ত। প্রায়ই বলতো ওর জন্য আমি এক কানাকড়িও রেখে যাব না। আমার সযত্নে তৈরী কোম্পানি ও উড়িয়ে দেবে ওর ব্যাভিচারী স্বভাবের জন্য। ওকে আমি কেন বিলেতে লেখাপড়া শেখাতে পাঠিয়েছিলাম? আশির বুড়ো সর্বদাই অনুতাপ করতো মাতৃহারা কনিষ্ঠ পুত্র সমরনাথের জন্য। উইলের আগেই যদি রাসবিহারীকে মেরে ফেলা যায় তাহলে সম্পত্তির সমান অংশ দুই ভাই দুই বোনের মধ্যে ভাগ হবে। বনবিহারী ভাবে, এরকম মন্দ অভিলাষ কি সমরনাথের স্ত্রী রমার মধ্যে আছে। থাকতেও পারে। ধনী পরিবারের মেয়ে রমা এ যুগের শিক্ষিত পরিবারের শিক্ষিত মেয়ে। ওদের ভালবাসার বিয়ে। রমার স্বভাবচরিত্তও ভাল নয়। বড্ড বেশি স্বাধীন। আজকাল এই মেয়েদের স্বাধীনচেতা স্বভাবের রাংতা দিয়ে চরিত্রহীন শব্দটাকে মোড়ানো হয়েছে অর্থাৎ বাহারে রাংতার প্যাকেটের মধ্যে চরিত্রহীন শব্দটা পুরে রাখা হয়েছে। এসব ভাবে বনবিহারী। উইলের খবর একমাত্র জানে বনবিহারী। আর কেউ জানে না বলেই রমার মধ্যে খারাপ চিন্তা কাজ করাটা অসম্ভব নয়।

মিনিট দশ ধরে ডঃ দত্ত রাসবিহারীকে পরীক্ষা করলেন। ডঃ দত্ত ডাক্তারি যন্ত্রপাতি ব্যাগে পুরছেন। এখন ঘরের মধ্যে শব্দহীনতার শব্দ শীতের শীতল জলে চুপসে আছে ঘরের চারপাশের লোকদের বুকের মধ্যে। ডাক্তারের রায় শোনার জন্য সবাই বৃক্ষের মতো স্থির, এ যেন শোকের ঝড়ের পূর্বাভাস। গাছের পাতার মতো থির্ থির্ কাঁপছে ওদের শরীরের অন্দরমহলের স্নায়ু। অবশেষে ডাক্তার বললেন, অবস্থা খুবই খারাপ। অতিদ্রুত প্যাডের কাগজে লিখছেন। ভীষণ নীরবতার মধ্যে সবাই শুনলো লেখার খস্ খস্ এবং পাতা ছেঁড়ার শব্দ। প্রেসক্রিপসানটা বনবিহারীর হাতে দিয়ে বললেন – 'এখুনি লোক পাঠান। এক ঘণ্টার মধ্যে কলকাতা থেকে ওষুধটা যেন নিয়ে আসে।' পুনরায় ডঃ দত্ত আরেকটা চিঠি লিখে বনবিহারীর হাতে দিয়ে বললো—'একজন

স্পেশালিস্ট দরকার। আমার চিঠি নিয়ে গেলেই আসবে।' শ্রীরামপুর থেকে বনবিহারী ছোট ভাই সমরনাথকে বললে,—'তুই যা। নীতুকে সঙ্গে নিয়ে যা। আমি বাবার কাছে আছি।' ডাকে নীতু বলে, আসলে ওর নাম নীতেন্দ্রনাথ, বনবিহারীর বড় ছেলে, মাধ্যমিক দেবে। সমরনাথ গাড়ি নিয়ে চলে যায়। সঙ্গে নীতু। বনবিহারী সতর্ক থাকতে চায় সমরনাথ সম্পর্কে। সন্দেহ সবাইকে এভাবে সতর্ক ও সচেতন করে তোলে। এখন ওষুধ আনতে কলকাতায় কাকে পাঠানো যায়। সমরনাথ গাড়ি নিয়ে চলে গেল। ভ্যানগাড়ি কাক ভোরে চলে গেছে ফুল নিয়ে। এগারোটা বাজতে চললো এখনো ফেরে নি। বনবিহারীর স্ত্রী বললো,—'হরিচরণকে পাঠাও। বাবা ওকে খুব বিশ্বাস করেন।' বাবাকে রাতির ফুল চুরির খবরটাও হরিচরণই দিয়েছে। বনবিহারী ভেবে দেখল, এই মুহূর্তে ওকেই একমাত্র বিশ্বাস করা যায়। তবু মন থেকে পুরো সংশয় কাটে না। কর্মচারী ছাড়া বাড়িতে আর নিজের লোক বলতে পুরুষ মানুষ কেউ নেই যে হরিচরণের সাথে যাবে। সমরনাথের স্ত্রী রমা আছে, যাদবপুরের মেয়ে। এ বাড়ির মেয়েদের মধ্যে রমাই সর্বত্র ঘোরাফেরা করে একা একাই। কিন্তু সেই সন্দেহ বনবিহারীর। ইচ্ছা করলো না হরিচরণের সাথে রমা যাক। অতএব হরিচরণ যে ত্রিশ বছর ধরে এখানে কাজ করছে রোদে জলে সুখে দুঃখে। বাবার একান্ত অনুচর। কোনদিন কোম্পানির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে নি। একবার সবাই মজুরী বৃদ্ধির দাবি আদায়ের লড়াইতে ধর্মঘট করলো। হরিচরণ করে নি। বরং অনেক খবর বাবাকে দিতো যা ছিল কোম্পানির পক্ষে ভীষণ ক্ষতিকর। এতো সব ভাবনা এই দুঃখের সময়ে ভাবতে বনবিহারীর কয়েক সেকেন্ড লাগে। তারপরই বলে—'হরিচরণ কর্তাবাবুর ওষুধ আনতে কলকাতায় যেতে হবে। এক ঘণ্টার মধ্যে ট্যাক্সি ধরে যাবে আসবে। পারবে তো?' বনবিহারীর পায়ের তলায় সাদা স্প্যানিয়েল ঘুরছে ফিরছে। হরিচরণের হাত দুটো জোড়া অবস্থাতেই ছিল—'খুব পারবো। যাব আর আসবো। ট্যাক্সিওলাকে ডবল ভাড়া দেবো।' হরিচরণ বংশানুক্রমিক আনুগত্য দেখায়। বনবিহারী দুশ টাকা হরিচরণের হাতে দিয়ে বলে—'যেমন করেই হোক আধঘণ্টার মধ্যে আসতে হবে।' বলেই বনবিহারী ডাক্তারের কথামতো বাবার বুকে পিঠে মালিশ করে বুকের ভিতর যন্ত্রটাকে সচল রাখার জন্য। ডঃ দত্ত ঢোকামাত্রই যে ইনজেকশানটা দিয়েছেন, সেটা মনে হচ্ছে কাজ দিচ্ছে এখন। বাবা এখন মৃতদেহের মতো শুয়ে আছে। রমা বাবার পায়ের পাতা ম্যাসেজ করছে। বনবিহারীর স্ত্রী হাতের পালস্ ধরে বসে আছে। ডঃ দত্ত বলে গেছেন পনেরো মিনিট বাদেই আবার আসবেন।

দিন চড়ছে, রোদ বাড়ছে। হাওয়া সচল হচ্ছে। সচল হওয়ায় ফুল বাগানের মজুরদের শ্লোগান ভেসে আসছে - অস্পষ্ট। কিন্তু বনবিহারীর কান মন

সর্বদাই সজাগ। বনবিহারী শুনতে পায়—ছাটাই করা চলবে না, চলবে না, চলবে না। বনবিহারী একজন প্রধান কর্মচারীকে বলে—'রতিকে নিয়ে ওদের কাজে যোগ দিতে বলুন।' বনবিহারীর কাছ থেকে কথাগুলো স্পষ্ট শুনবে বলে প্রধান কর্মচারী মাথা নিচু করে। তারপর ফুল বাগিচার গেটের কাছে সংবাদ দিতে চলে যায়। বনবিহারীর অস্বস্তি বাড়ে। ভাবে হরিচরণ এখন কদ্দুর যেতে পারে।

দুশ টাকা হাতে পেয়ে হাঁটতে হাঁটতে হরিচরণ ভাবে মোদের একমাসে মাইনে। উনাদের ওষুদ কেনার আর আনার খরচ। মোদের ঐ একমাসের ট্যাকায় চারিজনের বাকোড় পেট) ভরে নি একবেলা। আছোর রাত বেলায় উপোস দিতে হয় রোজ রোজ। বড়নোকের ব্যাপার স্যাপার আলাদা। মোর বৌটি হাসপাতালি মারা গেল একটুকুন ওষুদের জন্যি। কত্তামশাইকে কতো বল্লেম, কত্তামশাইগো বড়ই নেন্‌জারিতে (কষ্টে) পড়েছি, ইদেনপক্ষে পাঁচটি ট্যাকা যদি দ্যান। দিলে তো নাইই। বরং দুদিন ধরে হাসপাতালে বৌটিকে নিয়ে যেতে হয়েছে বলে কত্তামশাই ছটি ট্যাকা কেটে নিলে। মগরা আর কাকে বলে? কত কান্নাকাটি করলেম। কত্তামশাইর হাতে পায়ে ধরলেম। দিলে না গো। সত্যি কতাটা কি, কত্তামশাই টনকা (নিষ্ঠুর)বড়ই, মায়াদয়া একেবারেই নেইকো। শুধু কি তাই, সুবল একবার কাজ করতি করতি বাগানটাতেই অজ্ঞান হয়ে গ্যালো। কত্তামশাই নাগা করে দিল সারাবেলাটা। আরে দুঘণ্টা তো কাজ করেছেলো। পরে জানতি পারলেম ব্যাটা আমার দুদিন না খেয়ে কাজে এয়েছেলো। বাকোড়ে আমানিও একফোটা জোটেনি। ভাবলে বুকটা ফাটি যায়। আমি না হয় পর ভাতী কিন্তু ব্যাটা আমার নিকড়ে (অভাবী) হতি পারে, আমার মতোন পর-ভাতী নয়। ব্যাটা আমার বড্ড জেদী। তা ভালো রে ভালো। এখন আবার য়ুনিয়ানের ন্যাতা হয়েচে। রতিকে না নিলে কেউ কাজে যোগ দিবে না। তা মন্দ কতা নয়। কত্তামশাইটা মরে গেলে বড়বাবু মনে হয় রতিকে কাজে নেবে। আসলে বড়বাবু লোকটা ভাল। মোদের দুখ্যুটুখ্যু বোঝে।

হরিচরণ এখন তয়ে তয়ে (আস্তে আস্তে) হাটে আর ভাবে, কত্তামশাই গো, তোমার নিন্দয় পরানটা এখুন মোর হাতের মুঠোয়। তোমাকে বাঁচাবো কি মারিবো, সেইটা এখুন আমি বুইঝবো। তুমি যদি ব্যাঁইচে যাও, তালে আবার হুকুমজারি। আবার অত্যাচার, আবার শোষণ। আর যদি মইরে যাও, তালে আমরা যারা তোমার ফুলবাগিচয় কাজ করি তারা সব্বাই ব্যাঁইচে যাবো। তোমার বড় ছেলে লোক ভাল। মোদের মাইনে বাড়াবে। কত্তামশাই যদ্দিন ব্যাঁইচে থাকবে তদ্দিন মোদের আট টাকা রোজে কাজ করি যেতি হবে। না, আমি তাড়াতাড়ি কাজ কইরবো না। শালাকে মরতে দাও, জয় মা গড়চণ্ডী। জয় বাবা এঁতেল ঠাকুর। কত্তামশাইর পরানটা নিয়ে নাও মা গড়চণ্ডী।

হরিচরণের মনে এখন ক্রোধ জম্মায়। মনে মনে ভাবে হরিচরণ, আমি তোমাকে আর বাঁইচতে দিবো নি কত্তামশাই। তুমি ব্যাইচে থাকলে মোদের কষ্ট আরও বাড়বে। দশটি ঘণ্টা কাজ করে দিনমানে আট টাকা রোজ পাই। আর তুমি মাসে মাসে হাজার হাজার, হাজার হাজার টাকা পাও। আর ওসব চলবি নি এখুন। ব্যাটা আমায় ঠিকই বলে, আমি হাউড়া পেটুক), আমি দালাল । আমি তোমার কেনা গোলাম। আর নয় কত্তাবাবু। এবার তোমায় শ্যাষ কইরে দিব। দুঘণ্টা বাদে, তুমি মইরে গেলে ফিরবো। বড়বাবুকে বইলবো, সে রাস্তায় বিরাট মিছিল। কারখানার খাটিয়ে নোকদের মিছিল। চেঁচিয়ে বইলচে, মাইনে বাড়াতে হবে। গাড়ি আইট্‌কে গেল। আর ওতেই দেরি হয়েছেলো। না, না, এ মন্দ অভিলাষ। গায়ে গতরে গুগসুনি (পচা গরম) শুরু হয়েচে। এসব ভাবনা আর নয়। চিরকাল কত্তাবাবুর নিমক খেয়ে বাঁইচে আছি। এখন কি না কত্তাবাবুর মরণ কামনা করছি। মোর নরকেও স্থান হবে নি। এঁতেল ঠাকুর নজর রাখচে নিচ্চয়।

হরিচরণ ট্যাক্সি করে শ্যামবাজার মোড়ে এসে গেছে। রাস্তা ফাঁকা ছিল। অনেক আগেই চলে এসেছে। মিটারের চেয়ে বেশি ভাড়া দিয়েছে। কিন্তু ট্যাক্সিটা হরিচরণ ধরে রাখে না। হঠাৎ কে যেন হরিচরণের মনের মধ্যে কথা কয়। বলছে, হরিচরণ তুমি কি নরকের চেয়ে ভাল আছ। তুমি কি হরিচরণ ভুলে গেছো ফুলবাগিচায় কাজ করেও বৌয়ের মড়ার খাটে একটি ফুলওতো দিতে পারনি। তুমি কি এখন তোমার সেদিনের কণ্ঠস্বর শুনতে পাও না, 'কত্তাবাবু গো ওষুদের পয়সাতো পেলাম নি। দুটো ফুল দিন। বৌটা মোর ফুলের মালা গলায়-দিয়ে স্বগ্‌গে যাক। কত্তাবাবু গো এতো অভাবের মধ্যে থেকেও বৌটা মোর খারাপ হয়ে যায় নি। সতী ছিলো, পুণ্যবতী। দিন্‌ না বাবু আমার নিজের হাতে চাষ করা দুটি ফুল। পুণ্যবতী বৌটা মোর আইশুন্য দশা নিয়ে মইরে গ্যালো কত্তাবাবু।' হরিচরণ রে তুই কি ফুল পেয়েছিলি? তোকে কি কত্তাবাবু ফুল দিয়েছেলো? জবাব দে হরিচরণ। চুপ করে ওষুদের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে আছিস্‌ যে। জবাব দে।

কে? কে কতা কয় মোর বুকের মধ্যি? দেবী গড়চণ্ডী? আবার শুনতে পায় হরিচরণ, এরপরও তুমি হরিচরণ কত্তাবাবুকে খুশী রাখার জন্য আগের ধর্মঘটটায় যোগ দাও নি। বরং যারা ধর্মঘট করেছিল তাদের মধ্যে দু-একজনের নাম বলে দিয়েছিলে। বল নি শুধু তোমার ছেলে সুবলের নাম। তোমার কথা শুনে কত্তাবাবু পরে দুজনকে ফন্দি ফিকির করে তাড়িয়ে দিলে। ছিঃ ছিঃ হরিচরণ, তোমার কি এখন ওসব কথা মনে পড়ছে না? তুমি কি এখনও ভাবছো, কত্তাবাবুর দালালি করলে তোমার স্বগ্‌গে স্থান হবে?

হরিচরণ চোখ বোজে। মনের পর্দায় এঁতেল ঠাকুরের মূর্তি আঁকা হয়ে

যায়। মাথায় জটা, গলায় সাপের মালা, হাতে ত্রিশূল। আর ত্রিশূলের মাথায় কত্তাবাবুর মুণ্ডু। এ যেন অন্য এঁতেল ঠাকুর।

কিন্তু এ যে পাপ চিন্তা ভাবনা। কত্তাবাবু মরি গেলেই কি মোদের বেতন ব্যাড়ে যাবে? নির্যাতন কমি যাবে? দুঃখ কষ্ট আর গায়েগতরে লাইগবে না?

আবার সেই কণ্ঠস্বর হরিচরণের বুকের মধ্যে শোনা যায়ঃ বাবা, মোদের শক্তি যত বাড়বে, ওদের শক্তি ততই কমবে। ওদের শক্তি কমাবার জন্য যত বেশী পার পাপ দূর কর। হরিচরণ ভিতর ভিতর চমকে ওঠে, এ যেন মোর ছেলের গলার আওয়াজ শুনতি প্যালাম। সুবল, তুই না মোর নামে দিয়ালে পোইস্টার লাইগেছিলি 'মালিকের চামচে কে, হরিচরণ আবার কে।' না, মুই আর কিছু ভাবতি পারছি না। কাতি মাসে মুই ঘ্যামে উইঠছি। ভাল নয়, কাতিমাসে উষ্মলার হাওয়া (বসন্তের হাওয়া) বইছে।

হরিচণের ওষুদ কেনা হয়ে গেছে। এখন ওর সামনে দিয়ে অনেক বাস ট্যাক্সি চলে যাচ্ছে। হরিচরণ ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। ওর বুকের ভেতরে দ্বিধাদ্বন্দ্বের ঝড়টা যেন একটু থিতিয়ে এসেছে। হঠাৎ হরিচরণ ভাবে যদি কেউ ওকে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ফেলে। চিন্তাটা মনে আসতেই একটা তিন নম্বর ভীড় বাসে ঢুকে পড়ে। আবার অনেকদূর গিয়ে নেমে পড়ে। আবার কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। নিজের মনে বলে ওঠে, 'সুবল রে, আমি তোদের দলে আছি রে।' পরমুহূর্তেই কে যেন বুকের মধ্যে ছোবল মারে। কোন শয়তান-সাপ, ঠাহর করতে পারে না হরিচরণ। অলৌকিক দংশনের জ্বালায় সে একটা ট্যাক্সি থামাবার জন্য হাত বাড়ায়। কিছুদূরে গিয়ে ট্যাক্সিটা দাঁড়ায়। আর সেই মুহূর্তে পিছনে আসে একটা তিন নম্বর বাস। আবার বাসেই লাফিয়ে উঠে হরিচরণ।

একসময় হরিচরণ প্রায় দু ঘণ্টাবাদে কত্তাবাবুর দুয়ারে ফেরে। দেখতে পায় অনেক লোক ঘরে। শুনতে পায় একটানা কান্না। কত্তাবাবু তালে মারা গ্যাছে। হরিচরণের বুকের ভেতর থেকে চাপা নিশ্বাস বের হয়ে আসে। নিশ্বাসের সাথে সাথে হরিচরণের বুকের মধ্যে খাঁচার মতো বন্দীশালা থেকে একটা মৃতপ্রায় সাদা পায়রা, ঠোঁটে রক্ত গোলাপ, বের হয়ে আসে। হরিচরণ চোখ বোজে। দেখতে পায় হরিচরণঃ রক্ত গোলাপ ঠোঁটে নিয়ে সাদা পায়রাটা উড়তে উড়তে উড়তে উড়তে···, আর কিছু দেখতে না পেয়ে হরিচবণ চোখ খোলে। খুলতেই সামনে দেখতে পায় বড়বাবুকে, বনবিহারী। কোন কথা না বলে হরিচরণ ওষুদের প্যাকেট বনবিহারীর হাতে তুলে দেয়। বনবিহারী প্যাকেট হাতে নিয়ে হরিচরণের চোখের দিকে এক নিমেষ তাকিয়ে থাকে। অবাক হয় বনবিহারী, হরিচরণের চোখে একবিন্দুও জল নেই।

ধারাল ছুরির ফলার মতো হরিচরণের চোখ দুটো চক্‌চক্‌ করছে। কোন কথা না বলে সেখান থেকে দ্রুত সরে যায় বিনবিহারী, কারণ বাবার মৃতদেহ এখনও ঘর-বার করা হয় নি। বাতাসে ছড়ানো শোকের শব্দ থিতিয়ে আসছে।

পরের দিন আবার ভোর হয়। ছুটি তখনো ঘোষণা করা হয় নি। সদ্য স্বর্গপ্রাপ্ত রাসবিহারীর ফুলের বাগিচায় কাজ করতে আসে এক এক করে মজুরদল। অবশেষে আসে হরিচরণ। সবাই হরিচরণকে দেখে অবাক হয়। হরিচরণ কাছে আসতেই সুবলকে বুকের কাছে টেনে নেয়। সবাই লোহার পকেট গেট দিয়ে ঢুকছে এক এক করে। হরিচরণ ঢুকতে পায় না। দারোয়ান হরিচরণকে আটকে দেয়। সবাই আবার গেটের বাইরে আসে। এসেই দেখে ছাটাইয়ের নোটিশ। সেখানে একটি মাত্র নাম, মাংসের দোকানে ছালছাড়ানো কাটা পাঠার মতো ঝুলছে : হরিচরণ মাঝি।

নোটিশের চারদিকে ফুল বাগিচার কর্মিদের ভীড় বাড়ে। একজোট হয়। এমনকি এই প্রথম গেটের দারোয়ান পর্যন্ত, স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছয় : পুনরায় ধর্মঘট চলবে যতক্ষণ না হরিচরণকে কাজে বহাল করা হয়।

বি.এ পাশ করা গরিব ঘরের যুবা বিশ বছরের মজুর পোস্টার লেখে, 'এবার ছাটাই হলে, কাটাই হবে।' দু-একজন শ্রমিক এতে আপত্তি জানায়। একজন বলে, লেখো এক ফোঁটা শ্রমিকের রক্তে জন্ম নেয় হাজার শ্রমিক।

□□□ মাতৃভূমি □□□

এক

পুন পুন উচ্চারিত 'যাস নে বাবলু, যাস নে' মাতৃকণ্ঠের শব্দাবলীর ভীড় ঠেলে যেদিন বাবলু ঘর থেকে বের হয়ে গেল, সেদিন থেকে নিঃসঙ্গ লীলাবতীর মনের ভেতরে চাপা দেওয়া সন্তান বাৎসল্য ভূমিকম্পের মতো মাতৃভূমিকে মাঝে মাঝে তছনছ করে দিয়ে যায়। এক বছর ধরে অর্থাৎ স্বামীর ইহলোক ত্যাগের পর থেকে এই চরম নিঃসঙ্গতা সূর্যের কৃপাহীন তেজের মতো গালিয়ে পুড়িয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেয় বিধবা লীলাবতীকে যেন শ্মশানের পোড়াকাঠ। আর তখন একক লীলাবতী চিৎ আরশোলার মতো যন্ত্রণার ছটফটানিকে চেপে রেখে বিষাদক্লিষ্ট হয়। শরীরের প্রতিটি রক্তকণা ঘিরে গড়ে ওঠা বাবলুর শরীর যে মুহূর্তে দামি নার্সিং হোমে যুদ্ধে অক্লান্ত পৃথিবীর বাতাসে প্রথম কান্না ছড়িয়ে দেয় ঠিক সেই মুহূর্তে ত্রিশ বছর আগে লীলাবতী নামক কোন এক নারীর মনের মধ্যে মাতৃত্বেরও জন্ম হয়ে যায়। সন্তানের চোখের আড়ালে থেকেও মাতৃত্বকে এখনও লীলাবতী বুকে রেখে যক্ষের মতো পাহারা দিয়ে যাচ্ছে স্বামী ভবতোষের বৈভবকে এবং কলকাতার দক্ষিণপ্রান্তে অবস্থিত ছিমছাম ছবির মতো দোতলা বাড়িটাকে। বাড়ির সামনে দোতলা সমান লম্বাটে দেয়ালে রবীন্দ্রনাথের চণ্ডালিকার বিশাল মুরাল। চণ্ডালিকার হাত থেকে জলপান করছে এক বৌদ্ধ ভিক্ষু।

রাত এগারোটা বাজলেই এ বাড়ির একতলার সব ঘরের জ্বলা আলো এক এক করে নিভে যায়। আর তখনি সুইচ অফ করার শব্দ এবং লীলাবতীর স্লিপারের শব্দ এই নির্জন বাড়িটা থেকে বের হয়ে আসে। বোঝা যায় লীলাবতী দোতলায় উঠছেন। দোতলার সব আলো নেভাবার আগে চোখে পড়ে টিভি র পেছনের দেয়ালে একটা সংবর্ধনার গ্রুপ ফটো। সেই ফটোতে স্বামীর অবস্থান যে গৌরব ও আভিজাত্য এনেছিল এই ব্রাহ্মণ পরিবারে, পুত্র চলে যাওয়ার এবং স্বামীর মৃত্যুর পর এখন তা ঝরা পাতার মতো রিক্ততার শূন্যতায় টইটম্বুর। ঘরটাকে অন্ধকারে ছুঁড়ে ফেলতেই ত্রিশ বছরের পরিচিত কণ্ঠস্বর মৃত্যুর অনেকদিন পরেও পিছু ধাওয়া করে, 'লীলা, তুমি আমার অনেক নির্যাতন সহ্য করেছো, অনেক অন্যায় সহ্য করেছো। আমার সব কিছুই তোমার জন্য রেখে গেলাম। এবার থেকে তুমি স্বাধীনভাবে চলাফেরা করো। শুধু অনুরোধ বাবলু দাবি না করলে, তুমি ওকে কিছুই দিও না। আমার ইচ্ছে, ছেলে না ডাকলে তুমি ছেলের কাছেও যেও না।' অহংকারী বরের এই মৃত্যুমুখী জবানবন্দী লীলাবতী বেশ কয়েকমাস মনের আঁচলে গিট দিয়ে বেঁধে রেখেছিলেন। সংবাদ পেয়েও বাবার মুখাগ্নি করতে না আসার

জন্য বাবলুর প্রতি রাগটা শরীরের ঘাম শুকিয়ে যাওয়ার মতো একটু একটু করে কমে আসতেই কবে-কখন-কিভাবে-যে মনের আঁচলের গিট খুলে গিয়ে স্বামী ভবতোষবাবুর এই জবানবন্দী হারিয়ে গেছে লীলাবতী তা টেরও পান নি।

প্রয়াত ভবতোষবাবুর এই দোতলা বাড়িটা, প্রযত্নে লীলাবতী উপাধ্যায়ের, এখন নবীন অন্ধকারে ভাসছে। লীলাবতী দোতলার ব্যালকনিতে এসে দাঁড়ান। চোখের পাতায় ঝাপ্‌টা লাগে হেমন্তের শীত শীত হাওয়ার। 'কানুরা আজ যেন তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়েছে'—অলিখিত শব্দাবলী লীলাবতীর চিন্তার মধ্যে দ্রুত আসে, দ্রুত চলে যায়। ভবতোষবাবুর সময় থেকে কানুরা এ বাড়ির কাজের লোক। থাকে, খায়, কাজ করে। ওরা খুবই বিশ্বস্ত যে একমাস ওদের দায়িত্বে এই বাড়ি ফেলে রেখে চলে যাওয়া যায়।

চাঁদের ময়লা আলোয় ব্যালকনি ভাসছে কিন্তু অন্ধকার কাটাতে পারছে না। রাস্তা থেকে টানা রিক্সার ঠুং ঠাং শব্দ অথবা মাতালের গান 'আমার সখি রে রাখিলে কোথায়' অথবা দোকানের ঝাপ বন্ধ করার ঝন্ ঝন্ শব্দ অথবা কুকুরদের মধ্যে খাবার নিয়ে ঝগড়ার গোঁ গোঁ শব্দ অথবা পাশের তিন তলার বাড়ির টপ্ ফ্লোর থেকে ক্যাসেটে কণিকার-গলা "আনন্দধারা বহিছে ভুবনে"—এসবের কোন একটাও লীলাবতীর মানসিক অস্থিরতাকে টুকরো টুকরো করে দিতে পারছে না। কারণ, দু'মাস বাবলুর চিঠি কেন আসছে না, এমত ভাবনার জন্যই মনের অস্থিরতা দৃঢ়তা লাভ করে। মনের এই অস্থিরতা মাঝে মাঝে তাকে মৃত্যুর কাছাকাছি নিয়ে যেতে চায়। অথচ দু'মাস আগে লীলাবতী অন্যরকম ভাবতেন। বাবলুর চিঠি তখন আসতো সপ্তাহে একটি করে। লিখতো, মা আমি ভাল আছি, তোমার নাতি ভাল আছে, তোমার বৌমা লতু এখানকার স্কুলে চাকরি পেয়েছে, মা তুমি কিছু ভেব না, আমার সুস্থ-সুন্দর সবল আছি —এ সব সান্ত্বনার শান্তি পায়রা তার শান্ত মনের আকাশে উড়ে বেড়াতো। এসব চিন্তাভাবনা একদা একাকী লীলাবতীর মনকে দোলাতে দোলাতে ছিমছাম দোতলার একটি নির্জন ঘরে যখন ঘুমের কাছাকাছি নিয়ে যেত তখুনি তিনি একমাত্র প্রিয় সন্তানের স্বপ্ন দেখতেন:

বাবলু আম খায়, আপেল খায়
বাবলু ছানা খায়, দুধ খায়
বাবলু বই পড়ে, পদ্য লেখে
বাবলুর ছেলে কথা বলে
ঠাম্‌মা যাব ঠাম্‌মা যাব
বাবলু আমার ভাল আছে সুখে আছে
এভাবেই ভালো থাকা এভাবেই সুখে থাকা
ভালো আর সুখ সুখ আর ভালো

এই সব চিন্তাভাবনা এবং শব্দগুলো সুখ-সংগীত হয়ে লীলাবতীকে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন করে রাখতো।

সেই লীলাবতী দুমাস অস্থির, চঞ্চল, ডাকবাক্সে বন্দী থাকে বিশাল শূন্যতা। পিয়ন ফিরে ফিরে যায়। তখন লীলাবতীর একই রকম মানসিক তীব্র অস্থিরতা। দোতলার ব্যালকনির কার্নিশ থেকে বাস্ট শরীরটাকে আলতোভাবে তুলে নিয়ে বোহেমিয়ান এক বিড়াল ছানার মতো ঘরে ঢোকে। আর তখুনি স্মৃতির শীতল হাওয়ায় কাঁপতে থাকে লীলাবতীর ভেতরের জগত। লীলাবতীর সামনে এই আধুনিক আর্কিটাকচারাল বিল্ডিংটার প্রতিটি ঘরে জেগে থাকে বাবলুর বাল্যকাল, কৈশোর এবং প্রাপ্তবয়স্কতা। জেগে থাকে বাবলুর পোশাকআশাক। বই-পত্তর, গোছা গোছা লিট্‌ল ম্যাগাজিন এবং কবিতার প্রথম বই—'আমাকে জন্ম দেয় প্রতিটি রক্তকণা'। জেগে থাকে বাবলুর ভাললাগার ইচ্ছা আকাঙ্খাগুলো—টেরাকোটার ভাস্কর্য, বাঙলার লোকচিত্র, টেপরেকর্ড এবং সাজানো ক্যাসেটে দেবব্রত বিশ্বাসের রবীন্দ্রসংগীত এবং হেমাঙ্গ বিশ্বাসের গণ-সংগীত।

আজ যেন লীলাবতীর চোখ থেকে ঘুম পালিয়ে গেছে। চোখের আড়াল দিয়ে রাতের সময় বয়ে চলেছে। এমনি করেই রাত বারোটা আসে এবং চলে যায়। অকেজো ফ্রিজের দিকে তাকাতেই অকেজো মনটা চিন্তা-ভাবনায় জমাট বেঁধে যায়। এ সময় কেন যেন নরম বিছানায় চোখ বুজে পড়ে থাকতে ইচ্ছা জাগে। পুরনো অভ্যেসমতো শরীর থেকে ব্লাউজ খুলতেই আয়নায় চোখ যায় বুকের ক্ষতস্থানটায়। স্মৃতি ঘেটে ঠিকঠাক মনে করতে না পারলেও প্রায় ত্রিশ বছর আগের এক প্রচণ্ড শব্দহীন আর্তনাদ আছড়ে পড়ে বুকের ক্ষতস্থানটায়।

বাবলু, বাবলু রে, তুই তখন আমার পেটে, চার মাস। তোর অহংকারী বাবার অত্যাচারের অভিজ্ঞান এই ক্ষতটি বহন করে চলছি। আরও আছে, দেখবি, দেখবি বাবলু? দ্যাখ্ দ্যাখ্ পিঠের দিকে তাকা। দেখতে পাচ্ছিস কালসিটে। ওটা জুতো ছুড়ে মারার ফলে হয়েছিল। তোর বাবার আভিজাত্য, শিক্ষা, অর্থ, ব্যবসা, অহংকার এবং ভোগের স্বেচ্ছাচারিতা—এসব দিয়ে ঘিরে রাখা পুরুষশাসিত কারাগারের মধ্যে ত্রিশ বছর বন্দী করে রেখেছিল। একদিন তোর বই পত্তর থেকে লেনিনের লেখা 'নারী মুক্তি' বইটা লুকিয়ে পড়েছিলাম। সেই বইতে প্রথম দেখেছিলাম বৌমার সিগনেচার 'দিব্যজিৎকে, লতিকা মণ্ডল।' সেই বইয়ের কয়েকটি কথা এখনও জ্বল জ্বল করছে, 'বুর্জোয়া বিবাহ রীতির পচন, দুর্গন্ধ এবং নোংরামি, তার বিচ্ছেদের দুরূহতা, তার স্বামীর স্বাধীনতা এবং স্ত্রীর দাসত্ব, আর তার যৌন-নীতি ও সম্পর্কের জঘন্য মিথ্যা শ্রেষ্ঠ এসবে মনও অতিশয় ঘৃণায় ভরে ওঠে।" পড়ে সেদিন থেকেই ভেবেছিলাম

লতিকা মণ্ডল নামক এই অস্পৃশ্যা মেয়েটিই আমার ব্রাহ্মণ ছেলের সুখদুঃখের চিরসাথী হতে পারবে।

এভাবেই লীলাবতীর প্রতিটি রক্তকণায় মাঝে মাঝে বেজে ওঠে রাগী সংগীতের মতোই আছড়ে পড়া তীব্র কণ্ঠস্বর, বাবলুর পিতৃদেবের, 'তোমার ঐ মার্কসবাদী ছেলেকে স্বীকার করে নেওয়া যায়, কিন্তু আমি কখনোই স্বীকার করে নিতে পারবো না ব্রাহ্মণ হয়ে ম্লেচ্ছ মেয়েটাকে।' গান্ধীবাদী স্বামীর এসব কথা শুনে লীলাবতী মোটেই অবাক হয় না। বরং গান্ধীর আদর্শের প্রতি এবং অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের প্রতি স্বামীর আলগা ভালবাসা লীলাবতীর মনের আগুনে জ্বলে পুড়ে একসময় ছাই হয়ে যায়। লতিকার প্রসঙ্গ নিয়ে বৃথাই তর্ক করেছিলেন লীলাবতী। দামি শো-কেসে সাজানো রবীন্দ্রনাথের, বিবেকানন্দের ও গান্ধীর বই থেকে অনেক উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন এই বিদুষী বিধবা মহিলা একসময় একদিন। পরিবর্তে পেয়েছেন একজন ঘনিষ্ঠ পুরুষের তথাকথিত স্বামীর হীনমন্যতা, লাঞ্ছনা এবং অপমান। অবশেষে পিতৃবাৎসল্যের প্রসঙ্গও তুলেছেন। তবুও মায়ের আর্তনাদ নত হয় অকোমল স্বামীর চরম আভিজাত্য এবং সীমাহীন আর্থ-অহংবোধের কাছে।

এখন রাত একটা। লীলাবতী নামক পঞ্চাশ উর্ধ এক বিধবা মহিলা যিনি জীবনে কোনদিন গুরুদেবের মন্ত্র গ্রহণ করেননি যে ঘুমোবার আগে গুরুদেবের মন্ত্র পুত্রের মঙ্গলের জন্য জপতে জপতে ঘুমিয়ে পড়বেন, তিনি ধীরে ধীরে ঘুমের ভিতর তলিয়ে যান।

দুই

আসানসোলের কাছাকাছি ছোট্ট একটা স্টেশনে লীলাবতী হাতে এ্যাটাচি নিয়ে যখন নামেন তখন স্টেশনটি প্রায় নির্জন। দুপুরের তাপ-লাগা কাকগুলো বিশাল ছাতিম গাছের ছায়াঘেরা ডালে বসে ক্লান্তি সারাচ্ছে। তারই নিচে এক আদিবাসীর সংসার। তাদের পাশ দিয়ে দশ পনের জন যাত্রীদের সাথে লীলাবতী পায়ে পায়ে চলে আসেন রিক্সার ডেরায়। রিক্সাঅলাদের ডাকাডাকিতে এবং বেল বাজানোতে এখানে কিছু শব্দ জড়ো হয়ে আছে।
তরুণ রিক্সাঅলার কাছে গিয়ে লীলাবতী ছেলের ভাল নাম দিব্যজিৎ বলতেই রিক্সাঅলা বলে, 'উঠুন। নিয়ে যাচ্ছি।' রিক্সায় উঠে পাশে রাখেন এ্যাটাচি। কাঁধ থেকে ঝোলানো বড় ব্যাগটি নামিয়ে কোলের উপর রাখেন তিনি। রিক্সা চলতে থাকে। কখনও মসৃণ পথ কখনও উঁচুনিচু। রিক্সা চলে কখনও ধীরে, কখনও দ্রুত। কিছুদূর যাওয়ার পর ডানদিকে একটা কারখানার লম্বা দেয়াল। ওয়ালিং-এ এবং পোস্টারে দেয়ালের পুরোটাই প্রায় ঢাকা। ধর্মঘটের হুমকি, মালিককে হুঁশিয়ার, দশদফা দাবির সূচীপত্র, দুনিয়ার মজদুর এক হও, লেনিনের উক্তি এসবের মধ্যে লীলাবতীর নজর কেড়ে নেয় লাল অক্ষরে লেখা

একটি নাম 'শ্রমিক নেতা দিব্যজিৎ উপাধ্যায়।' এই মুহূর্তে তার মনে হয় ভবতোষ উপাধ্যায়ের দেয়া নামের আভিজাত্যের সাথে এই দেয়ালের আভিজাত্য মিলছে না। কিন্তু পুত্র দিব্যজিৎ আভিজাত্যকে টুকরো টুকরো করে দিয়েছে। রিক্সা কারখানার গেটের কাছে আসতেই দেখতে পান লীলাবতী গেট সম্পূর্ণ বন্ধ। গেট থেকে কিছু দূরে ত্রিপল টাঙিয়ে চৌকির উপর কিছু শ্রমিক। কারণ জিজ্ঞেস করতেই রিক্সাঅলা জবাব দেয়, 'প্রায় মাসখানেক ধরে ধর্মঘট চলছে। তবে শুনেছি এবার মিটমাট হয়ে যাবে। মালিক আমাদের কিছু দাবি মানবে বলেছে।'

'আমি দিব্যজিতের মা। ও কেমন আছে'—বলতেই রিক্সা থেমে যায়। রিক্সাঅলা সিট থেকে নেমে আসে। এসে লীলাবতীর পা ছুঁয়ে প্রণাম করে বলে, 'দিব্যদা আমাদের নেতা। আমি এই কারখানায় কাজ করি। অবসর সময় রিক্সা চালাই। দিব্যদার কাছে আমাদের এই গোটা কাকমারি অঞ্চলটাই মায়ের মতো'। রিক্সাঅলার প্রতিটি কথায় লীলাবতীর গোটা জীবনের সরল বিস্ময়, সরল আনন্দ বিস্ফোরণ ঘটায় শরীরের প্রতিটি রক্তকণায়।

রিক্সাঅলা লীলাবতীকে যে বাড়ীব সামনে এনে দাঁড় করায় সেটা ভাঙা, খুবই পুরনো একতলা বাড়ি। ভাড়া এবং বখশিস মিটিয়ে দিয়ে লীলাবতী বাড়ির কড়া নাড়েন। সে সময় অবাক হয়ে যায় লীলাবতী যখন রিক্সাঅলা বখশিসের পয়সা ফিরিয়ে দিয়ে বলে যায়, 'বখশিস নিতে দিব্যদা বারণ করেন। তিনি বলেন, ন্যায্য পাওনা সংগ্রাম কবে আদায় করতে হয়। রেটের ভাড়া পেলেই খুশী আমরা।' দরজা খুলতেই লীলাবতীর নজর কেড়ে নেয় ময়লা ছেঁড়া ফ্রক পবা রোগা এক কিশোরী মেয়ে। মনে হয়, বাবলুর বাড়ির কাজের মেয়ে।

'দিব্য কোথায় ?'

'বাইরে গেছে। এখুনি এসে যাবে। খেয়ে যায় নি। ভিতরে আসুন।'

'বৌমা কোথায় ?'

'স্কুলে গেছে। বিকেলে ফিরবে। ভিতরে বসুন।'

ভিতরে যেতে যেতে শুনতে পান লীলাবতী সদরের দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ। বারান্দায় একটা ফরসা রোগা শিশু উদোম গায়ে এলুমিনিয়মের ছোট বাটিতে শুকনো মুড়ি চিবোচ্ছে।

'এ দিব্যর ছেলে না ?'

'হ্যাঁ'।

'এতো রোগা !'—বলেই ওকে কোলে তুলে নেন্ লীলাবতী। পরনে সাদা জর্জেট ময়লা হয়ে যাওয়ার কথা ভাবেন না। ছেলেটি কাঁদে না। একঝাঁক বিস্ময় নিয়ে লীলাবতীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। বাটিক প্রিন্টের রুমাল

দিয়ে শিশুটির কান্নায় ভেজা মুখ এবং পাতলা সিকনি ভেজা নাক মুছিয়ে দেন। ব্যাগ খুলে ক্যাডবেরির এক্লেয়ারস্ দুহাতে ধরিয়ে দেন।

নাতিকে কোলে নিয়ে লীলাবতী ঘরের ভেতরে যান। ছোট ছোট দুটো ঘর। একটা ঘরে চৌকি। উপরে ময়লা বালিশ বিছানা এবং নাইলনের নীল মশারি। বিছানা সেলাইকরা ছেঁড়া চাদর দিয়ে ঢাকা। দেয়ালে একটা ইংরেজী ক্যালেণ্ডার। ক্যালেণ্ডারের মাথায় বাঁধানো লীলাবতীর ফটো। ফটো দেখে চোখে জল জমতে শুরু করে। চোখের পাতা দিয়ে চাপতে গিয়ে কয়েক ফোঁটা জল গালে নেমে আসে। এমনি সময়ে সদর দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ কানে আসে। দরজা খোলার শব্দ হয়। লীলাবতী ঘর থেকে বের হয়ে ঢাকা বারান্দায় এসে দাঁড়ায়। কোলে তখনও নাতি। সামনে নাতির বাবা, লীলাবতীর সন্তান দিব্যজিৎ, ডাকনাম বাবলু। 'কি চেহারা হয়েছে তোর। তোর সেই উজ্জ্বল রঙ, তোর সেই সুঠাম স্বাস্থ্য, কোথায় গেল বাবলু? আর আমাকে প্রতিটি চিঠিতেই লিখতিস্ আমি খুব ভাল আছি, কিচ্ছু ভেবো না। কেন আমাক মিথ্যে কথা লিখতিস?'

মাকে দেখে দিব্য অবাক হয়। কতবার মা দিব্যকে বৌমাকে কলকাতায় ফিরে যেতে লিখেছে। লিখেছে 'এতবড় বাড়ি আমি পাহারা দিতে পারব না, তুই চলে আয়।' দিব্য যায়নি। কাকমারি যে তার আরেক মাতৃভূমি। এখানকার জোতদার ও মালিকের শোষণ, অত্যাচার এই মাতৃভূমিকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে রেখেছে। শৃঙ্খল মুক্ত করার জন্য দিব্য জীবনের কাছে প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ। এসব সে মাকে বলতে চায় না। সে মাকে বলে, 'মা, তাহলে তুমি এসেছো।'

লীলাবতী তার বিবাহিত জীবনের দুঃখ, বৈভব আভিজাত্য ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলে, 'হ্যাঁ, আমি এসেছি। থাকতে দিবি তো?'

চেতনার গভীর তলদেশ থেকে একটা শব্দ দিব্যজিতের কণ্ঠে উঠে আসে—মাআআআ'

আর তখুনি কাকমারির মতো লীলাবতীর মাতৃভূমি কেঁপে ওঠে।

□□□ আত্মশ্রাদ্ধ □□□

ভোরের কুয়াশা সকালেও কাটেনি। কুয়াশা তখনও ঢেকে রাখে দূরের দৃশ্যাবলী। দুটি স্পট্‌ কুয়াশার পর্দায়। ক্রমশ কুয়াশা ঘনত্ব হারিয়ে ফেলছে। স্পট্‌ দুটো বড় হয়। তারপর তিনটি স্পট্‌। স্পট্‌ তিনটি ক্রমশ বাড়তে বাড়তে একটা পরিবার হয়ে যায়, স্বপ্নার মার পরিবার। বোঝা যায় বিধবা মা, বিবাহিত মেয়ে, মেয়ের কোলে শিশু, বিধবার একমাত্র ছোটছেলে। খালি পা। ময়লা পায়ে মোজার মতো ধুলো দেখে মনে হয় অনেকক্ষণ ধরেই হাঁটছে। খানিকবাদে সূর্য দেখা যায়। কুয়াশার পর্দা টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে। এতোক্ষণ পরিবারের চোখগুলো শুধু দেখা যাচ্ছিল। সূর্যের নরম তাপ যত বাড়ছে সেলাই করা মলিন চাদরের ভেতর থেকে পরিবারের নাক মুখ বের হয়ে আসছে। কোলের শিশুটি এখনও চাদরের ভেতরেই। বিধবার গায়ে বিছানার চাদর গায়ের চাদর হয়ে যায়।

ছয় মাইল পথ হেঁটে ওরা এসে পেঁছিয় একটা বিশাল মঠের সামনে। মঠের চূড়ায় 'ওঁম' রোদের সোনা আলোয় ঝলসায়। মঠের সামনে চওড়া গ্রিলের গেট। গেটের মাথায় লোহার পাতের অক্ষর 'সত্যম্‌ শিবম্‌ সুন্দরম্‌'। সেখান থেকে লাইনের শুরু। লম্বা লাইন অনেকদূর চলে গেছে। তখন সকাল নটা। হয়তো বেশী। স্বপ্না, স্বপ্নার মা এবং ছোট ভাই লাইনে দাঁড়ায়, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জিরোয়। এতোবড়ো লাইন দেখে স্বপ্নার মার দুঃখবোধ জাগে। কষ্ট পায়। স্বপ্নাকে 'হারামজাদী মেয়ে' বলে গাল দেয়।

মঠের অধ্যক্ষ দেহ রেখেছেন। তার বাণী গেরুয়া ফেস্টুনে সাজানো ঃ জীবন সুন্দর। আজ শ্রাদ্ধের দিন। খাবার দেওয়া হবে দীনদুঃখীদের। ভোর থেকেই লাইন পড়েছে। কারণ প্রতিজনকেই একটি করে প্যাকেট দেওয়া হয়, এ রকম রীতির সাথে লাইনে দাঁড়ানো দরিদ্র জনগণ পরিচিত। অসম্পূর্ণ খিদে এদেরকে এখানে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। যেন একদল মরা মানুষকে ছেঁড়া-ফাটা-ময়লা পোষাক পরিয়ে এখানে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিছুদূরে শ্রাদ্ধের মন্ত্র, মাইক থেকে ভেসে আসছে. 'ওঁ অগ্নি দগ্ধাশ্চ যে জীবা'। লাইনে দাঁড়ানো স্বপ্নার ভাই-এর প্রশ্ন এবং উত্তর ঃ কিসের মন্ত্র? শ্রাদ্ধের। কার শ্রাদ্ধ? শাল্‌আ আমাদের।

মুখচোখ তোবড়ানো এক বয়স্ক লোকের ধমক খেয়ে স্বপ্নার ছোট ভাই চুপ করে যায়। স্বপ্নার মা শাল্‌ আ, আমাদের' কথাটা শুনে হাসে। লাইনে কয়েকজন মানুষের একবেলা পারিবারিক খিদে জমা পড়েছে। খিদের শরীরটাতো আছেই উপরন্তু হাঁটার ক্লান্তি স্বপ্নার মাকে অশ্লীল করে তোলে। আঞ্চলিক

একটা গাল দিয়ে স্বপ্নার মা বলে, 'মাগীকে বললাম মিশরীর জলটা শিশিতে ভরে নিয়ে খুব ভোরে রওনা দিতে। তো নবাবের গিন্নী বলে কি না খাইয়ে নিয়ে যাব। এখন কি খাওয়াবি হারামজাদি? মাই-এ দুধ আছে? বোটা মুখে দিয়ে তো ভোলাস।' স্বপ্নার বয়স সতেরো। বুকে দুধ নেই। স্বপ্নার কোলের শিশু কাঁদতে থাকে। কান্না শুনে স্নেহময়ী দিদিমার গজর গজর আরও বাড়ে। স্বপ্নার স্বামীর উদ্দেশ্যে বলে 'তিনদিন হলো, বাপের পাত্তা নাই, বাপের বাড়িতে বসে আছে। শুয়ার কুথাকার। ভাত দিতে পারে না, ভাতারের আবার বিয়ের শখ।' কথা শেষ হতেই শব্দ করে থুতু ফেলে। স্বপ্নার দিকে তাকিয়ে বলে—'আবার পেরেম করে বিয়ে। নে ছেলেকে সামলা।'

লাইনের অভাবী লোকগুলোর ঠাণ্ডা রক্ত এখন ফুটছে একটু একটু. সূর্যের নিশিত তাপে। সময় খোঁড়া পায়ে এগারোর ঘর পেরোয়। স্নিগ্ধ রোদের তাপ শরীরে অনেকক্ষণ আগেই সেঁধিয়ে গেছে। শীতের রোদের কোমল আরাম শরীরে ম্লান হয়ে আসে। শীতের রোদের দুর্ভিক্ষ নেই। যত দুর্ভিক্ষ শরীরে শরীরে। কারা যেন শরীরের ভিতর সর্বদাই অন্নের জন্য চীৎকার করে। লাইন যত বাড়ে, পেছন দিক থেকে ছোটখাটো হৈ চৈ ভেসে আসে। প্যাকেট না পাওয়ার আশংকা থাকতেই পারে। কখনও গালাগাল। কখনও ছোটখাটো হাতাহাতি অথবা ঠেলাঠেলি। আবার থেমেও যায়। শৃংখলিত হয়ে সবাই চুপচাপ, শুনশান। আবার সুখদুঃখের কথাবার্তা। আর এসব টুকরো টুকরো কথা থেকেই হীরের টুকরোর কথাটা সবাই লুফে নেয়, যখন জানতে পারে, আবার কবে কোথায় কখন বিনে পয়সায় ভাল খাবার পাওয়া যাবে। খিচুরীর ঠেকের খবর এখানে কারোর অজানা নেই। আজ-কাল-পরশুর খাবারের গল্প এদের ঝিমোতে দেয় না। সুগন্ধি খাবারের গল্প ওদের দাঁড়াবার ক্লান্তি এবং খিদের কামড় ভুলিয়ে রাখে। এ ভাবেই থেমে থেমে একটু একটু করে খাবারের গল্প চাখে এরা: কোন একদিন কোথায় যেন সরু চালের ঘি ভাত, ভাজা মুগের সোনালি ডাল, কড়াইশুটিসহ বাঁধা কপির শুকনো তরকারি, শেষে একটি বড় লেডিক্যানি।

পালা করে ছোট ভাই, স্বপ্না এবং স্বপ্নার মা লাইনে দাঁড়ায়। স্বপ্নার মা রসিকতা করে বলে, 'দান সাগরের লাইন।' তারপরই ছড়া কাটে, 'আদ্যশ্রাদ্ধ করে নরে, কেহ করে দানসাগরে। এ যেন আমাদের আদ্যশ্রাদ্ধ চলছে।' স্বপ্নার মা স্বপ্নার কোলের শিশুটাকে কোলে নিয়ে জাম গাছের ছায়ায় বসে ঘুম পাড়ায়। ব্রাহ্মণ বিধবার শিরা ভাসা কাঠ কাঠ হাতের চাপে মাঝে মধ্যে শিশুটা কেঁপে উঠলে স্বপ্নার মা'র মুখ থেকে একরকম শব্দ বের হয়, ও ও ও। শব্দের সাথে সাথে হাত চাপড়ায় শিশুর বুকে। স্বপ্নার মা জলের সারল্যে বুঝতে পারে,

নাতিটার খিদে পেয়েছে। পোলাটারে ফেলে বাপ পালায়। আবার আসে। কদিন থাকে। তখন হাতে টাকা পয়সা থাকে। খরচা করে। স্বপ্নার সাথে ঝগড়া হয়। দুজনে হাতাহাতি করে। চেঁচামিচি, গালাগাল। আবার দুজনে হাসে। সিনেমায় যায়। টাকাপয়সা ফুরিয়ে গেলে আবার পালায়। 'তোর কেমন বাপুরে নাতি। তোর কান্না কি বাপের বুকে বিঁধে না।' স্বপ্নার মা এসব বলে নাতিকে ভোলাবার চেষ্টা করে। নাতি তবুও কাঁদে, কাঁদতে থাকে। বাতাস বহে নিয়ে যায় সেই খিদের কান্না। জন্মের পর থেকেই খিদে ভোলাবার পদ্ধতি স্বপ্নার মা'র শেখা আছে। বিধবা হওয়ার পর থেকে সে খিদে ভুলিয়ে এসেছে লাইনে দাঁড়ানো নিজের ছেলেটাকে,মেয়েটাকে। যখন কান্না আর থামে না শিশুর কান্নার শব্দ পরিবেশকে ভারী করে তোলে এবং লাইনে দাঁড়ানো মৃতবৎ লোকগুলো নীরবে নিঃশব্দে শিশুর কান্নার সাথে তাদের ভিতরের খিদের কান্নার সাদৃশ্য খুঁজে পায়, তখনই একজন বলে স্বপ্নাকে 'যাও না তোমার মা পারছে না সামলাতে। কাদতে কাদতে তো মরে যাবে বাচ্চাটা। তখন কার শ্রাদ্ধ খাবে? নিজের ছেলের? আমার একটা সন্তান ওভাবেই মারা গেছে। স্বপ্নার মা লাইনে দাঁড়ায়। স্বপ্না সন্তান কোলে জাম গাছের ছায়ায় বসে সন্তানকে আঁচল দিয়ে পুরো ঢেকে মুখে বোটা গুজে দেয়। আর তখুনি জাম গাছের ডাল থেকে কা কা কা অমঙ্গল শব্দ নেমে আসে। হুস হুস শব্দ শুনেও যখন কাকটা ডাল ছাড়ে না তখন স্বপ্নার ছোট ভাই ঢিল ছোড়ে। শিশুর কান্না থামে।

রোদ বাড়ে। খিদে আরো বাড়ে। স্বপ্নার স্বামীর কাজ নেই। পরিবারে খাবার নেই। কোলের শিশু হাত ছোড়ে পা ছোড়ে। স্বপ্নার বিধবা মা হাসে। রোদ আরও চড়া হয়। খিদে আরও বাড়ে। পায়ে যন্ত্রণা। পেটে অধিক যন্ত্রণা। পূর্বদিক থেকে শ্রাদ্ধের মন্ত্র ভেসে আসে। পশ্চিমদিক থেকে খিদের যন্ত্রণা ভেসে যায়। বিধবা মা ছড়া কাটে, 'আদ্যশ্রাদ্ধ করে নরে কেহ করে দানসাগরে। ছেলে কাঁদে, শুয়ার বাপ ভাগে।' লোহার শেকলের শব্দে বারোটার ধাক্কায় সময় চমকে ওঠে। মঠের লম্বা চওড়া গেট খুলে যায়। মৃতবৎ অভাবী মানুষেরা খিদের কারখানা থেকে উঠে এসে নড়েচড়ে। লাইন নিয়ে সামান্য তক্কাতক্কি, ধাক্কাধাক্কি, ঠেলাঠেলিতে বেহুশ পরিবেশটা জীবনদায়ী ওষুধের ছোয়ায় লাইফ ফিরে পায়।

লাইন এগোয়। শিশুকোলে স্বপ্না ছুটে এসে লাইনে দাঁড়ায়। আচমকা ছুটে আসার দরুণ একটু হাঁপায়। লাইন পিঁপড়ের সারির মতো এগোয়। স্বপ্নার মা ও ছোট ছেলে এগোয়, একটু থামে, আবার এগোয়। প্যাকেট হাতে ফিরে আসে কিছু লোক। স্বপ্নার মা সেদিকে তাকায়। আর তখুনি চোখদুটো রিসার্চ-স্কলারদের মতো কাজ করে। জাম গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে

এক বৃদ্ধ প্যাকেট খুলে গন্ধ শুঁকছে আর খাচ্ছে। পায়ের কাছে একটা কুকুর বৃদ্ধের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। বুড়োর দাঁড়িতে খাবারের কিছু গুড়ো আটকে আছে। খাবারের গুড়োগুলো মাটিতে এসে পৌছোচ্ছে না। কুকুরটা শুধুই ন্যাজ নাড়ে। স্বপ্নার ছোট ভাই মাকে ধাক্কা দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যায়। 'ভালোই খাবার দিচ্ছে' স্বপ্নার মা'র কথাটা অনেকেই শুনতে পায়। পায়ে পায়ে স্বপ্নার পরিবার এবার মঠের সাধুর মুখোমুখি দাঁড়ায়। সাধু প্যাকেট নিয়েই দাঁড়িয়ে আছেন। এক এক করে হাত বাড়ায় স্বপ্না, স্বপ্নার মা এবং ছোট ভাই। তিনজনের হাতে তিনটে প্যাকেট। নাকের কাছে প্যাকেটটি নিয়ে স্বপ্না বলে—'ভাল ঘিয়ের লুচি মা।' ছোট ভাই মায়ের হাতটা টেনে বলে— 'ভিতরে যাবি না মা। ছান্ধের কাজ দেখবি নে?' ছেলের কথাটা শোনামাত্র চটজলদি উত্তর দেয়—'আমাদের নেত্য দিনের ছেরান্দ কে দেখেরে হারামজাদা। খিদেয় পেট জ্বলছে, নবাবপুত্তুর ছেরান্দ দেখবে।' একটা গলির মুখ আসতেই স্বপ্না দাঁড়ায়। গলিটার দিকে তাকায়। লম্বা দেওয়ালের ছায়ায় গলিটা বড়ই নির্জন। গলিতে লোকজনের বিরল যাতায়াত। কিছুদূর এগিয়ে গেলেই শ্মশান। এই সরু গলির মুখ থেকে একটু এগিয়ে গেলেই আম গাছ। স্বপ্না আম গাছের ছায়ায় এসে দাঁড়ায়। পিছু পিছু স্বপ্নার মা এবং ওর ছোট ভাই। স্বপ্নার মা রেগে গিয়ে ভাবে— মুখপুড়ী আবার এখানে কেন?' আম গাছের ছায়া ফেটে রোদ্দুরের আলো ঢুকে যায় স্বপ্নার খোলা প্যাকেটে। ভেতরে চারটে লুচি, চারপিস শুকনো আলুর দম। স্বপ্নার মা দেখে বলে – কাশ্মীরি আলুর দম। ভাল ঘিয়ের লুচি।' ছোট ভাইটি প্যাকেটের ভেতর থেকে দরবেশটা বের করে আনে। একটা কামড় লাগিয়েই বলে –'বড় সাইজের মা।' চিবোতে গিয়ে ছেলের কথায় তোতলামি এসে যায়। মা হেসে ছেলের কথায় উত্তর দেয়,—'ছোচা। ঘরে যাওয়া পর্যন্ত তর সইলো না।'

খাবারগুলি দেখেই চোখের নিমেষে স্বপ্না ফ্রকের উপর পরা নাইলনের ময়লা শাড়িটা খুলে মার হাতে দিয়ে বলে—'দাঁড়াও এখানে। আমি এখুনি আসছি।' কিছুদূর গিয়ে আবার ছুটে এসে শাঁখাজোড়া মার হাতে দিয়ে বলে 'রাখো'। বলেই হাত দিয়ে কপালের সিঁদুর তুলে, শুকনো লালচে চুলগুলো আলুথালু করে ছুটে গিয়ে লাইনের শেষে আবার দাঁড়ায়। যখন প্যাকেট নিয়ে ফিরে আসে তখন মা বেটা দুজনেই একসাথে বলে—'ভালোই হলো। রাতের খাবারের ঝামেলা চুকলো।' স্বপ্না সহজ সরল হাসিতে উত্তর দেয়—'ইস্। এটা ওর জন্য। বলে গেছে আজ রাতে আসবে।'

□□□ বালিকার ক্রীড়া-সংবাদ □□□

উত্তরপাড়ার এক উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবারে ছমাসের চুক্তিতে বাড়ির কাজকম্মের জন্য বর্ধমান জেলার অন্তর্গত চপলডাঙা গ্রাম থেকে বারো বছরের মিঠুকে ওর মনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আনা হয়। মিঠুকে উত্তরপাড়ার নিজস্ব বাড়িতে নিয়ে আসে এ বাড়ির গিন্নী মালবিকা বসুর ছোট ভাই। ছোট ভাই অসিত দিদির কাছেই থাকে। দুবার বি. এস সি, পরীক্ষা পাশ করতে না পেরে এখন শর্টহ্যান্ড শিখছে।

মিঠু দেখতে কালো। তবে ওর কালো রঙ অন্ধকারে মিশে যায় না। গ্রাম্য উজ্জ্বলতা ওর কালো রঙে মেশানো আছে। লোডশেডিং-এর অন্ধকারে খুঁজে পেতে অসুবিধে হয় না। মাথাভর্তি আলুথালু একরাশ কোঁকড়ানো চুল, শুকনো লালচে চুলের গোড়ায় উকুন থিক্ থিক্ করছে। মালবিকার ভয় ওর দশ বছরের মেয়ে তনুর মাথায় না যেন উকুনেরা এসে বাসা বাঁধে। তাহলে ইংরেজি স্কুলের ছাত্রী তনুর প্রেস্টিস্ নিয়ে টানাটানি। মালবিকার বন্ধুর মেয়েকেতো ওভাবেই স্কুল থেকে ছাড়িয়ে দিয়েছে। কি লজ্জা! এখন মালবিকার বন্ধুর মেয়ে বাঙলা স্কুলে পড়ে ক্লাসে সেকেন্ড হয়। অতঃপর স্থির হয়, মিঠুকে ন্যাড়া করে দাও। মিঠু ন্যাড়া হয়। আর তনুমিকার জন্য দামী উকুনের ওষুধ আসে।

মালবিকার সুপারিশেই মিঠু এ বাড়িতে আসে। সেদিনই সুপারিশটা মাথায় আসে যেদিন মালবিকার আরেক বড় ভাই বাসুদেব যে চপলডাঙ্গাতেই বিধবা মার সাথে থাকে এবং চাষবাস দেখাশোনা করে, দুদিনের জন্য উত্তরপাড়ায় এসে দিদিকে কথায় কথায় বলে—'কানাই মণ্ডল বড় মেয়ের বিয়ের জন্য তিনশ টাকা ধার নিয়েছে আমার কাছ থেকে।' এই কানাই মণ্ডলের ছোট মেয়ে মিঠু। কানাই আগে ছিল ভাগচাষী। পরে নাম রেকর্ডভুক্ত না হওয়ায় বাসুদেবদের জমিতে মজুর খাটে। এই সংবাদ শোনার পর পরিকল্পনা মাফিক কাজ হয়। যতদিন কানাই টাকা শোধ করতে না পারবে ততদিন মিঠু মালবিকাদের বাড়িতে কাজ করবে। মাসে মাসে কানাইকে আর সুদ গুণতে হবে না। পরিকল্পনার পর বাসুদেবের সাথে অসিত যায় চপলডাঙায়। কানাই সব বিত্তান্ত মন দিয়ে শোনে। কানাই-এর বৌ প্রথম প্রথম গররাজি হয়। ভাল থাকা, ভাল খাওয়া, ঘরে বসে সিনেমা দেখা, এসব শুনে রাজি হয়। মিঠু কিন্তু এসব শুনেও রাজি হয় না। কিন্তু সবাই মিলে যখন

বললো ছমাস থাকার কথা তখন মিঠু বাবার দুখের কথা বুঝতে পেরে অসিতের সাথে উত্তরপাড়ায় চলে আসে।

মিঠু আসার পর থেকে মালবিকা ঠিকা ঝিকে ছাড়িয়ে দেয়। একজন খাবার জল দিত মাসিক বেতনে তাকেও ছাড়িয়ে দেওয়া হয়। সাতজনের দুবেলা এঁটো বাসন মাজতে হয় মিঠুকে। বাইরে থেকে নিয়মিত ছ বালতি জল আনতে হয়। খাবার জল টিউবওয়েল থেকে পাম্প করে তুলে আনতে হয়। চায়ের কাপডিস চামচ ধোয়ামোছা লেগেই আছে। এমনকি জলখাবারের আগে চামচটা পর্যন্ত মিঠুকে ধুয়ে দিতে হয়। মালবিকার দশবছরের মেয়েটা তনু পর্যন্ত 'আদেশ এ পরিবারে জন্মগত অধিকার' শিখে গেছে। কোনদিন, কোনসময় এই তনুমেয়েটা একগ্লাস জল পর্যন্ত গড়িয়ে খায় না। আদেশ না মানলে প্রথম প্রথম বলতো 'এত খাবি, এতবার খাবি. করবি না ? করতে হবে।' আসলে এই সংলাপটি মালবিকা এতোবার বলে মিঠুকে যা তনুর মুখস্থ হয়ে গেছে এবং সেও বলতে শিখেছে। ঘরে এদের আত্মীয়স্বজন বা তনুর বাবামার বন্ধুবান্ধব এলে এরা মিঠুকে আদেশ করে না। বরং সেসময় যদি তনু মিঠুকে কোন কিছুর জন্য আদেশ করে, তখন মালবিকা তনুকে শাসন করে। তনু মায়ের এমত-প্রকারের নকল শাসনের সাথে খুবই পরিচিত। সেমুহূর্তে মার কথা শোনে। নিজেরাই তখন কাপডিস প্লেট চামচ জলের গ্লাস ধুয়ে নেয়। মিঠুকে কাচতে হয় বিছানার চাদর, বালিশের ওয়ার, জানালা দরজার পর্দা, গেঞ্জি, জাঙ্গিয়া, ব্লাউজ-ব্রা-রুমাল. জামা কাপড়. শাড়ি। প্রতিদিনই কিছু না কিছু। মিঠুকে একতলা দোতলা মিলে চারটি ঘর, ডাইনিং পেস, বারান্দা মুছতে হয় নিয়মিত। একদিন মিঠু একগাই কাপড় কাচতে-কাচতে বাথরুমেই ঘুমিয়ে পড়েছিল। মিঠু কোথায় ? মিঠু কোথায় ? খোঁজ করতে করতে অসিত বাথরুমে পেচ্ছাব করতে আসে। এসে দেখে মিঠু ঘুমিয়ে আছে বাথরুমে একগাদা কাপড়চোপড়ের উপর। এ রকম অবস্থায় মিঠুকে দেখতে পেয়ে রাগে গা জ্বলে যাওয়া শরীরে অসিত মিঠুর পাছায় কষে মারে এক লাথি। চোখ খুলে ড্যাব্ ড্যাব্ চোখে মিঠু অসিতের দিকে তাকিয়ে থাকে খানিকক্ষণ। মালবিকার একমাত্র দেওর অশোক মালবিকার ছোট ভাই অসিতের এরকম অমানবিক আচরণের তীব্র সমালোচনা করে।

একদিন মিঠু কুয়োর জল তুলতে গিয়ে কুয়োর ভিতরের পাত ভেঙ্গে ফেলে। মালবিকা এসে থাপ্পর মারে। মিঠু তাল সামলাতে না পেরে কুয়োর ধারে পড়ে যায়। মাথাটা শক্ত সিমেণ্টে ধাক্কা লেগে ফুলে যায়। এর ফলে মিঠুকে কুড়ি বালতি রাস্তার টিউবওয়েল থেকে জল তুলে এনে বাথরুমের চৌবাচ্চা ভরতে হয়। ষোল বালতি জল আনার পর যখন পুনরায় মিঠু টিউবওয়েল থেকে জল আনতে যায় তখন টিউবওয়েলে ছিল লোকের ভিড়। লাইন দিয়ে

সবাই হাতে বালতি বা কলসি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। টিউবওয়েলের পাশেই ছিল একটি বড়সবো শেফালি গাছ। সেই গাছের মায়ের মতো ছায়া তার আঁচলখানি বিছিয়ে দিয়েছে বসুন্ধরার উপর। সেই বিছানো ছায়ায় বিশ্রাম করতে করতে মিঠু ঘুমিয়ে পড়ে খালি বালতির উপর মাথা রেখে কাত হয়ে। হাওয়ায় কিছু শুকনো পাতা, কিছু শুকনো শিউলি ফুল ওর চোখে কপালে ঝরে পড়ে। মিঠু আসছে না কেন? মিঠু আসছে না কেন? এরকম একটা হইচই উঠতেই অসিত রাস্তার কলে যায়। দেখে ভিড় নেই। আর দেখে মিঠু শিউলি গাছের ছায়ায় ঘুমিয়ে আছে। শক্ত হাতে চুলের মুঠির ব্যথা-লাগা টানে মিঠুর ঘুম ভেঙে যায়। চোখ খুলে ড্যাব্ ড্যাব্ চোখে মিঠু অসিতের মুখের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকে। মালবিকার একমাত্র দেওর অশোক বৌদির ভাইয়ের এই বিশ্রী আচরণের জন্য পুনরায় সমালোচনা করে।

একদিন তনুমিকার জন্মদিন ছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সাধারণ মেয়ে' কবিতাটিকে নৃত্যনাট্যরূপ দিয়েছিল তনুর মা। তনুর মা ছোট ছোট মেয়েদের নাচ শিখিয়েছিল। ছোটখাটো হইচই, গান, নাচ এসব দিয়ে তনুর জন্মদিনের অনুষ্ঠানটিকে মূর্ত করে তোলা হয়েছিল। এরপর সবাই চলে যায়, প্রতিটি ঘর শুনশান। খাবারের প্লেট, গ্লাস, চামচ, পেপসির স্বচ্ছ প্যাকেট চারদিকে ছড়ানো। আর তখনি মনে পড়ে যায়। তনু একগ্লাস জল চায়। ডাকতে ডাকতে তনুর গলা শুকিয়ে যায়। নরম খাটে শুয়ে আবার জল চায়। মিঠুর সাড়া পায় না। আবার জলের জন্য চেঁচায়। সাড়া নেই। তনুর বাবা ঘণ্টাখানেক আগে বাড়ি ফিরে বিশ্রাম করছিলেন। তিনি বিদেশি কোম্পানিতে কাজ করেন। কাজের পর সেই অফিসের শ্রমিক ইউনিয়নে যান। শ্রমিক য়ুনিয়নের তিনি সম্পাদক। বাইরের ঝামেলা এতো বেশি যে ঘরের ঝামেলায় তিনি থাকেন না। কিন্তু ডাকাডাকিতে বিরক্ত হয়ে তিনি একবার ছাদে যান। বিধবা মায়ের মতো ম্লান জোছনা তার ছেঁড়া আঁচলখানি সারা ছাদে বিছিয়ে রেখেছে। সেই ময়লা আঁচল জড়িয়ে মিঠু ঘুমিয়ে আছে। জোছন আকাশে মাঝে মাঝে পাতলা কালো মেঘের ছায়া মিঠুর শরীরের উপর দিয়ে ভেসে যায়। তনুর বাবা তমোনাশবাবু মিঠুর কানটা ধরে টেনে তোলে। চোখ খুলে মিঠু ড্যাব্ ড্যাব্ চোখে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকে তনুর বাবার দিকে। অশোক দাদার এই আচরণটাকেও সমালোচনা করে।

একদিন মালবিকা স্কুলে গেছে। মর্নিং স্কুল। ফেরে এগারোটায়। মালবিকার বোন রান্না করছিল। মিঠু তরকারি কোটার পর মাছ কুটছিল। সিং মাছ, কৈ মাছ এলে মিঠুর দায়িত্ব সেসব মাছ কুটবার। মাছ কুটতে গিয়ে সিং মাছের কাঁটা কড়ে আঙুলে লেগেছিল। মিঠু টিপে টিপে রক্ত বের করছিল। মাছ কোটা হয়ে গেলে সে ধুয়ে দেয়। তারপর দোতলায় গিয়ে

নিজের হাতে তুলোয় ডেটল্ ভিজিয়ে ঘষে। তনু সেটা দেখতে পায়। মিঠুর হাত থেকে ডেটলের শিশিটা কেড়ে নিয়ে মা-বাবার মতো কানটা ধরে মিঠুকে ধমকায়। ধমকানোর কণ্ঠস্বর শুনে তনুর মাসি দোতলায় আসে। তখনো তনু মিঠুর কানটা ধরে আছে। মিঠু ড্যাব্ ড্যাব্ চোখে খানিকক্ষণ একবার তনুর দিকে, আরেকবার তনুর মাসির দিকে তাকিয়ে থাকে। তনুর মাসি মিঠুর স্পর্ধার সমালোচনা করে। মিঠুকে সতর্ক করে দেয়। কোনদিন যেন সে নিজের হাতে কোন কিছু না ধরে। মালবিকার একমাত্র দেওর অশোক বৌদির বোনের এ ধরণের বিশ্রী আচরণের তীব্র সমালোচনা করে।

তনু ফ্রিজের হাতল ঢিলে করে দেয়। নাম দেয় মিঠুর। মিঠু মার খায়। টিভির কাঠের ঢাকনা দিতে গিয়ে আটকে যায়। তনু পারে না। ডাকে মিঠুকে। মিঠু রাজি হয় না। তবুও মিঠুর নামে দোষ হয়। মিঠু মার খায়। এভাবেই মিঠুর দিন যায়, রাত যায় মাস যায়, বছর যায়।

একদিন মিঠুর বাবা কানাই আসে ঠিক এক বছর পর মিঠুকে নিয়ে যেতে। বাবাকে দেখে মিঠুর আনন্দ হয়। শরীরের ভিতরে চঞ্চল পাখির মতো মিঠুর মনটা ভিতরেই ছট্‌ফট্ করে। পাখী বেরোতে চায়। 'ভালো আছিস্' বাবার প্রশ্নের উত্তরের ভাষা মরে যায় মিঠুর গলায় এসে। বাঁকা ঘাড় কথা বলে। সকালের রোদের কণার মতো ঠোঁটের কোনায় হাসি এবং মুক্তোর মতো উজ্জ্বলতা চোখে ঝরে পড়ে।

মালবিকার দাদা বাসুদেবের চিঠি নীল জামার বুকপকেট থেকে সযত্নে বের করে ভাঁজ খুলে কানাই তুলে দেয় মালবিকার হাতে। মালবিকা শ্বেতপলা ও হীরে পরা তিনটি আঙুল দিয়ে ধরে চিঠিটি। পড়ে কানাই আড়াইশ টাকা শোধ করেছে। পঞ্চাশ টাকা পুজোর পর দেবে বলে কথা দিয়েছে। মিঠুকে দেখতে পাচ্ছে না। চিঠি পড়া শেষ হলে কানাই শোনে, মালবিকার কঠোর শাসন—'না যেতে পাবে না মিঠু। টাকা শোধ হোক। পুজোর পর যাবে'। তখন কানাই-এর শরীরের কয়েক লিটার রক্তের বিবর্ণতায় শরীরের আধ ময়লা আধ ফর্সা চামড়া যেন নিউজপ্রিন্টের কাগজ। শত শারীরিক অত্যাচারেও যে মিঠুর চোখ দিয়ে এক ফোঁটা চোখের জল গড়ায় না সেই মিঠুর চোখ দিয়ে মুক্তোর মতো মূল্যবান ও স্বচ্ছ জল ফোটা ফোটা ঝরতে থাকে। শারীরিক অত্যাচারের চেয়েও মনের ব্যথা যে কতখানি যন্ত্রণাদায়ক মিঠু বুঝতে পারে।

খাওয়াদাওয়া বিশ্রাম সেরে বিকেলের ট্রেন ধরারর জন্য কানাই মণ্ডল বাড়ি থেকে বেরিয়েই দেখে মিঠুকে। দুহাতে এ্যালুমিনিয়ামের দুটো জলভরা বালতি নিয়ে অতিকষ্টে মিঠু আসছে। বাবা এবং মেয়ে দুজনে কাছে আসতেই খানিকক্ষণ বোবা হয়ে মুখোমুখি দাঁড়ায়। তারপর 'পুজোর পর তোকে নিয়ে যাবো' এই আশ্বাস দিয়ে দ্রুত হেঁটে চলে যায়। কিছুদূর যেতেই কানাইয়ের

চোখ ছলছলিয়ে ওঠে। মিঠু রাস্তার উপর বালতি দুটো নামিয়ে বাবার যাওয়ার দিকে তাকিয়ে থাকে। 'বাবা' এমত একটা তীব্র চীৎকার বের হবার মুহূর্তে বুকের ভেতর তীরবিদ্ধ যন্ত্রণা ফুটে ওঠে। চীৎকারটা বুক থেকে বের হতে পারে না।

মালবিকার স্বামী তমোনাশবাবুর ছোট ভাই অশোক আর এ বাড়িতে থাকে না। মিঠুর ব্যাপারে প্রতিবাদ করা মালবিকার এবং মালবিকার ভাইবোনদের খুবই অপছন্দ। এ নিয়ে তর্ক বিতর্ক হয় অশোকের দাদার এবং মালবিকা-বৌদির এভাবেই পারিবারিক অশান্তি অশোককে তাড়া করে নিয়ে যায় দাদার মন থেকে অনেক দূরে। ফলত 'তোর বৌদি আর 'মিঠুর ব্যাপারে তুই আর কোনদিন নাক গলাস নে অশোক' এ কথা দাদার কাছ থেকে বিশেষ করে একজন শ্রমিকদরদি য়ুনিয়নের সম্পাদকের কাছ থেকে শোনার পর এ বাড়িতে থাকতে আর ইচ্ছে করেনি অশোকের। দাদার এরকম চূড়ান্ত কঠোর অনুশাসন অশোকের কাছ থেকে শোনার পর ওর বিবাহিত দিদি মা-মরা অশোককে নিজের কাছে রেখে দেয়।

কিন্তু মিঠুর বাবার আসা এবং ফিরে যাওয়া, মিঠুর আবার থেকে যাওয়া, পঞ্চাশটি টাকা শোধ করতে না পারা এসব শোনার পর একদিন অশোক দাদার বাড়িতে যায়। অনেক দিন পর অশোকদাকে দেখে মিঠুর আনন্দ হয়। গোমরা মুখো মিঠুর মুখে হাসির দাঁতের রেখা ফুটে ওঠে। সেদিন বাড়িতে কেউ ছিল না। মিঠু গ্যাসের উনোন ধরিয়ে অশোকদাকে চা করিয়ে খাওয়ায়। ফ্রিজ থেকে মিষ্টি আর ঠাণ্ডা জল দেয়। রঙিন টিভির সুইচ টিপে দেয়। এরপর যখন জানতে পারল অশোকদা ওকে চপলডাঙায় নিয়ে যাবে কাউকে না বলে, তখন মিঠু কেঁদেই ফেলে। বলছিলো মিঠু 'তুমি তো টিশুনি করো। যদি তোমাকে যেতে না দেয়।' বি, এস সি, পাশ বেকার ছেলে অশোক হাসে।

যেদিন মালবিকা জানতে পারলো এ বাড়িতে অশোক এসেছিল তার পরের দিন থেকে মিঠুকে আর পাওয়া গেল না। এ সংবাদ পাওয়া মাত্র তমোনাশবাবু কাছেই থাকে ছোটবোন, সেখানে যান। অশোককেও সেখানে পাওয়া যায় না। মালবিকা স্বয়ং মিঠু ও অশোককে না পাওয়ার সংবাদ অশ্লীলভাবে চারদিকে রাষ্ট্র করে দেয়। প্রথমে তিনি রাষ্ট্র করেন নিজের প্রাইমারি স্কুলে যেখানে তিনি পড়ান। প্রথমেই শুরু করেন 'ছিঃ ছিঃ' ধ্বন্যাত্মক শব্দ দিয়ে।

পাঁচদিন পর মালবিকা বসুর নামে একটি চিঠি আসে চপলডাঙা থেকে। লিখেছে বাসুদেব, মালবিকার বড় ভাই। 'কানাই পঞ্চাশ টাকা শোধ করে দিয়েছে। পুকুরে বাগানে খেলার মাঠে মিঠুকে ঘুরতে ফিরতে ছুটতে দেখতে পাই। এই সাঁতার কাটছে, এই পেয়ারা পাড়ছে, এই এক্কা দোক্কা খেলছে। ওর বয়সি গ্রামের মেয়েরা ওর সাথে ঘুরছে খেলছে ছুটছে।

অনেকবার ওকে ডেকেছি। ও আমাদের কাছে আসে না। ও আমাদের কথা শোনে না। তবুও জানতে অসুবিধা হয়নি অশোক ওকে এখানে নিয়ে এসেছে। জামাইবাবুকে বলবে, অশোক আমাদের বাড়ি আসে নি, কারোর সাথে দেখা করেনি। মিঠুকে রেখেই অশোক চলে গেছে। এমন কথা শুনি যে অশোকই কানাইকে পঞ্চাশ টাকা দিয়ে গেছে। তা ও ফেরত নেবে না বলে দিয়েছে। এসব জানতে মিঠুকে যতবার ডেকেছি, ততবারই ও আমাদের এড়িয়ে গেছে। ওর চোখমুখের চাহনি দেখে মনে হয় ও আমাদের আর আগের মতো ভালবাসতে পারছে না। বরং ঘৃণা করতে শিখেছে।

মিঠুর একটা বাতিক দেখে গ্রামের কিছু কিছু পরিবার বিরক্তি প্রকাশ করছে। মিঠু যে বাড়িতে দেখে, বাড়ির লোকেরা খাঁচায় পাখি পুষেছে, সেই বাড়িতে চুপি চুপি গিয়ে পাখি ছেড়ে দিয়ে আসে।

গ্রামে মিঠুদের এ এক নতুন খেলা শুরু হয়েছে।'

— —

□□□ গোল্ডফিস □□□

'তো, আমাদের এই মহান্ দেশে একশ্রেণীর নাগরিক নিয়মিত স্বপ্ন··' বলেই রিস্টওয়াচ দেখেন, বলেন, 'আজ থাক!' মুন্না জানে সাতটা পঁয়তাল্লিশের পর থেকেই টিউটরের চোখ তিন মিনিট বা দু'মিনিট বাদে বাদে বার বার ঘড়ির দিকে থাকে। আটটার ঘরে এসে কাঁটা দাঁড়াতেই তিনি ভুলে যান মুন্না নামে তার একটি ছাত্র আছে যাকে সন্তান ভাবা যায় বা যাকে আদর্শায়িত করা যায়। এভাবেই মুন্নার পড়া শেষ হয়, অভ্যস্ত আটটায়।

বই খোলা। পাখার হাওয়ায় পাতার ফর্‌ফর্‌ শব্দ ঘরের নৈঃশব্দ ভাঙে। মুন্না পাশের ঘরে যায়, মার পাশে বসে। আত্মমগ্ন মা রঙিন মাছের খেলা দেখছে, সামনে একোরিয়াম পাশে মুন্না। আজ বিকেলে মুন্নার মা মমতা দুটো রঙিন মাছ কিনে এনেছে। একটি গোল্ডফিস, অন্যটি নীল সায়ামিজ ফাইটার। সায়ামিজ ফাইটারের আরও রঙ হয়, লাল সবুজ বেগুনি। মমতার পছন্দ নীল। মাছের খেলা, মাছের চলাফেরা, মাছের ছোটাছুটি, ওদের ঘুমনো, ওদের খাওয়া, জীবনপ্রণালী এসব দেখা মমতার একটি পুরনো হবি। ছোটবেলা থেকেই মাছের সাথে ওর সখ্যতা। প্রিয় বলতে ওর কেউ নেই। মাছই ওকে এনে দেয় প্রিয়তা, এনে দেয় স্বপ্ন। মমতা রঙিন মাছ হয়। স্বপ্ন ভাসায়। ভাসিয়ে নিয়ে যায়।

মমতাকে আত্মমগ্নতা থেকে ফিরিয়ে আনে মুন্না 'মা দ্যাখো নীল ফাইটার হাইগ্রোফিলারের পাশ দিয়ে গিয়ে গোল্ডফিসকে আক্রমণ করছে!' মার কাছে থেকে শেখা হাইগ্রোফিলা একপ্রকার জলজ উদ্ভিদ। আরও শব্দ আছে। সবই ইংরেজী নাইটিলা, এ্যানাকারিস এসব জলজ উদ্ভিদের নাম ইংলিশ মিডিয়ামের ছাত্র মুন্নার অনায়াসে আয়ত্বে এসে যায়! এসব জলজ উদ্ভিদ একোরিয়ামে বাড়ায় অক্সিজেনের মাত্রা। মুন্নার কথা শোনার আগেই মমতার মন নষ্ট হয়ে যায়। নীল ফাইটার চার ইঞ্চি লম্বা গোল্ডফিসকে বার বার আক্রমণ করছে। গোল্ডফিস তেমন ছোটাছুটি করতে পারছে না, লাল মাছটার চলাফেরায় দুর্বলতার এলোমেলো গতি এনে দেয়। নিস্তেজ হয়ে পড়ছে মাছটা। ভেসে থাকতে চাইছে। ফাইটার গুতো মারলে তবেই চলছে, ছুটছে। খানিকটা গিয়ে আবার ভাসে। গোল্ডফিসের টানটান দুটো ল্যাজ মমতার উৎসাহকে ভিজিয়ে দেয়। এ ধরনের মাছ সহজেই পাওয়া যায় না। গোল্ড-ফিসের দুটো ল্যাজ এরকম একটা মাছ সংগ্রহের জন্য অনেকবার নিউ মার্কেটের দোকানে বলে রেখেছিল। কিন্তু যে আনন্দটা ছিল, সেটা এখন নষ্ট হয়ে যায়।

মমতার স্বামীও ছোটাছুটি করে, ছোটে কিন্তু স্বপ্নে ভাসে না। চলে, থামতে জানে না। দুঘণ্টা ওভার টাইম সেরে অফিস থেকে বের হয়ে কমার্সের একটি মেয়েকে পড়িয়ে ইন্সিওরেন্সের পার্টির খোঁজে এখানে সেখানে ঘুরে নতুন কেনা সল্টলেকের ফ্ল্যাট-এ রাত নটায় এসে হারমোনিয়াম-রিডের কলিংবেল টেপে। ভেতরে পাখির আওয়াজ হয়।

'মাছটা বোধহয় মারা যাবে'—একটা দীর্ঘনিশ্বাস, খুব ছোট দীর্ঘনিশ্বাস মমতার, 'দেখছিস মুন্না গোল্ডফিসটা কেমন খাবি খাচ্ছে। নাক দিয়ে মুখ দিয়ে বুদ্‌বুদ্‌ বেরোচ্ছে। আজই দশটাকা দিয়ে কিনে আনলাম। যদি মারা যায়, আহা রে গোল্ডফিসটার এতো কষ্ট!' মুন্না উত্তর দেবার সময় পায় না। হাতটা বাড়িয়ে কাজের মেয়ের কাছ থেকে কমপ্লানের কাপটা ধরে নেয়। আর সেসময় এক ছলক কমপ্লান মমতার শাড়িতে পড়লে মমতার দৃষ্টি এ্যাকোরিযাম থেকে সরে আসে। চোখ দুটো বড়ো হয়। কাজের মেয়েটার দিকে তাকিয়ে বলে, 'দিলি তো একশ টাকার দামের শাড়িটা নষ্ট করে। এমনিতে বাড়িতে পরার শাড়ি ।' মুন্নার গলা কানে আসে।

'ওর কি দোষ মা। তুমি এমনভাবে মাথাটা নাড়ালে।' ছেলেকে ধমকায়, তুই থাম। ডেপো। বাপের মতো হয়েছে। আমার সামনে ওদের মাথায় তুলবি না।'

'মা দ্যাখো, ব্ল্যাকমলি কি সুন্দর খেলা করছে টাইগার বার্বের সঙ্গে। হালকা হলদের ওপর কালো রঙের দাগগুলো টাইগারকে বেশ সুন্দর লাগছে। সুন্দর গোল্ডফিসটা কত কষ্ট পাচ্ছে। তাই না মা?' মুন্না এভাবেই মা-কে বাস্তব পরিবেশ থেকে সরিয়ে আনে। একোরিয়ামের ভেতর গোল্ডফিসের পাশে মা-র রেগে ওঠা মনটাকে স্বপ্নে ভাসিয়ে দেয় যেমন মুন্না এখনও বর্ষার জল পেলে কাগজের নৌকো ভাসিয়ে দেয়। কিন্তু তেতলার ফ্ল্যাটে সে ইচ্ছা এখন আর ফিরে আসতে পারে না।

মুন্নার বাবা অরিন্দম, মমতার স্বামী অরিন্দম, অফিস ক্লাবের কার্যকরী সদস্য অরিন্দম, অফিসের এ্যাসিসটেণ্ট অফিসার অরিন্দম, এম কম, এল এল বি অরিন্দম ছুটছে ছুটছে ছুটছে। প্রাইভেট ছাত্রীকে বলছে, 'ওসব রঙিন স্বপ্ন রাখো। ভারতবর্ষের অবস্থাটা বোঝ। ভারতে উদ্‌বৃত্ত শ্রমিক সংখ্যা কত জানো? কৃষি ক্ষেত্রে নিযুক্ত মোট শ্রমিকের বিশ ভাগ। উদ্‌বৃত্ত শ্রমিক কাকে বলে জানো? বিশ ভাগ অতিরিক্ত শ্রমিককে উদ্‌বৃত্ত শ্রমিক বলা হয়। কারণ জমি থেকে এদের সরিয়ে দেওয়া হয়। দেওয়া হলেও জমির উৎপাদন বিন্দুমাত্র হ্রাস পায় না। কিন্তু আর্থ ব্যবস্থার কাঠামো অনুন্নত হয়ে পড়ে। তাছাড়া জমিতে ট্রাকটর চালু হওয়ায় কৃষি শ্রমিকরা উদ্‌বৃত্ত হয়ে যায়। এসব বেকার শ্রমিকরা কোথায় চাকরি পাবে? কারখানাও বাড়ছে না। বাইরের দেশ

থেকে চাপে পড়ে প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ কিনে নিচ্ছে স্বদেশ। এসব উদ্‌বৃত্ত শ্রমিকদের কি হবে? এসব ভাবো? ভালভাবে পড়াশোনা করে বড় অর্থনীতিবিদ্‌ হয়ে এসব সমস্যার সমাধান করার কথা ভাববে।"

"স্যার আপনার এ মাসের টাকাটা।"

প্যাকেটে দুশ টাকার বেতন পকেটে পুরে অরিন্দম ছুটছে ছুটছে ছুটছে। ইন্‌সিওরেন্সের পার্টিকে বোঝাচ্ছে, 'মিঃ বোস আপনার ছেলের জন্য ইউনিট ট্রাস্ট অফ ইণ্ডিয়া এগিয়ে এসেছে। এবার আপনি ছেলের অর্থনৈতিক দিকটা ভাবুন। মিঃ বোস আপনি স্বপ্ন দেখবেন না। আগামিদিনের বাস্তব পরিবেশের ভাবনার মধ্যে আপনাকে আর এখন ডুবে থাকতে হবে না। সেটা ইউনিট ট্রাস্ট অফ ইণ্ডিয়া ভাবছে। আপনি ভাবুন চিলড্রেন্‌স গিফট গ্রোথ ফাণ্ড।' চাহেন তো বলি একটি বিনিয়োগ ৫ বছর অন্তর বোনাস ডিভিডেণ্ডের সাথে যা বারো গুণ অব্দি বাড়ে। মনে রাখবেন মিঃ বোস শিশুদের জন্য শুধু ভালবাসাই শেষ কথা নয়।'

সংগ্রামে পারদর্শী অরিন্দম এভাবেই ছোটে। ছুটতে ছুটতে রাত নটার পর দোতলায় উঠেই হাঁপায়। মনে হয় দোতলা থেকে তিনতলাটা অনেক দূর, অনেক সিঁড়ি তাকে ভাঙতে হবে। ভাঙতে হবে। ভাঙতে ভাঙতে এগোতে হবে, উঠতে হবে, পেঁছিতে হবে। ধীরে ধীরে পা ফেলতে হবে। একসময় অরিন্দম তিনতলায় উঠে আসে। কলিং বেল বাজায়। ঘরের ভেতর পাখি-ডাকার আওয়াজ হয়।

মুন্নাকে ঠেলে দেয় মমতা 'যা না খুলে দে। বোধয় তোর বাবা এসেছে।' বলেই বোবা চোখ ধরে রাখে একোরিয়ামে। গোল্ডফিস এখনও খাবি খাচ্ছে। নীল ফাইটার আর গোল্ডফিসকে আক্রমণ করছে না। সে এখন ব্লাকমলির আশেপাশে ঘুরছে। অরিন্দম ছেলেকে খুলতে দেখে বোঝে পরিচিত দৃশ্যটির অর্থ, মমতা গালে হাত দিয়ে রঙিন মাছেদের খেলা দেখছে। মমতার মুখ থেকে ভাঙা ভাঙা কিছু বিস্ময়সূচক শব্দ অরিন্দমের কানে আসে। ইঃ উঃ আঃ আহারে সংকেতমূলক শব্দগুলো দুঃখবোধকও বটে। কিন্তু মমতা কিসে দুঃখ পাচ্ছে ক্লান্ত অরিন্দম সেটা এই মুহূর্তে বিশ্লেষণ করতে পারছে না। অরিন্দম মাত্র জুতোর ফিতে খুলছে, আর তখুনি মমতা মাখা মাখা ভালবাসার টানে বলে, 'হ্যাঁগো, মাছের ডাক্তার আছে?' প্রশ্নটা কি পরিমাণে অদ্ভুত সেই ভাবনাটাও এখন অরিন্দমের মধ্যে নেই বলে সে আলতো স্বরে বলে 'জানি না।'

গোল্ডফিস তলিয়ে যাচ্ছে। মমতা সেখান থেকে চোখ সরিয়ে না এনে অরিন্দমের 'জানি না' কথার উত্তর দেয়, 'কি ভাবে যে এম কম. এল এল বি পাশ করলে? গরু কুকুরের ডাক্তার আছে। মাছের ডাক্তার নেই? আলবৎ আছে।

আমি এখুনি ডঃ সোমকে ফোন করছি। বাপের বাড়িতে আমাদের টমকে ভাল সারিয়েছিল।'

অরিন্দমের জামা খোলা হয়ে গেছে। লুঙিটা খুঁজে বের করতে একটু সময় নেয়। মমতা সাহায্যে এগিয়ে আসে না। গোল্ডফিস ভাসছে। লুঙি পরে অরিন্দম বাথরুমে যায়।

বাথরুম থেকে অরিন্দম বলে 'ডঃ সোমই ভাল বলতে পারবে। চিরকালটা আমার প্রিয়তমা মমতা দেবী রঙিন মাছের মতো রঙিন স্বপ্ন দেখে এলো। এলো কি, দেখা এখনও শেষ হয় নি।' বাথরুমে জলের শব্দ হয়। শব্দ একোরিয়াম পর্যন্ত আসে। জলের শব্দে অরিন্দমের কথা শোনা যায় না। জলের শব্দে সময় খানিকটা ডুবে থাকে। বাথরুম থেকে অরিন্দম বের হয়। মমতা পুনরায় স্বামীর কথা শোনে 'মানুষের কষ্টের জীবনটাকেতো চোখের আড়ালেই রেখে দিলে। মাছের কষ্ট দেখে কষ্ট পাচ্ছ। মানুষের কষ্ট দেখে কষ্ট পাচ্ছ না। আশ্চর্য। জীবনের এই ম্যাজিক শো দেখার জন্য হাততালি দেওয়ার লোকের এখন বড়ই অভাব জানবে'। অরিন্দমের এসব মুখস্থ করা নিম্নমানের সাংসারিক কথাবার্তাকে মমতা গুরুত্ব দেয় না। 'ডিসগাস্টিং' কথাটি ভয়েস্ থ্রো করে সে একোরিয়ামের পাশেই ফোনের ডায়াল ঘোরায়। প্রথমবারেই ডঃ সোমকে পাওয়া যায়।

'হ্যালো, ডঃ সোম বলছেন' ?

'সোম বলছি।'

'আমি মমতা, শিবেনবাবুর মেয়ে।'

'চিনতে পেরেছি। কি ব্যাপার বলো ? টম ভাল আছে তো ?

টম ভাল আছে। তবে প্রব্লেমটা কুকুর নিয়ে নয়, একটা রঙিন মাছ নিয়ে। আমার গোল্ডফিসকে বাঁচিয়ে দিতে হবে ডাক্তারবাবু। মাছটা খুব খাবি খাচ্ছে। মুখ দিয়ে কি যেন বের হচ্ছে ? ডাক্তারবাবু মাছ কি বমি করে ?'

'আমি তো মাছের ডাক্তার নই, তুমি তো জানো আমি ডগ স্পেশালিস্ট।'

'প্লিজ কাকু, গোল্ডফিসটার একটা ব্যবস্থা করুন, খুবই রেয়ার কালেকসন, ডাবল টেল। আমার মনে আছে ছোটবেলায় আমার একোরিয়াম দেখে মাছকে ভাল রাখার পরামর্শ দিয়েছিলেন।'

'মাছটা ভাল করে দেখে এসে বল, আলপিনের ডগার মতো সাদা দাগ গায়ে দেখা যাচ্ছে কি না –।'

মমতা ফোন না রেখে একোরিয়ামের স্বচ্ছ কাঁচের ভিতর দিয়ে দেখে আলপিনের মতো ছোট ছোট সাদা দাগ। ফোনে কথা বলার আগে ফোনের মুখটা হাত দিয়ে চেপে ধরে বলে, 'প্লিজ অরিন্দম টিভির সাউন্ডটা একটু কমিয়ে দাও। তোমার কোন কষ্ট নেই, গোল্ডফিস মারা যাচ্ছে !'

তারপর ফোনে 'ছোট ছোট সাদা দাগ দেখতে পেয়েছি।'

ডঃ সোম বলেন, 'ওসব দাগ জলজ পোকার আক্রমণের ফলে হয়েছে। এক কাজ করো পাঁচ লিটার জলে এক ফোটা মেথিলিন ব্লু মিশিয়ে সেই জলে মাছটা তুলে ছেড়ে দাও। এছাড়া এটাও করতে পার, এক কাপ জলে ক্লোরোসাইসিটিন ট্যাবলেট মিশিয়ে দাও। সেই কাপের জল থেকে এক চামচ নিয়ে পাঁচ লিটার জলে মেশাও, তারপর গোল্ড'ফসটাকে ছেড়ে দাও। করে দ্যাখো গোল্ডফিসটা বাঁচতে পারে। ছাড়ছি—'

'এক মিনিট, ওষুধ দুটোর নাম যেন কি বললেন?'

'মেথিলিন ব্লু বা ক্লোরোসাইসিটিন, পাঁচ লিটার জলে—'আর কোন কথা না বলে ডঃ সোম ফোন রেখে দিলেন। রাখার শব্দ মমতা শুনতে পায়।

ফোন রেখে মমতা সাইড এপার্টমেণ্টে এসে দেখে অরিন্দম পার্টটাইম পেপার হাতে নিয়ে বাটিকের লুঙি পরে খালি গায়ে সোফায় গা এলিয়ে ফুল স্পিডে পাখা এবং ভিসিপি চালিয়ে চার্লি চ্যাপলিনের বই দেখছে টিভিতে। এসে মমতা পাশে বসে। লোমশ বুকে হাত বোলায়। মমতার এই আদরে অরিন্দম আনন্দ পায় না। কারণ ও জানে এমত আদরের একটিই অর্থ 'আদেশ পালন'। মুন্না ঘরে নেই। মাছের খেলা দেখছে আর গোল্ডফিসের দিকে নজর রেখে মাঝে মাঝে চেঁচাচ্ছে'মা মা গোল্ডফিসটা কি রকম করছে দেখবে এসো।' মমতা আরও অরিন্দমের কাছে যায়। অরিন্দম মমতার বুকের স্পর্শ অনুভব করে। মমতা অরিন্দমের আঙুল টানতে টানতে বলে তোমার খুব কষ্ট, আমি বুঝি। কিন্তু কি করবো বলো?' বাঙন মাছ পোষার শখটা আমি কিছুতেই ছাড়তে পারছি না, কেমন একটা স্বপ্নের গন্ধ পাই। আমি তো রাস্তায় দশটা বৌ এর মতো টো টো করি না। বলো।' অরিন্দম উত্তর দেয় না। টিভির পর্দায় কারখানা এবং শ্রমিকদের দৃশ্য। মমতা আস্তে আস্তে বলে, 'রাত হয়ে গেছে। তানালে আমিই যেতাম। তুমি যাওনা গো। ওষুধ দুটো নিয়ে এসো। এই ধরো কুড়ি টাকা।'

'খেপেছো! এখন যাবো এই রাতে তোমার মাছের জন্য ট্যাবলেট আনতে। এই সল্টলেক থেকে বসে ধরে উল্টোডাঙায়, না পেলে কলকাতায়। আমি ওসবের মধ্যে নেই। মরে গেলেও এখন আমি যেতে পারছি না—'

চার্লি'র ফিল্ম থেকে চোখ না ফেরানো অরবিন্দমের কথা বলার ঢঙ্ সহ্য করে মমতা বলে, 'প্লিজ অরিন্দম—মাছটা—।' অরিন্দমের সামনে দাঁড়ায়।

'দ্যাখো মম, এখন আমাকে বিরক্ত করো না। খাটুনির পর এরকম বিরক্ত আমার ভাল্লাগে না। সংসারের প্রতিটি কাজ আমাকে সামলাতে হয়। অসম্ভব, আমাকে একটু বিশ্রাম করতে দাও। আমার সামনে থেকে সরে দাঁড়াও। ফিল্মটা দেখতে দাও।'

মমতা সরে দাঁড়ায়। বলে, 'তালে আমিই যাই। ফেরার সময় ট্যাক্সি করে চলে আসবো। মুন্নাকে দেখো।'

এবার অরিন্দম টিভি থেকে চোখ সরিয়ে আনে। তাকায় মমতার দিকে। বলে, 'ট্যাবলেটের দাম পাঁচ টাকা। ট্যাক্সি করে যেতে আসতে পনেবো টাকা। উল্টোডাঙায় না পেলে কলকাতায়। আরও দশটাকা। মোট ত্রিশ টাকা। গোল্ডফিসটার দাম কতো?'

'দশ টাকা। রেয়ার গোল্ডফিস। দুটো ল্যাজ।'

'হোক গে রেয়ার। হিসেটাই বড় কথা। মারা যাক মম মাছটা। কাল আরেকটা কিনে নিও। একটা বুগ্ন মাছকে তোমায গছিয়েছে, ঠকিয়েছে। এবার অন্য দোকান থেকে কিনবে।' মম ও অরিন্দমের সংলাপ খানিক থেমে। সামনে টিভি চলছে। কারখানার শ্রমিকরা চেঁচাচ্ছে, নির্বাক দৃশ্য। কাট। চার্লি একদৃষ্টিতে মহিলা সেক্রেটারিব দিকে তাকিয়ে থাকেন। হঠাৎ সেক্রেটারি দৌড়তে থাকেন। চার্লিও তাকে অনুসরণ করেন। মহিলা সেক্রেটারি একটা জলের কলের পিছনে গিয়ে দাঁড়ান। চার্লি মহিলার পোষাকের পিছনের বড় বড় বোতাম দেখে ভীষণভাবে আকৃষ্ট হন। ৮৫ এম. এস-এ একজন গম্ভীর প্রকৃতির পীনোন্নত পয়োধরা মহিলা রাস্তা দিয়ে এগিয়ে আসছেন। দুটি বোতাম তার ঢাকা দুই স্তনের উপর। ৮৬ এম. এস এ চার্লি জলের কলের কাছে। মহিলাটি এগিয়ে আসে। চার্লি মহিলাটিকে দেখেন। মহিলা ভয়ে চমকে ওঠেন। তিনি দৌড়তে শুরু করেন। চার্লিও দৌড়ন। মম ও অরিন্দমের সংলাপ পুরো থেমে গেছে। দুজনে টিভির দিকে তাকিয়ে আছে। মমতা চুপচাপ এবং অন্যমনস্ক। অরিন্দম হঠাৎ মমের চুপচাপ থাকাটা ভালো বুঝছে না। উঠে ফ্রিজ থেকে নিজেই জলখাবার নিয়ে আসে। অফ মুড মমতা অন্য কিছু ভাবছে, অরিন্দম বুঝতে পারে। বলে, 'আমার কথা বললাম। এবার তোমার শখ তুমি বোঝো' বলেই প্লেট হাতে মমতার পাশে বসে। অরিন্দমের তুলোর মতো কথা মমতার ভেতর ঢুকলো কিনা সেটা মমতাই একমাত্র বলতে পারে। সে এখন অন্যমনস্ক। অন্য কিছু গভীরে ভাবছে।

গোল্ডফিস একটু একটু করে স্বপ্ন হয়ে যাচ্ছে
গোল্ডফিস বাল্যস্মৃতিকে টেনে আনে
জন্মদিনের উপহার একোরিয়াম থেকে গোল্ডফিস বের হয়ে আসে
এভাবেই বাল্যস্মৃতি গোল্ডফিস হয়
মমতা কিশোরী হয়। শরীরে স্বপ্ন তৈরী হয়
অরিন্দম আসে। অরিন্দম গোল্ডফিস হয। অন্য স্বপ্নের কথা বলে
গোল্ডফিস মমতার শরীরের ভিতর খেলা করে
স্বপ্ন প্রেম আনে। মমতা তরুণী হয়

প্রেম ধরে রাখে সংগঠিত স্বপ্নকে। গোল্ডফিস সেই স্বপ্ন নিয়ে আসে
স্বপ্ন জীবনের মধ্যে চলে যায়। জীবন গোল্ডফিস থেকে সরে যায়
অরিন্দম ও মমতা ঘর বানায়
স্বপ্ন ভাঙে, টুকরো হয়। জীবন যৌবনের গান গায়
গোল্ডফিস সরে যায়
অর্থের ফুটবলটা নিয়ে অরিন্দম গোলের দিকে ছুটছে

হঠাৎ মুন্না সাইড এপার্টমেন্ট থেকে চেঁচিয়ে মাঝখানের দরজায় দৌড়ে এসে দাঁড়ায় 'মা গোল্ডফিসটা মারা গেছে।' অরিন্দম মমতার দিকে তাকায়। মমতা টিভির পর্দা থেকে চোখ সরিয়ে অরিন্দমের দিকে ফেরায়। অরিন্দম ডান বাহুর ভেতর মমতাকে নিয়ে আসে। মুন্না ছুটে আসে। দুজনকে সরিয়ে মাঝখানে বসে।

শূন্য ঘরে রঙিন মাছেরা খেলা করে।

———

□□□ ঝড় আসে, ঝড় যায় □□□

ঈশান কোণ থেকে এক টুকরো কালো মেঘ উঠে আসছে। দুলাল ঘরে বসে হাঁটুর কাছে লুঙি গুটিয়ে মাথা নিচু করে মনোযোগী হয়ে পোস্টারিং করছিল পুরনো খবরের কাগজ ফেলে। ঈশান কোণে যে মেঘ জমেছে অতএব সেটা দুলালের বুঝে উঠবার কথা নয়। তবে ঝাপসা আকাশ থেকে কিছু আলো তখনো সরে যায়নি। রঙিন অক্ষরে সাজানো পোস্টারের গা থেকে বিকেলের অপরিচ্ছন্ন আলো বিছার মতো সরে যেতেই কালো মেঘের ছায়া পোস্টারগুলোকে ঢেকে ফেলে। মনোযোগী দুলাল এসব লক্ষ্য করে না। কিভাবে এবং কোন্ রঙে অক্ষর সাজালে জনগণকে সজাগ করে তোলা যাবে এসব নিয়ে ভাবছে এবং পোস্টারিং করছে। দেখে না দুলাল ছায়ার সরে যাওয়া পোস্টারের গা থেকে বা যেমন কোন কোন দিন মধুমিতা চুপিচুপি দুলালের এই ক্লাব ঘরে একগুচ্ছ বুনো ফুল নিয়ে ঢোকে ঠিক সেভাবেই ম্লান আলো ঘরে ঢুকে পোস্টারগুলোকে উজ্জ্বল করার চেষ্টা করে, তাও লক্ষ্য করে না দুলাল। এভাবেই আলো সরে যায়, ছায়া আসে। ছায়া সরে যায়, আলো আসে। এক সময় ঈশান কোণের খোঁপা খুলে যাওয়া মেঘ ছড়াতে ছড়াতে সারা আকাশ দখল করে নিতেই আলোর অন্তিমকাল এসে উপস্থিত হয়। আকাশ তখন ঝড়ের উদ্বৃত্ত মূল্যের দেদি-বিদেদি দামি কালো পোষাক পরে প্রস্তুত হয়। ঝড় তার শোষণের দণ্ড আকাশের বুকে গড়িয়ে দিতেই গর্-গর্ গুম-গুম গম্ভীর আওয়াজ ছড়িয়ে পড়ে।

সেই আওয়াজ দুলালের কানে ধাক্কা মারে। বাতাস আগেই বন্ধ হয়ে যাওয়ায় টিনের ঘরটায় গুমোট গরম দাপিয়ে পায়চারি করছিল, সেটা মেঘের আওয়াজের সাথে সাথেই বন্ধ হয়ে যায়। বাতাস বইতে শুরু করে। মনস্ক দুলালকে অন্যমন করে দেয় ঝড়ের প্রস্তুতি পর্ব। সে ব্রাশ হাতে উঠে দরজার কাছে গিয়ে বাইরের দিকে তাকায়। কালো মেঘে ঢাকা আস্ত আকাশের নিচে সামনের আম গাছটা আর জাম গাছটাকে আলাদা করা যাচ্ছে না। ঝড়ের ভয়ে জড়োসড়ো গুটিসুটি পাখিরা চুপচাপ শুনশান। দুলাল দুহাত উপরের দিকে তুলে সোজা শরীরটাকে ভেঙে হাই তোলে। হাত থেকে ব্রাশটা পড়ে যায়। পুনরায় দুলালের তন্দ্রাচ্ছন্ন দৃষ্টি টেনে নেয় ঘন কালো মেঘের আকাশ। দুলাল বুঝতে পারে ঝড় আসছে। ঝড়ের চিন্তাভাবনা দুলালকে অবশ করে দেয়। ঝড় দুলাল পছন্দ করে না। দুলাল আবার হাই তোলে। ছোটবেলার কথা মনে পড়ে। ছোটবেলায় ঝড়কে ভয় পেত দুলাল। ঝড় বিষয়ক দুটি

স্মরণীয় ঘটনা এখনও ঝাপসা হয়ে যায় নি। মনে থেকে গেছে মধুমিতার মামার ঘটনা। ধানকাটা নিয়ে বেশ বড়সড়ো একটা গণ্ডগোল হয়েছিল মধুমিতার মামা আর জোতদারের সঙ্গে। সেই সূত্রে মামা লাঠিয়ালের লাঠির আঘাতে আহত। আহত মামাকে দেখতে যাবার জন্য মধুমিতা বললে দুলাল বলেছিল 'ঝড় আসছে যে। আমি যাবু নি। ঝড়কে আমার ভয় নাগে।' বালকের কণ্ঠস্বরটি এখনও ধরা আছে। প্রাপ্তবয়স্ক দুলাল এখন আর 'যাবু নি' বলে না। একটা পাশের পর ভাষা কথাবার্তা মার্জিত হয়েছে। তবে দুলাল গিয়েছিল এবং গাছের ডাল ঘাড়ে পড়েছিল।

স্মরণীয় দুনম্বর ঘটনাটিও ওর বেশ মনে আছে। মধুমিতা তখন লাল পাড়ের লম্বা টুকবো দিয়ে বিনুনি করতো। হাটুঝুল ঢোলা ফ্রক পড়তো। দুলাল ছিল মাধ্যমিক ফাইনালের ছাত্র। কলকাতা থেকে নাটকের দল এসেছে। প্রথম দিন মিটিং। পরের দিন গান, নাটক। দুপুর শেষে সবাই বলাবলি করছিল, নাটক হবে না। ঝড় হতে পারে। বিকেলের দিকে মেঘ আরও ঘনিয়েছে। তবুও লোক যাচ্ছিল। কিন্তু দুলাল গেল না। সে দরজা জানলা বন্ধ করে ঘুমলো। মধুমিতা জানে দুলাল যাবে না, তবুও মধুমিতা একবার বলেছিল। সেদিন নাটক হল না বটে, পরের দিন হল। পরের দিন দুলাল ও মধুমিতা সেই নাটক দেখেছিল। সেদিন মধুমিতা গুছিয়ে একটি চমৎকার কথা বলেছিল; বলেছিল 'ঝড় এল, ঝড় গেল। তবুও ঝড়' নাটকটি হলো, আটকানো গেল না।' কথাগুলি দুলালের স্মরণ কোঠায় এখনও সযত্নে ধরা আছে।

গতকাল দুলালের নাইট ডিউটি শেষ হয়েছে। হ্যারিক্যান কারখানা শ্রমিক দুলাল সকাল দশটা পর্যন্ত ঘুমিয়ে স্নান খাওয়া সেরে ক্লাব ঘরে দুপুরেই চলে এসেছে পোষ্টার লিখতে। ঝড় আসছে দেখে দুচোখ জুড়ে ভাতঘুম আসছে, কিন্তু রাত আটটার মধ্যে পোষ্টার লেখা শেষ করে জমা দিতে হবে আগামিকাল বড় বড় নেতারা আসবেন কলকাতা থেকে, সদর জেলা থেকে স্কুল ময়দানে বড় জমায়েত হবে। লোকাল কমিটির কমরেডরাও থাকবেন। শহরতলির গলি, গলির ভেতর গলি থেকে মানুষজন মিছিল করে হাজার হাজার লাল পতাকা হাতে নিয়ে আসবে। আসবে গ্রামের ভেতর গ্রাম থেকে, আল ভেঙে, মাঠ ভেঙে, কাতারে কাতারে। শুনবে দেশের দুর্দশার কথা, কিভাবে সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদ বিচ্ছিন্নতাবাদ সাম্প্রদায়িকতা শ্রমিকশোষণ কৃষকশোষণ লকআউট অত্যাচার নিপীড়ন অপসংস্কৃতি দেশকে ক্ষতিগ্রস্থ করে তুলছে। এসব বক্তৃতা নিয়ে আলোচনা হবে, তর্কবিতর্ক হবে গ্রামেগঞ্জে শহরে শহরতলিতে। এভাবেই রাজনৈতিক সচেতনতা বড় শহর থেকে ছোট শহরে, ছোট শহর থেকে গ্রামে, গ্রাম থেকে গ্রামের ভিতরে ছড়িয়ে যাবে। হ্যারিক্যান কারখানার শ্রমিক দুলালের মধ্যেও ঢুকে যাবে। দুলাল ভাবে, ভাবতে ভাবতে হাই তোলে। হাই

তুলতে তুলতে ঘরের ভেতর ছড়ানো স্বহস্তে অঙ্কিত লাল নীল হলুদ গোলাপি পোস্টারগুলির দিকে তাকায় (এক) সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক। (দুই বিচ্ছিন্নতাবাদ নিপাত যাক। (তিন নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যমূল্য বাড়ছে কেন, জবাব চাই জবাব দাও। (চার) বন্ধ কলকারখানা খুলতে হবে। (পাঁচ) শ্রমিক ঐক্য জিন্দাবাদ। (ছয়) সাম্প্রদায়িকতা ধ্বংস হোক। (সাত সকলের জন্য চাকর চাই শিক্ষা চাই। (আট) কাজের অধিকারকে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দিতে হবে। নয়) বহুজাতীয় সংস্থায় শিল্প নীতি বাতিল কর। (দশ) দেশের ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখুন।

নানান রঙে অক্ষর বিন্যাসে এ রকম অনেক পোস্টার, রঙিন পোস্টার খবরের কাগজের উপর, সাদা কাগজের উপর লেখা। অক্ষরগুলো আলাদা আলাদা ফর্মে এবং স্টাইলে সাজানো। 'তুই একদিন বড় অক্ষরশিল্পী হবি রে দুলাল' গরিবের জ্বালা যন্ত্রণা বুঝতো না বলেই সৌরেন স্যার এসব বলতে পারতেন দুলালকে। কারণ দুলাল অক্ষরশিল্পী হতে পারে নি। মাঝে মাঝে হারিয়ে যাওয়া ছোট শব্দগুলো গাঢ় রঙের জোরে জনগণের ব্যস্ত চোখকে টেনে নেবেই। দুলাল সাধারণত ব্রাউন রঙ পছন্দ করে না। এমন কি সবুজ রঙের প্রতিও ওর আকর্ষণ কম। দুলাল বেশি পছন্দ করে পিকক্ ব্লু, তারপরই মেরুন কালার এবং টকটকে লাল। মাঝে মাঝে অরেঞ্জ কালারের ব্যবহার পছন্দ করলেই কি দুলাল সব রঙ পায়? পায় না। তখন সামান্য কয়েকটি রঙের সাহায্যে অক্ষরের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে দুলাল। মাঝে মাঝে পোস্টার গুলোর দিকে তাকিয়ে থাকে দুলাল। তখন ওর মনে হয় পোস্টারগুলো যেন গণ আন্দোলনের অস্ত্র হয়ে উঠছে।

ঘন মেঘের কালো ছায়া খোলা দরজা দিয়ে ঘরের ভিতর ঢুকে ঘর এবং পোস্টারগুলো অন্ধকারে ঢেকে দেয়। শুকোবার জন্য ছড়ানো পোস্টারগুলোর পাশে জায়গা করে হাই তুলতে তুলতে শুয়ে পড়তেই ঘুম ছড়িয়ে পড়ে দুলালের দুচোখে। স্বপ্ন নেমে আসে। ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে জেগে ওঠে বা স্বপ্নের মধ্যে দুলালের ঘুম ভেঙে যায়। দুলাল দেখে সে একটি সমাজতান্ত্রিক দেশে বাস করছে। শ্রমিক চালিত কারখানার অরগানাইজিং মিটিং সেরে বাড়ি ফিরে দেখে খাবার টেবিলে গরম ভাতের থালার সামনে সে বসে আছে চেয়ারে। টেবিলের ওধারে আরও দুটো চেয়ারে, মা ও মধুমিতা। কিছুদূরে টেবিল ফ্যানের হাওয়া। কোথায় গেল মা র তালপাতার ভাঙা হাতপাখা নিয়ে সামনে বসে মাছি তাড়ানো। কোথায় গেল ঘিনঘিনে জলার ভেতর ছড়ানো নোংরা থেকে উড়ে আসা মাছির ঝাঁক। সুবাসিত ভাতে কুচো চিংড়িগুলো বেশ মোটাসোটা গলদাচিংড়ি হয়ে গেছে। সরষে বাটার ঝালটা একটু কম হলে স্বাদটা আরও একটু ভাল হতো। বিমলের ফিনফিনে পাতলা সাদা সিফন পড়ে সামনে মা

বসে। মায়ের চোখে হিমালয়ান অপটিকের চশমা। গোল্ডেন ফ্রেমের ভেতর মা'র নন্-এনিমিক উজ্জ্বল চোখে এখন আর দিনরাত জল ঝরে না। ফলত চোখের কোণে আর পিচুটি জমে না। দুলালের মা এখন আর কিওরেল্যান্ড নার্সিং হোমের দশ টাকা রোজের রোগাসোগা আয়া নয়। বিরাট হাসপাতালের সুশ্রী মেট্রন। পরনে ধবধবে ভাজ করা সাদা থান। মাথায় সাদা নার্সিং ফেল্ট। হাতে থার্মোমিটার আর চার্ট নিয়ে কমিউনের অসুস্থ কৃষকদের সেবা করছে।

অন্য ঘরে জাজিম আর তোষকের বিছানায় হাফ শুয়ে লোকসংগীত শুনছে দুলাল। স্ত্রী মধুমিতা গুনগুন করে গাইছে আর আগামি শীতের জন্যে দুলালের সোয়েটার বুনছে। মধুমিতার রোগা শরীর এখন আটোসাটো উজ্জ্বল। মুখে বুকে আর ছুলির দাগ নেই। খাটো করে ছাটা চুলে খুসকি নেই, নিকি নেই। মাঝে মাঝে কিণ্ডারগার্ডেন স্কুলের ছেলেমেয়েদের গানের গলা নিয়ে আলোচনা করছে। মধুমিতা ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের লোকসংগীত শেখায়। দুলাল বিছানা ছেড়ে জানলার কাছে যায়। মধুমিতা বিছানায় মধুবনি চাদর পাতে। দোতলার ফ্ল্যাট থেকে দুলাল দেখে শহরতলির বস্তি পাল্টে গিয়ে তিনতলার ফ্ল্যাট হয়েছে অনেকগুলো। রাস্তার ফুটপাথে কোন ভিখিরি নেই, বাউণ্ডুলে নেই। ওপাশের মদ আর গাঁজার দোকানটা হয়েছে সুন্দর সরকারি বিল্ডিং। দোকানের মালিক এখন একটি ভাল পোষ্টে চাকরি করছে সরকারি ঐ বিল্ডিং-এ। চারপাশে আর কোন বস্তি দুলালের চোখে পড়ছে না। সব পাল্টে যাচ্ছে। সবাই পাল্টে যাচ্ছে।

জানলার পাল্লার খটখট, দরজার কপাটের ঠকাস্ ঠকাস্, বাতাসের হু-হু, ঝড়ের শো-শো, গাছের ডালে মড়-মড়, টিনের চালে বৃষ্টির টপ টপ—ঢল-ঢল ঝম-ঝম—এসব বিচিত্র শব্দমালা দুলালের অভ্যস্ত ভাতঘুমকে টলিয়ে দেয়। ঘুম ভাঙতেই দুলাল দেখে ঝড়ের যুদ্ধে টিনের ক্লাব ঘরটা তছনছ। দাপটের সাথে ঝড় এসে ঘরটাকে লণ্ডভণ্ড করে দিয়েছে। ঝড় ঢুকে ঘরের সব কটা পোষ্টারকে উড়িয়ে নিয়ে গেছে। একটা পোস্টারও নেই। খোলা জানলা দিয়ে, দরজা দিয়ে দোর্দণ্ড প্রতাপশালী দাপটিয়া ঝড়ো হাওয়া রঙিন পোষ্টারগুলোকে ছিন্নভিন্ন করে রঙ মুছে দিয়ে উড়িয়ে নিয়ে চলে গেছে। খোলা দরজা দিয়ে দুলালের অন্বেষক দৃষ্টি দেখে ঝড়ের দাপটে ভেঙে-পরা গাছের নিচে কিছু পোষ্টার চাপা পড়ে আছে। বৃষ্টির জলে রঙিন অক্ষরগুলো ধুয়েমুছে সাদা করে দিয়ে গেছে।

মারমুখি ঝড়ের রাগ ক্রোধ গোঙানি তখনও কমেনি। তবে হাওয়ার বেগ আর আগের মতো নেই। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, মাঝে মাঝে আকাশে একটানা গড়-গড়ানি শব্দের পর প্রচণ্ড বাজ-পড়ার আওয়াজ শুনে দুলাল কানে হাত দেয়।

দুলালের দৃষ্টি ঘরে ফিরে আসে। টকটকে লাল রঙের ভাঁড়টা কাত হয়ে পড়ে আছে। বৃষ্টির ছাট এসে লাল রঙকে ঘরের মেঝেয় ছড়িয়ে দিয়েছে। রঙের কৌটোগুলো মেঝেতে গড়াচ্ছে। কেরোসিন কাঠের তাক থেকে বইপত্তর পড়ে গিয়ে মেঝেতে উল্টোপাল্টা ছড়ানো।

ধর্ষিত ঘরকে ঝাড়াপোছা গোছগাছ করতে গিয়ে দুলাল দেখে একটি মাত্র বইকে তেজি ঝড় টলাতে পারে নি বইটির নাম মার্কসীয় দর্শন। বইটি তাকেই রয়ে গেছে। দুলাল মেঝে থেকে বইগুলো তুলে সযত্নে গুছোতে গিয়ে দেখে খবরের কাগজের একটা বান্ডিল তাকে তোলা আছে। বৃষ্টি ধরে আসাতে দুলাল দরজা বন্ধ করলো না, জানলাও না। দুলাল ঘরে ছড়ানো ছিটানো জিনিসপত্তর গুছোতে লাগলো। গুছোনো শেষ হলে পুনরায় হাতে তুলি নিয়ে টকটকে লাল রঙের ভাঁড়ে চুবিয়ে বান্ডিল খুলে কাগজ বের করে দাম্ভিক আকাশের দিকে দৃষ্টি তুলে নির্মল হাসি হেসে ঝড়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে একটি পোস্টারিং করে, 'শ্রমিক কৃষক ছাত্র ঐক্য জিন্দাবাদ।'

লেখা শেষে দুলাল বাইরে তাকায়। দেখে ছেঁড়া ছাতা মাথায় দিয়ে তলাকার জনতা শাড়ি ভিজিয়ে জল পেরিয়ে মধুমিতা আসছে, ডান হাতে এ্যালুমিনিয়মের গ্লাস। গ্লাসের ভিতর গরম চা। দুলাল জানে, এসেই মধুমিতা বলবে, 'দুলালদা ধরো, বাব্বা কী গরম।' কিন্তু আজ মধুমিতা ওসব কিছু না বলে বেইজ্জতি ঘরের অবস্থা দেখে দুঃখার্ত হয়ে বললো, 'বাইরে কিছু পোস্টার জলে ভিজছে দুলালদা।' আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল মধুমিতা কিন্তু দুলালের বিষণ্ণ চোখের ফাটল দৃষ্টি দেখে ওর মন আহত পাখী হলেও দুলালের মনের কথা বুঝতে পেরে বলে, 'দাও তুলি-ব্রাশ, আমিও নতুন করে শুরু করি। ভয় পেও না। পারবো। তুমিই তো আমাকে পোস্টারিং করা শিখিয়েছ।'

দুলাল কথা বলে না। মধুমিতাকে বুকের কাছে টেনে নেয়। কেউ এসে যেতে পারে ভেবে দুলাল মধুমিতাকে বেশিক্ষণ ধরে রাখে না, ছেড়ে দেয়। হাতে ব্রাশটা ধরিয়ে দুলাল মধুমিতার দারিদ্রের ঝড়ে বিধ্বস্ত ভাঙাচোড়া মুখটার দিকে তাকিয়ে পোস্টারে নিজের লেখা আবৃত্তি করে 'ঝড় তুমি কত পোস্টার উড়িয়ে নেবে? নাও। আমরা আবার লিখবো। আমাদের পোস্টার আবার বলবে, মানুষ জাগো।'

□□□ নিরন্ন মানুষের পাশে আমি একা □□□

প্রাচী সিনেমার ধারে ফুটপাত ঘেঁষা একটি গাছের নিচে দাঁড়িয়ে চুমকি লক্ষ্য করছিল প্রৌঢ় লোকটিকে। প্রৌঢ় লোকটিকে সে ধরণের লোক মনে হচ্ছিল না চুমকির। ফুটপাথের ধারে সাজানো দোকান থেকে ঠিকরানো আলোয় প্রৌঢ়কে দেখে চুমকির মনে হচ্ছিল দয়াল পুরুষ মানুষ। কাঁধে দামি সৌখিন ঝোলা ব্যাগ, চোখে সরু কালো ফ্রেমের চশমা। দাড়ি গোঁফ কামানো সুশ্রী চকচকে মুখ। তেলহীন ফাঁপা কাঁচা পাকাচুল। প্যাণ্ট সার্ট পরা সৌখিন পুরুষ্টু পুরুষ। চুমকির দিকে মাঝে মাঝে তাকাচ্ছিল। তাকানোর মধ্যে উদাসীনতার ভাষা বুঝতে পারে চুমকি।

কখন যে সন্ধ্যা কলকাতার ভিড়ের ভেতর হারিয়ে যায়, কখন যে সন্ধ্যার অন্ধকার টুপ করে ঝরে পড়ে, কখন যে শক্তিশালী বিদ্যুতের আলো অন্ধকার ঠেকিয়ে রাখে টের পায় না চুমকির ভাষায় ঐ ভদ্রলোক মাঝবয়সী পুরুষ-মানুষটি। সে কি বাসের জন্য আধঘণ্টা দাঁড়িয়ে আছে, অথচ সারি সারি বাস ট্যাক্সি লরি ভ্যান বাইক মোটর দাঁড়ানো। সে কি কারোর অপেক্ষায় অথচ ত্রিশ মিনিটেও কেউ আসে না, চুমকি সেটাও লক্ষ্য রাখে। আলো পড়ে গাছের গায়ে, গাছের ডালপাতার ছায়া পড়ে চুমকির গায়ে। যদি একটা ভাল খদ্দের হয় যে হোটেল ঘরে নিয়ে যাবে না, শুধু কেবিনে বসে দুটো কথা-বার্তা, একটু ভালো খাবার, বাপের মতো একটু স্নেহ এসব ভাবতে ভাবতে একসময় চুমকি ভদ্রলোকের পাশে এসে দাঁড়ায়। চুমকি এসে পাশে দাঁড়াতেই বয়সের ভারে ক্লান্ত ভদ্রলোকের রক্ত সজীবতায় নড়েচড়ে উঠতে চায়। চুমকি কাছে আসায় নজর চুমকির শরীরের উপর দিয়ে গ্রাস করে নিয়ে যায়। অভিজ্ঞ পুরুষের বুঝতে অসুবিধা হয় না নারী শরীরের সৌন্দর্য, লালিত্য। সৌন্দর্যের শেষ শিখাটা যেন দপ্ দপ্ করে জ্বলছে চুমকির শরীরে। আর তখনি সৌম্য পুরুষ শুনতে পায় চুমকির নরম গলা-'খিদে পেয়েছে। চলুন না ঐ দোকানে যাই।' কথা শুনে অবাক হওয়া মুখের চার পাশে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে ওঠে ভদ্র প্রৌঢ়ের। এ ভাবে ফাঁকা বাসের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই বয়সে কত রকমের নারী দেখল, কিন্তু এভাবে কেউ এগিয়ে এসে সরাসরি বলেনি, 'খিদে পেয়েছে'। শোনা মাত্রই শরীরের নার্ভে নার্ভে রক্তকণা প্রবাহে যৌবনের হাওয়া লাগে। সেই যৌবনের হাওয়ায় দোল খাওয়া মাছির মতো ইচ্ছা-পূরণের ইচ্ছাকে দু-হাত দিয়ে তাড়িয়ে দেয় ভদ্রপুরুষ। খিদে জিনিষটা এতো বড়ো! মানুষের খিদে এতো গুরুত্বপূর্ণ! চাইতে হয়! সৌম্য পুরুষ

ভাবে, কোন খারাপ ভাবনা নেইতো এই মেয়েটার। কিন্তু ওকে দেখেতো রাস্তার বেশ্যা বলে মনে হয় না। চোখে করুণ দৃষ্টি, পোড়া রুটির মতো মুখে একটা খিদের শুকনো ছাপ। সরল কথার উত্তর দেয় শান্ত প্রৌঢ়—'চলো খাবে।'

কেবিনের ভিতর ঢুকে চুমকি পর্দা টেনে দেয়। ভদ্রলোকের পাশে বসে. ঢোকামাত্র কামার্ত মানুষ হলে গায়ে হাত দিত, টাকা দিয়ে কেনা কয়েক-মিনিটের শরীরকে ওরা রেহাই দেয় না। কিন্তু এ যে অন্য মানুষ। ভাবে চুমকি যদি ভালো খদ্দের হয়, তাহলে একটু ভালো খাবার, একটু ভালো কথা-বার্তা, বাপের মতো একটু স্নেহ পেতে চায়। ফর্সা চুমকি অন্যমনস্ক হয়ে যায়। বয়স্ক লোক ভাবে. মেয়েটি মনে হয় এ লাইনে বেশিদিনের নয়। চোখে মুখে এখনো ভোরের থিতু সারল্য। সৌম্য লোকটি ধীরে ধীরে বলে, 'চুপ করে আছ কেন। খেতে এসেছ তো. নাকি অন্য কোন বদ্‌ মতলব আছে।'

'আমাকে দেখে কি তাই মনে হয়? বলুন না—'

তাহলে বলো কি খাবে?'

আপনি যা খাবেন।'

তুমি কি খেতে ভালবাসো? রুটি মাংস খাও। পেট ভরে খাও। খিদে খুব কষ্ট দেয়, তাই না? খিদে কি জিনিষ ছোট বেলা থেকেই বাবা মা আমাদের বুঝতে দেয় নি। তুমি খাও। কি নাম তোমার?

'চুমকি'।

পর্দা নড়ে। পর্দা সরে। মাথা ঢোকে।

এক প্লেট চিকেন, তিনটি রুটি।'

আপনি খাবেন না? তাহলে উঠুন, আমিও খাব না।'

চুমকি, বোসো। আমার বয়স হয়েছে। আমার হজম হবে না। সেজন্য রাতে আমি মাংস খাই না।'

চুমকি বসে। বলে, 'আমার জন্য এতো টাকা খরচ করছেন। আমার কাছ থেকে আপনি কিছু নেবেন না—'

'কি দেবে তুমি?'

'আমার শরীর। শরীর ছাড়া তো দেবার আমার কিছুই নেই। পুরুষরাতো নারীদের শরীরটাই চায়। চায় না? তো স্বামীই বলুন, বাইরের পুরুষই বলুন।' টেবিলের দিকে নিচু চাহনি চুমকির। পুরুষ মানুষটার ফরসা হাত টেবিলের উপর। একটা আঙুলে শ্বেতপলার সোনার আঙটি। এসব দেখে আবার বলে, 'আমরা তো ঘরেও পণ্যা, বাইরেও পণ্যা।'

'আমি তো ওসবের জন্যে এখানে আসি নি। তুমি বললে খিদে পেয়েছে—' চুমকি দৃষ্টি নিচ থেকে তুলে ভদ্রলোকের মুখে রাখে। ভদ্রলোকের দৃষ্টিতে

স্নেহের ছবি দেখে। বিদ্যাসাগরের কণ্ব মুনির মতো চুমকির মাথায় হাত রাখে ভদ্রপ্রৌঢ়। মেয়েটির ইচ্ছে হয় ভদ্রলোকের বুকে মাথা রেখে বাবা বলে ডাকতে। বলতে পারে না, না-পারার বেদনা সাড়া জাগায় মনে বুকে। এ সময় পর্দা নড়ে। চুমকির স্মৃতিও নড়ে ওঠে। ওর মনে পড়ে মাতাল বাবার কথা, মার ভীত মুখ। এখন ওরা কেউ নেই। পৃথিবীতে যে পিতৃ স্নেহ আছে সে জানে না, কেউ চুমকিকে বলেনি, 'তুমি খাও।'

পুনরায় পর্দা সরে যায়। প্লেট হাতে লোক ঢোকে। মাংসের গন্ধ টেনে নেয় চুমকি। জল দিয়ে হাত ধুতে ভুলে যায়। রুটি ছিড়তে যাবে, ভদ্রলোক বলে, 'হাত ধুলে না' ? চুমকি হাত ধোয়।

খেতে খেতে বলে চুমকি 'আপনি কি করেন বলুন তো ?'

'আমি কবিতা লিখি'।

'কবিতা লিখে পয়সা হয় ?'

'আমি রাইটার্সে কাজ করি। রাইটার্স বোঝ ?'

'বুঝি। সরকারী অফিস। আপনার কবিতার বই আছে ?'

'আছে। এই দেখ।' —ঝোলা ব্যাগ থেকে বই বের করে দেখায়। চুমকি বইটির নাম পড়ে 'নিরন্ন মানুষের পাশে আমি একা।'

খাওয়া শেষ হয়। চুমকি সেফটিপিন্ বের করে দাঁত খোটে। এক সময় বলে, 'কটা বাজে বলুনতো ?'

'সাড়ে সাতটা।'

'তালে আটটার ট্রেন পাওয়া যাবে'—চুমকির ভেতর থেকে এক মুহূর্তে ছেনালিপনার ইচ্ছা পাখির মতো উড়ে যায়। স্বেচ্ছায় দয়া দেখাতে আসে অনেকেই। তখন চুমকি শারীরিক নানা কৌশলে, নানা ছলাকলায় কাছে টেনে নিতে পারলেই বাড়তি আরও পাঁচদশটাকা চাইতে পারে। কিন্তু আজ চুমকি প্রথম থেকেই এই ভদ্রলোকের প্রতি অন্য আকর্ষণ থাকায় কিছুই করতে পারে না। শুধু বলে—'আমার ছেলের জন্য কচুরি কিনে দেবে ? ও খুব কচুরি খেতে ভালবাসে।'

প্রৌঢ় কবি বলেন বাইরে এসে, দাম মিটিয়ে দিয়ে, 'তোমার ছেলে আছে ? দেখেতো মনে হয় না। কপালে সিঁদুর নেই, হাতে শাঁখা নেই।' ভদ্রলোক ভাবে, দুটাকা দিলে ও কিনে নিতে পারতো। আবার এটাও ভাবে, না-ও কিনতো। টাকা দুটো সংসারের অন্য কাজে লাগাতো। ফলত সে কিনে দেয় গরম কচুরি চুমকির হাতে। চুমকি ব্যাগে পুরে নেয়। বলে 'কটা বাজল বলুন তো ?'

'তোমার হাতে তো ঘড়ি আছে'।

'আমার ঘড়ি ফাস্ট যায়, মাঝে মাঝে বন্ধ হয়ে যায়। ঝাঁকুনি দিলে চলে।'

'পোনে আটটা।'

'চলি। মাঝে মাঝে ঐ গাছটার নিচে এসো। আমার বাবা নেই।'

চুমকি দ্রুত রাস্তা পার হয়। দাঁড়িয়ে থাকা সুস্থিত লোকটির মনের ভিতরে ক্ষুধার্ত বাবা জাতীয় শব্দেরা কবিতার জন্য লাইন দেয়।

চুমকি শেয়ালদা স্টেশনে এসে একজন যাত্রী হয়ে যায়। যাত্রীদের মধ্যে কে গুন্ডা, কে বদমাস, কে মস্তান, কে প্রতারক, কে অধ্যাপক, কে কেরাণী, কে শিক্ষক, কে গবেষক, কে লেখক, কে সাংবাদিক কে নেতা বোঝবার উপায় নেই। সবাই যাত্রী, আমরা এখানে সবাই মানুষ। এখন বাড়ি ফিরবো, এখন ঘরে যাবো। মাইকে গ্য গ্য শব্দ। শোনে ট্রেন ছাড়তে দেরি হবে, শোনে যান্ত্রিক ত্রুটির কথা। অবশেষে ট্রেন ছাড়ে, আটটার ট্রেন নটায় ছাড়ে। সেই ট্রেনে চুমকি। টাইট ভিড়ে উঠতে কষ্ট হয়েছিল। ভেতরে ঢোকার সময় গালাগাল দিতে গিয়ে দু একটা খিস্তি এসে গেছিল মুখে।

পায়রাডাঙায় এসে ট্রেন থামে রাত দশটায়। বেশি যাত্রী নামলো না। রাস্তা ফাঁকা। দোকান পাট প্রায় বন্ধ। সাইকেল রাখার দোকানটার একটি পাট খোলা ছিল। ফলত রাস্তায় আলোর স্পষ্ট চেহারা নেই। রাস্তা দখল করে নিয়েছে জ্যোৎস্নার আলো। কিছু নিত্যযাত্রী দ্রুত হেঁটে এগিয়ে যায়। সাইকেলের শব্দে চুমকি মাঝরাস্তা থেকে বাঁ পাশে সরে যায়। পেছনে তাকায়। শুধুমাত্র একটি বালক এগিয়ে আসছে। কাছাকাছি আসতেই চুমকি বলে, 'রাস্তাটা বড় ফাঁকা। চল্, একসাথে যাই।'

ছেলেটি চুমকির দিকে তাকায়। সাজ দেখে। পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে বলে, 'আমারও ভয় ভয় করছিল। ভালোই হলো দিদি, কথা বলতে বলতে একসাথে চলে যাব।' চুমকির সাহস ফেরে। 'দিদি' শুনে আনন্দ পায়। রক্তজ দিদি হতে না পারায় ভিতরে জমাট দুঃখ। মুখ তোলে আকাশের দিকে। পূর্ণিমার আকাশে কে যেন সাদা থান ছড়িয়ে রেখেছে। একবুক দুঃখ নিয়ে বিধবার বেশে প্রাকৃতিক পরিবেশ জেগে আছে। ছেলেটা পাশে হাটে। চুমকির ইচ্ছে করে ছেলেটার নাম জানতে। কি নাম হতে পারে গোপাল রতন হারাধন লালটু খোকন বাবলু? পৃথিবীতে কত নাম। 'তোর নাম কি রে?' চুমকির প্রশ্ন শুনে দুর্বল স্বরে উত্তর দেয় গৌরাঙ্গ, 'আমার নাম গৌরাঙ্গ।'

'তুইতো কালো, তোর নাম গৌরাঙ্গ হলো কেন?' কথাটা শুনে মুখ তুলে দিদিকে দেখে গৌরাঙ্গ। দিদি হাসছে।

'হাসছ? গৌরাঙ্গের জন্মদিনে আমার জন্ম তাই—। তাছাড়া বাবা গৌর-নিতাই-এর খুব ভক্ত ছিল!' ছেলেটার হাতে ময়লা পলিথিনের ছোট ব্যাগ। নিশ্চিত কোথাও কাজ করে বারো বছরের ছেলেটি।

'তুই কোথায় থাকিস রে গৌরাঙ্গ।'

'আমি থাকি তোমাদের বাড়ি পেরিয়ে ধম্মোঠাকুর তলায়।'

'সেতো টেশন থেকে বিশ মিনিট লাগে। তুই আমাদের বাড়ি চিনলি কি করে?'

'আমিও তো তোমার মতো রাত করেই বাড়ি ফিরি দিদি। তোমাকে তো যেতে দেখি। ডান দিকের রাস্তায় ঢুকে যাও। তুমি তো সতীনগরে থাক। সতীনগর থেকে ধম্মোঠাকুর তলা—'

'পাঁচমিনিট। তুই এতো রাত করে ফিরিস কেন গৌরাঙ্গ? কাজ করিস?'

'কাজ করে মঠে যাই। সেখান থেকে খিচুরি খেয়ে টেন ধরি। সাড়ে সাতটার আগে খিচুরি বিলি হয় না। তাই রাত হয়। কে এক সাধু মারা গেছে। আজ খিচুরি হয় নি।' হাঁটতে হাঁটতে পিছিয়ে পড়ে গৌরাঙ্গ। চুমকি থামে। গৌরাঙ্গ পাশে আসে।

'তুই কোথায় কাজ করিস?'

'পেসে ফাই ফরমাস খাটি। রোজ দুটাকা পাই। তিনটের সময় পঞ্চাশ গ্রাম মুড়ি দেয়।' কথা বলতে বলতে গৌরাঙ্গ পিছিয়ে পড়ে। চুমকি থামে।

'গৌরাঙ্গ বার বার পিছিয়ে পড়ছিস কেন রে?'

'হাটতে পারছি না। খিদে পেয়েছে শরীরটা যেন কেমন লাগছে।'

'ঠিক আছে আমি আস্তে হাটছি। মাসের বেতন দিয়ে তুই কি করিস?'

'মাকে দিই। মা সংসার চালায়।'

'কেন তোব বাবা?'

'বাবা নেই। দুবছর হলো মারা গেছেন।'

'মারা গেছে? অল্প বয়সে?'

'ভোটের সময় একবার দুদলে মারামারি হয়েছিল। সেই মারামারিতে

'আহা রে—। মা-ও কাজ করে? মা কি বেরোয় আমার মতো?'

'মা বাবুদের বাড়িতে কাজ কবে। বাসন মাজে, কাপড় কাঁচে, বাটনা বাটে। খেতে পায়।'

'আর কে আছে বাড়িতে?'

'এক বোন, আরও এক ভাই। ওরা আমার ছোট।'

আবার গৌরাঙ্গ পিছিয়ে পড়ে। একটু একটু করে দুর্বলতা ওকে রাহুর মতো গ্রাস করে নেয়। পেট কামড়ায় তবু সে নিজেকে সামলাতে চেষ্টা করে।

কিছুক্ষণ চুপ চাপ। জোছনা নির্জন রাত। পরিষ্কার পিচের রাস্তায় পায়ের শব্দ। পাখির ডানার শব্দ।

'আমার কথাতো জানলে দিদি। এবার তোমার কথা বলো। তুমি এতো রাত করে ফের কেন? গলার স্বর সরু হয়ে আসছে গৌরাঙ্গের।

'আমার কোন কথা নেই। আমার বড় দুঃখ রে গৌরাঙ্গ।'

গৌরাঙ্গ খিদে ভুলে থাকে। বলে—'তোমার আবার কিসের দুঃখ? তুমি কি সুন্দর সাজ গোজ কর। আমার মা করে না। বলে বিধবাদের করতে নাই। তোমার তো অনেক পয়সা। তাছাড়া আমাদের তো পয়সা নেই। ভালমতো খাবারই জোটে না।' থেমে থেমে আস্তে আস্তে কথাগুলো বলে গৌরাঙ্গ। পেট কামড়ানি সহ্য করে।

'আমার ছেলের জন্য দুঃখ। ওকে দেখার কেউ নেই। ওকে একবুড়ির কাছে রেখে আমাকে দুপুর বেলায় বেরোতে হয়।'

'তোমার ছেলে খুব ছোট?' গৌরাঙ্গের কথা জড়িয়ে যাচ্ছে। যন্ত্রণা হয় পেটে। টু-তে পড়ে ইংরেজি স্কুলে।' চুমকির কথাটা শোনে।

'তবে দুঃখ কেন? ওর বাবাতো আছে?'—গৌরাঙ্গ হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে বলে। জামার তলায় হাত দিয়ে খিদের টুঁটি চেপে ধরে।

'দাঁড়িয়ে পড়লি কেন? চ। ঐতো এসে গেলাম। ওর বাবা নেই। অসুখে মারা গেছে।'

'তুমি বিধবা!' গৌরাঙ্গ পুনরায় দাঁড়িয়ে থাকে, বলে, 'তালে এতো সাজ কেন? রঙিন শাড়ি পর কেন? আমার মা তো পরে না।' গৌরাঙ্গের মুখ দিয়ে যন্ত্রণার শব্দ অ্যাঁ' বেরোয়। এ কথার জবাব চুমকি খুইয়ে বসেছে অনেকদিন। উত্তর দিতে পারে না। খোয়ানোর যন্ত্রণা ছোবল মারে চুমকিকে। হঠাৎ গৌরাঙ্গ রাস্তায় বসে পড়ে। 'দিদি আমার বড্ড খিদে পেয়েছে। মা জানে আমি খেয়ে আসবো। ঘরে যদি খাবার না পাই দিদি। এতো রাতে সব দোকান বন্ধ। মাথা ঘুরছে। পেট কামড়াচ্ছে আমি বসি, তুমি যাও।'

চুমকিও উবুড় হয়ে বসে। বলে, 'পেট কামড়াচ্ছে? কোথায়? দেখা।'

'খিদের কথা ভাবতে গিয়ে—' বলেই গৌরাঙ্গ রাস্তায় শুয়ে পড়ে। দুর্বল ক্লান্ত শরীর নিস্তেজ হয়ে গেছে। আর একটু দূরে বাড়ি। মা অপেক্ষা করছে। খুব আস্তে আস্তে কথা বলছে। চুমকি বুঝতে পারছে না। ঠোঁট নড়ছে। চুমকি মুখের কাছে কান নেয়। শোনে, 'তুমি যাও দিদি। তোমার ছেলে অপেক্ষা করছে। আমি একটু বিশ্রাম করে পরে যাব।' গৌরাঙ্গ হাঁপাচ্ছে। হঠাৎ চুমকির কচুরির কথা মনে পড়ল।

'তুই খাবি গৌরাঙ্গ?' কিছু একটা খুঁজে পাবার আনন্দ চুমকির মধ্যে।

'হ্যাঁ খাব, আমার বড্ড খিদে—, না খেলে মরে যাব'।

'আস্তে আস্তে উঠে বোস। আমাকে ধরে ওঠ।'—চুমকি ওকে বসায় কাল-ভার্টে'র উপর। ব্যাগ থেকে আলুর দমসহ কচুরির প্যাকেট বের করে। প্যাকেট খুলে ওর হাতে দিয়ে বলে—'নে খা। সব কটা খেয়ে নে রে গৌরাঙ্গ'। গৌরাঙ্গ নিমেষে দুটো খেয়ে বলে, 'তুমি খাবে না? তোমার ছেলে? এ দুটো থাক।'

'না। তুই খেয়ে নে। আমাদের অসুবিধে হবে না'। —চুমকি ওকে যত্ন করে খাওয়ায়। বলে, 'আস্তে আস্তে খা। তাড়াহুড়ো করিস নে। গলায় ঠেকবে। জল নেই'।

'আছে। আমাদের বাড়ির কাছেই টিউবওয়েল।'

খাওয়া শেষ হয়। আবার ওরা হাঁটে।

'আবার যেন মাথাটা কেমন ঘুরে গেল। একটু আস্তে হাঁটো দিদি।'

'খালি পেটে গ্যাস হলে মাথা ঘুরে যায়। আর তা ছাড়া তোর ভয়। ঘরে যদি খাবার না পাস।'

চুমকির ডান পাশে মোড় এসে গেছে। ডান পাশে ঢোকার আগে বলে, তুই যেতে পারবি তো? নাকি আমি এগিয়ে দিয়ে আসবো খানিকটা'।

'এবার আমি যেতে পারবো দিদি। কিন্তু তুমি তো আমার কথার জবাব দিলে না। তুমি এতো রাত করে কেন ফের'?

চুমকি একটু দাঁড়ায়। গৌরাঙ্গের একই কথা দুবার শুনে 'কি উত্তর দেবে' একটু ভাবে। সত্যিই তো আমরা দুজনেই রাত করে ফিরি একটুখানি খাবারের খোঁজে। ওরটা জানলাম। ওর তো ইচ্ছে হবেই। ওতো আমারটা জানতে চাইবেই। চুমকি গম্ভীর হয়। এতোক্ষণ সে গৌরাঙ্গের সাথে কখনও হেসে, কখনও মুচকি হেসে কথা বলতে বলতে এসেছে। এবার না হেসে উত্তর দেয় চুমকি, 'তুই বড় হলে বুঝবি কেন আমি এতো রাত করে ফিরি। কি কাজ করি।' তারপর ডান পাশের জোছন রাস্তায় চুমকি ঢুকে যায়।

প্রেস-বালক গৌরাঙ্গকে বড় হতে হয় না। সে বুঝতে পারে।

□□□ নকশা-করা চাদর এবং শুখা মানুষের চিত্তকথা □□□

সে দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে। হাত-পাগুলো স্বাভাবিক হাত পায়ের মতো নেই, পাটকাঠির মতো পাকিয়ে যাচ্ছে। সে জড়োসড়ো হয়ে চুপচাপ শুয়ে থাকতে চায়। বছর বছর একটু একটু করে ওর সত্তর কেজি ওজনের বিশাল শরীরটা ছোট হয়ে আসছে। রোগা টিঙটিঙে বালকের মতো ছোট হয়ে আসা শরীরটা দেখে ওর স্ত্রী দোলার মধ্যে অন্যরকম যন্ত্রণা ও দুঃখবোধ যৌথ-ভাবে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার প্রাকৃতিক ঝড় তোলে। অলৌকিক বিশ্বাসে বিস্মিত হয়ে দোলা দেখে,যে প্যান্ট সার্ট পরে সে কলেজে পড়াতে যায়,সেই প্যান্ট সার্টের চেয়ে স্বামীর শরীর ছোট হয়ে গেছে। এমন ঘটনা প্রায় দিনই ঘটে, ইংরেজী শিক্ষক দোলা স্কুল থেকে ফেরে, ওর ঘরে যায়, ভেজানো দরজা খোলে, ঘরভরা সোনালী আলোয় দেখে নকশা - করা চাদরের নিচে সে চুপচাপ শুয়ে আছে যেন কফিনের মধ্যে একটা ডেড্ বডি। জালি ঢাকা খাবারের বেশী অংশটাই পড়ে আছে ষ্টিলের থালায়। কথা বলে না দোলা, বললে উত্তর পায় না।

যে লোকটা বই পড়তে ভালবাসতো, সে এখন বই পড়ে না। কুণ্ডলী-পাকানো পোষা কুকুরের মতো পড়ে থাকে বিছানায়। প্রিয় শব্দগুলো প্রিয় বই-গুলো খাটের চারপাশে ঘুমিয়ে আছে। যে লোকটা একসময় প্রিয় সিনেমা প্রিয় নাটক দেখে ফিরতো, ফিরে এসে দোলার সাথে গল্প করতো ডাইনিং টেবিলে বসে, সে এখন জলে ধোওয়া লংক্লথের মতো খাটো হয়ে যায়, শুকিয়ে যায়। নির্বাক শুয়ে থাকে এক কাঠের ইংলিশ খাটে। অথচ নিয়মিত দাঁড়ি কামায়, স্নান করে, পোষাক পাল্টায়, নিজের ঘরে খুশিমতো আহার করে। যে লোকটা লিও টয় কিনে ছেলের সাথে খেলা করতো, সে এখন ছেলেকেও দূরে সরিয়ে রাখে।

দোলা কারণ জানতে চায়, জবাব পায় না। এমন একটা দৃষ্টি দোলার সামনে খুলে দেয় সে, যার ভাষা বড়ই কঠিন, বড়ই দুর্বোধ্য। ভাষার দুর্বোধের জন্যই দোলার কমলকুমার মজুমদারের 'সুহাসিনীর পমেটম' ভাল লাগে না। স্বামীর দুঃখ বুঝতে চায়, বুঝতে দেয় না। দুঃখ বোবা হয়ে যায়। দোলা স্বামীর পালিত বেদনা অনুভব করতে চায়, পারে না। মাঝে মাঝে ওর পাশে শুয়ে সান্ত্বনা দিতে ইচ্ছে হয়। কিন্তু ওর শুখা শরীরটা কুঁকড়ে কুঁকড়ে এতো ছোট হয়ে যাচ্ছে, ওফ্, পাশে শোয়ার কথা দোলা আর ভাবতে পারছে না। ঐ কুঁকড়ে যাওয়া শরীরটা কোলে নিয়ে ঘুম পাড়ানো যায়, কিন্তু শুতে যাওয়া ভাবনাটা কিছুতেই আসে না, আসতে চায় না আর।

তখুনি পরিচিত যুবক মানসের শরীরের সুঠাম কাঠামো দোলার মনকে চঞ্চল করে তোলে।

সেদিন মানসের এম-আই জি ফ্ল্যাটে দোলা গিয়েছিল এবং মানসও সেদিন হাসপাতালে অসুস্থ স্ত্রীকে দেখতে যায় নি। ফলত নিজের ঘরে ফিরতে দোলার রাত হয়ে গেছিল। ওর ঘরে গিয়ে ভেজানো দরজা নিঃশব্দে খুলে দেখে ছ ফুট বাই সাড়ে ছ ফুট ডাবল খাটের মাঝখানে শহর আঁকা চাদর মাথা পর্যন্ত মুড়ি দিয়ে ছোটখাটো একটা মানুষ নরম বিছানার সাথে মিশে আছে, যেন একটা প্রস্তুত মৃতদেহ, এখনই কেউ তুলে নিয়ে যাবে। উপমিত মৃতদেহটি বুঝতে পারে ঘরে কখন দোলা ঢুকবে এবং কখন ঢুকবে না। যখন বুঝতে পারে দোলা ঢুকছে সে তখন একটা বড় পোকার মতো সুড়সুড় করে নকশা-করা শহর আঁকা চাদরের ভিতর ঢুকে যায়। পদ্ম পাতায় হলুদ মুক্তোর মতো দোলার টলটলে যৌবন তার ভাবনা থেকে সরে যায়, সরে যায় এক ধূসর জগতে। সেখান থেকে ভেসে আসে গীর্জার ঘণ্টার শব্দ। শব্দ তুলে নেয় ওর নকশা-করা শহর-আঁকা চাদরে ঢাকা কফিনটি।

অবশেষে দোলাকে ঘর থেকে বের হয়ে আসতেই হয়। একটু রাত করে প্রাইভেট টিউটর আসায় দোলা বুঝতে পারে ছেলে নূপুর এখনও পড়ছে। ইংরেজী শব্দ, উচ্চারণ ওর ঘরে যায়। নকশা—করা শহর-আঁকা চাদরের কফিনে সরাসরি ঢুকে যায় ইংরেজী ভাষা। স্নেহকাতর পুত্রের মুখে শিক্ষকের শেখানো মামুলি ইংরেজী বুলি শুনে ওর ছোটবেলার কথা উঠে আসে। সিঁড়ি ভেঙে উঠে আসা ক্লান্ত স্মৃতি শুখা মানুষটার পাশে শুয়ে মনকে ঝাঁকুনি দিয়ে বলে, তোমার তো কোনদিন ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল ভাল লাগতো না। অথচ তোমার মা-বাবার ছিল প্রচণ্ড জেদ, সেজন্য সাহেবী স্কুলে পড়তেই হয়েছিল। তোমার স্বাধীনতাকে দুমড়েমুচড়ে দিয়েছিল গোড়াতেই। তারপরই বোধহয় তুমি প্রতিবাদের ভাষাটা শিখে উঠতে পারনি। তোমার ভিতরের স্বাধীন সত্তা নকশা-করা শহর-আঁকা চাদরের ভিতর কফিন হয়ে যায়। সেই কফিনে ওর পাশে শুয়ে থাকা ছোটবেলার কথা উত্তর না পেয়ে বোবা হয়ে যায়। মুমূর্ষু ব্যক্তির শিয়রে গীতাপাঠের মতো রবীন্দ্রনাথের 'তোতা কাহিনী'র পাঠ শুনতে পায় সে 'এক যে ছিল পাখি। সে ছিল মূর্খ। সে গান গাইত, শাস্ত্র পড়িত না। লাফাইত, উড়িত ; জানিত না কায়দা কানুন কাকে বলে। ···

মন্ত্রীকে ডাকিয়া রাজা বলিলেন, 'পাখিটাকে শিক্ষা দাও।' এতোটুকু শোনার পর সে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাথে তর্ক করে। কলেজ লাইফে ওর ডিবেটে নামডাক ছিল। দিল্লী গিয়ে একবার সে ডিবেটে প্রথম হয়ে জাতীয় পুরস্কার নিয়ে এসেছিল। দোহাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমার ধৃষ্টতা মাফ করবেন, কারণ কি ধরনের শিক্ষা পেলে উড়ান পাখি কায়দা কানুন শিখতে পারে

আপনি রবীন্দ্রনাথ খোলসা করে বলেননি। নিশ্চয়ই আপনি বোল ফোটার পর থেকেই শিশুকে একশ্রেণী দাস পরিবার যারা ইংরেজী শিক্ষা ও কায়দা কানুন শেখায় সেই শ্রেণীর শিক্ষা শেখার কথা বলেননি। নিশ্চয়ই আপনি মাতৃভাষার দ্বিতীয় নাগরিকত্ব ও মাতৃভাষার প্রতি অতীব ঘৃণা সহ্য করতে পারেন নি বলেই লিখেছেন—মহারাজ পাখিটার শিক্ষা পুরা হইয়াছে।

রাজা শুধাইলেন, ও কি আর লাফায় ?

ভাগিনা বলিল, আরে রাম !

আর কি ওড়ে ?

না।

আর কি গান গায় ?

না।

....

রাজা বলিলেন, একবার পাখিটাকে আনো তো, দেখি।

পাখি আসিল। · ··· ···

রাজা পাখিটাকে টিপিলেন। সে হাঁ করিল না, হুঁ করিল না—কেবল তার পেটের মধ্যে পুঁথির শুকনো পাতা খস্‌খস্‌ গজ্‌গজ্‌ করিতে লাগিল।'

তোতা কাহিনীর পর সত্তরটি বছর চলে গেল, আজও পাখির শিক্ষা বাতিল হল না। বিদেশী ভাষার শুকনো পাতা ওর বাবা গিলেছে, সে গিলেছে, ওর পুত্র নুপুর গিলছে। দুশ টাকার বাড়ির শিক্ষকের গলার স্বর শোনা যায় না। পড়ানো শেষ। বইয়ের উপর শুয়ে নুপুর। হাতে অরণ্যদেবের বই। নুপুর অরণ্যদেব হয়। ইংলিশ মিডিয়ামের স্কুলটা এক ঘুষি মেরে ভেঙে ফেলে। ছোট ছোট শিশুগুলো পাখির মতো উড়তে থাকে, লাফাতে থাকে। 'তাইরে নারে, নাইরে না' শিশুরা গান গায়, হাততালি দেয়। ইংরেজী স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকাদের, এমনকি মাকে ধরে এনে পিগমীদের হাতে তুলে দেয় বিচারের জন্য। দোলা বাথরুম থেকে বেরিয়ে অরণ্যদেবের ইংরেজী সংস্করণটি হাতে নিয়ে দেখে নুপুর ঘুম জড়িয়ে দ হয়ে শুয়ে আছে।

নুপুরকে নিয়ে ডিনার টেবিলে বসার আগে আরও একবার দোলা স্বামীর ঘরে যায়। নকশা-করা শহর-আঁকা চাদরের তলায় ওর স্বামী তখনও। দোলা সে-র দিকে ঠাণ্ডা দৃষ্টিকে নিয়ে যায়। এই মুহূর্তে দোলার মনের রঙিন পর্দায় মানসের মজবুত নগ্নমূর্তি ভেসে ওঠাটা শোভা পায় না। বুদ্ধের করুণা যেন চোখের ভাষা এখন দোলার। কারণ এখন ন্যাতানো এক বৈধ দুঃখ জড়িয়ে ধরে আছে দোলাকে, মানসের মতো করে নয়, আলতোভাবে। সে শুনতে পাক্‌ বা নাই পাক্‌ এক টুকরো সংবাদ মুখ থেকে খসে পড়ে স্বামীর ঘরে, সজোরেই 'কাল ডাক্তার আসবে। প্রস্তুত থেকো।'

ডাক্তার আসে। প্রথমে ওজন নেয়
বিলো এজ।
রক্তের চাপ পরীক্ষা করে
লো প্রেসার।
বুক পরীক্ষা করে
গুড কণ্ডিশন।
শরীরের উত্তাপ নেয়
বিলো নরম্যাল। বিলো নাইনটি সিক্স
জিজ্ঞেস করে—এনি ট্রাবল?
সে উত্তর দেয় না।

দোলা উত্তর দেয়। দোলার গোছানো উত্তর, 'পনর দিন হল কলেজ কামাই করে ফুল স্পিডে পোলার চালিয়ে নকশা করা চাদরের তলায় শুধু শুয়ে থাকে। স্নানের সময় স্নান করে। একদিন অন্তর দাড়ি কামায়। নিয়মিত পোষাক পাল্টায়। খাবারের সময় নিজের ঘরে খায়। ডিনার টেবিলে যায় না। যন্ত্রণার কথা বলে না। কষ্টের কথা বলে না। মনে হয় যন্ত্রণা নেই, দুঃখ নেই। টিভি দ্যাখে বিশেষ বিশেষ সিরিয়াল। ছেলের কাছে যায় না, পড়ায় না, কাছেও ডাকে না। আমি হঠাৎ ঘরে ঢুকে পড়লে, নকশা-করা শহর-আঁকা চাদরের তলায় ঢুকে যায়। আমাকে শুতে ডাকে না, আমার কাছে শুতে আসে না। শরীরটা ছোট হয়ে যাচ্ছে, শুকিয়ে যাচ্ছে। আগের ফটো দেখুনকে যেন ওর সুন্দর শরীরটাকে দুমড়েমুচড়ে দিচ্ছে। প্লিজ ডক্টর, একটা কিছু করুন —রাংতা দিয়ে মোড়া দোলার রুপোলি কণ্ঠস্বর ডাক্তার সোম শোনে। গুরুত্ব না দিয়ে তিনি একটি দামি টনিক প্রেসক্রাইব করেন। বলেন 'ব্লাড য়ুরিনের রিপোর্ট ভাল। তেমন কিছু রোগের লক্ষণ পাওয়া যায় নি। আমার আর কিছু করার নেই মিসেস রায় চৌধুরী।'

নামী ডাক্তার চলে যায়। দোলা ভাবে এবার হয়তো সে কিছু বলবে। কিছু বলে না। সে কিছুক্ষণ বসে থাকে। দোলার দিকে তাকায়। তাকানোর ভাষায় বুঝতে পারা যায় যে দোলা যেন এখন ওর কাছে খুবই অপরিচিত মহিলা। দোলাকে সে চিনতে পারছে না। সে যেন রেল কম্পার্টমেণ্টে একজন সুন্দরী মহিলাকে দেখছে। কম্পার্টমেণ্টে আর কোন যাত্রী নেই। অন্ধকার ছিঁড়ে ট্রেন হুসহাস ছুটছে। সন্তান নূপুর ডাকে 'বাবা'। একবার সে ছেলের দিকে তাকায়। একটা বোবা যন্ত্রণা সে-র বুকের ভিতর ছটফট করে। সে রঙিন নকসী চাদরের ভিতর ঢুকে যায়।

দোলার দীর্ঘনিশ্বাস শোনা যায়। বাঁ হাতে ডঃ সোমের প্রেসক্রিপসন। ডান হাতে নূপুরকে জড়িয়ে ধরে দুজনে ঘর থেকে বের হয়ে আসে। দরজা

খোলা থাকে। দোলার মনে দোলার বাবা কথা বলে, ভাল অধ্যাপক, নিজস্ব বড় ফ্ল্যাট, বনেদি বংশ। বাবা মা কেউ নেই। তোকে পছন্দ। এ সব দেখে অনেক অর্থ খরচ করে বাবা ওর সাথে দোলার বিয়ে দিয়েছিলেন। দোলা তার একমাত্র কন্যা। শরীরের গঠন ভাল। ফর্সা, লম্বা, ইংরেজী স্কুলের শিক্ষিকা। দোলার একমাত্র বিচ্যুতি চুল পাতলা। সেজন্য দোলা মাসে মাসে বয়দের মতো চুলে ছাঁট দিয়ে আসে পার্লার থেকে। দোলার বাবা ভেবেছিলেন, একমাত্র কন্যা স্বাধীনভাবে দিনযাপন করতে পারবে। ক্রান্তদর্শী বাবার ভাবনা সঠিক ছিল। দোলার নারী স্বাধীনতায় কোনদিন হাত দেয়নি দোলার স্বামী। রাত সাতটা দোলা ফেরেনি, রাত আটটা দোলা ফেরেনি, রাত নটা দোলা ফেরেনি, কোনদিন সে প্রতিবাদ করেনি। টানা দশদিন দোলা পিতৃগৃহে। সাতদিন, পাঁচদিন পিতৃগৃহে। নূপুরসহ যখন তখন খুশি পিতৃগৃহে দোলা যায় আসে। সে কোনদিন অভিযোগ তোলেনি! একদিন মানসের সাথে পাশাপাশি শোওয়া অবস্থা দেখেও প্রতিবাদ করতে পারেনি সে। একটা ভীষণ রকমের বেইজ্জতি বনেদি লজ্জা তাকে বোবা করে দেয়। এই ঘটনার পর থেকে সে শুধু দক্ষিণের বিশাল গ্রিলের জানলা খুলে আরামপ্রিয় চেয়ারে হেলান দিয়ে হাতে বই নিয়ে নিজের ভিতর মগ্ন থাকতো শুধু। রাধার মার সাথে নানারকম কথা বলতো। কারণ রাধার মায়ের কাছে সন্ধান পেয়েছিলো মাতৃস্নেহ। রাধা নেই, কিন্তু রাধা রয়ে গেছে মায়ের নামের সঙ্গে। বিধবা রাধার মায়ের হাতে ছেলেকে তুলে দেওয়ার পর ওর মার নিশ্বাস ফুরিয়ে গেল, মাকে আর পৃথিবীতে পাওয়া যাবে না।

দোলা ঘরে নেই, সামনে খোলা জানলা, রাধার মা দুপুর ঘুমে আচ্ছন্ন, আর সেই পরিবেশে মাঝে মাঝে দার্শনিক ভাবনারা এসে জড়ো হতো সে র মধ্যে, সে চায় ঘরের স্বাধীনতা। বাইরের স্বাধীন হাওয়াকে ঘরের স্বাধীনতা রুখে দিতে পারে এমন একটা বলিষ্ঠ ঘরের জগত সে চায়। এ নিয়ে দোলার সাথে ওর তর্ক হতো। তর্কের সময় দোলা ভাবতো আমি ইংরেজীর বিদগ্ধ ছাত্রী, বর্তমানে শিক্ষিকা। তর্কের সময় ওর স্ত্রী ভাবতে পারতো না। সে ভাবতো, আমি দর্শনের প্রথম শ্রেণী পাওয়া মেধাবী ছাত্র, বর্তমানে অধ্যাপক। কিন্তু তর্কের সময় সে স্থির থাকতে পারতো ভাবতো দোলা ওর স্ত্রী। সীমা অসীমের দ্বন্দ্ব সে চাইতো না, সে চাইতো সীমা অসীমের সিনথিসিস। দোলার ইচ্ছে নয় তর্ক দীর্ঘস্থায়ী হোক। শেষ দাঁড়ি টেনে দেবার আগে বলতো, তোমাদের রবীন্দ্রনাথ অবাস্তব। সেও বেশি দূর তর্ক করে অশান্তি ভালবাসতো না। মনের ভিতর অনেক কথা থেকে যেতো, 'তোমাদের মতো ইংরেজী পড়া সমালোচকরাই রবীন্দ্রনাথকে অবাস্তব, রোমান্টিক, মিষ্টিক করে রেখেছে। তাকে পরিবর্তিত পরিবেশে বাস্তব করে তুলতে পারেনি।' এই লোকটাই এখন আর দোলার সাথে তর্ক করে না। এখন ওর শরীর শুকিয়ে যাচ্ছে, কুঁকড়ে যাচ্ছে।

তাকে সারাবার জন্য আবার ডাক্তার আসে। মন এবং মনস্তত্ত্ব বিষয়ক ডাক্তার। প্রথমেই ডাক্তারের নজর কেড়ে নেয় নকশা-করা শহর-আঁকা রঙিন চাদরটি. চাদরের নিচে সে শুয়ে আছে। নানা ধরনের ছবি আঁকা লম্বা-চওড়া চাদরের গায়ে। গোটা চাদরটা একটা ছোটখাটো শহরকে চিহ্নিত করে রেখেছে। গোটা শহরটা তাকে চাপা দিয়ে আছে। ডাক্তার প্রশ্ন করে দোলাকে—'এই বিচিত্র চাদরটি কোথায় পেলেন?' দোলার কাছ থেকে চাদরের ইতিহাস শোনে ডাক্তার। একবার উনিশশ পঁচাশিতে রবীন্দ্রসদনের বিপরীত দিকে একটি বস্ত্র মেলার আসরে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু, কেরালা, উত্তরপ্রদেশ, ত্রিপুরা ইত্যাদি থেকে বস্ত্রব্যবসায়ীরা এসে তাদের দোকান সাজিয়েছিল। সেখান থেকে সে এবং দোলা একটি ফ্যানটাস্টিক্ নকশা করা শহর-আঁকা চাদর কিনেছিল। চাদরে আঁকা আছে মালটীস্টোরিড বিল্ডিং-এর পাশে মাঝারি ধরনের বিল্ডিং-এর পাশে একতলা সেকেলে দালানের পাশে টালির বস্তি। বস্তির গা ঘেঁসে গলি থেকে বড় রাস্তা, পাশে বড় বড় বিল্ডিং। বড় রাস্তা থেকে চওড়া রাস্তায় ট্রাম, পিছনে বাস, পিছনে মিনিবাস, পিছনে ট্যাক্সি পিছনে দোতলা বাস। ডান হাত লম্বা করে দাঁড়িয়ে থাকা ট্র্যাফিক পুলিশ। তার নিচে বারের টেবিলে মদের বোতল, চুপচাপ ঝুঁকে থাকা বসে থাকা মাতাল পুরুষ মাতাল মহিলা। মাইক হাতে প্রায় নগ্ন ক্যাবারে ডান্সার, পাশে আদিবাসী লোকনৃত্য। নিচে শ্মশানে চিতার শিখা, পাশে কবরের বুকে ক্রসচিহ্ন। নিচে গির্জা, পাশে মন্দির পাশে মসজিদ্। নিচে সিগারেট হাতে একদল বেশ্যা, পাশে মস্তান চোখে কালোচশমা হাতে হিংসার মানপত্র। নিচে এক লাইনে কিছু রঙিন ফুল, কিছু পাতাবাহার, কিছু গাছ। কয়েকটা পায়রা কয়েকটা মৌমাছি। নিচে ব্রেক ডান্সের ভঙ্গীতে একদল উগ্র পোষাকে ছাত্রছাত্রী। পরনে ধূসর নীল জিনস্ হাতকাটা গেঞ্জি গেঞ্জির বুকে ইংরেজীতে লেখা 'বিওয়ার অফ লাভ।' মাথায় রঙিন ফেট্টি বাঁধা। কেউ গীটার বাজিয়ে মার্কিনী কপি ক্যাটদের মতো গান গাইছে। পাশে ইংরেজী গানের কলি। হঠাৎ একসময় দোলার বলা হয়ে যায়, এই ফ্যান্টাসটিক চাদরটা আমার খুব পছন্দ। ওর পছন্দ নয়। তবে ও আমাকে কোন কাজে আপত্তি করে না। এটাও আমার কাছে একটা যন্ত্রণা।

ডাক্তার প্রশ্ন করেন 'ঘরের পর্দাগুলোর রঙ কার চয়েস?

'আমার চয়েস। তবে ওকে আমি জিজ্ঞেস করি, তোমার পছন্দ তো? ও সাড়া দেয় না।'

'মাথার শিয়রে রামকৃষ্ণের ছবিটা কার আঁকা?'

'ওর বন্ধু এঁকে দিয়েছে। রঙ ওকে কিনে দিতে হয়েছিল?'

'ঐ যে ছবিটা, উড়ন্ত পাখিগুলো একদল যুবকযুবতীরা দুহাত তুলে অভিনন্দন জানাচ্ছে, ওটা কে এনেছে?'

'আমার স্বামী কিনে এনেছে আর্ট একজিবিশন থেকে।'

'আপনার ঘরে ওয়েলপেণ্টিং দেখলাম। ফুটি ফাটা মাঠে শূন্য মাটির থালা হাতে জীর্ণ শীর্ণ এক পরিবার জড়োসড়ো হয়ে ভাতের আশায় বসে আছে। ঐ খরার ছবিটা কে এনেছে?'

'ওটা আমি কিনেছি। ড্রট আমার কাছে একটা ইণ্টারেস্টিং সাবজেক্ট।'

ডাক্তার বয়স্ক দম্পতির বাঁধানো ফটোর দিকে আঙুল তুলে বললেন 'ওটা কাদের ছবি?'

দোলা উত্তর দেয়, 'আমার শ্বশুর শাশুড়ি।'

'কোনদিন গভীর রাতে আপনার স্বামীর কান্না শুনতে পেয়েছেন?'

'একদিন পেয়েছি।'

'সেদিন কোন পারিবারিক অশান্তি হয়েছিল?'

'এমন কিছু নয়। তবে সেদিন ঘুমোবার আগে আমি ওর কোন আব্দার শুনিনি।'

'আপনার কোন পুরুষ বন্ধু আছে?'

'আছে।'

'জানে আপনার স্বামী?'

'জানে।'

'এ ব্যাপারে তিনি কোন আপত্তি-টাপত্তি করেন কি?'

'সেরকম কিছু নয়। তাছাড়া ব্যক্তিগত ব্যাপারে আমার স্বামী মাথা ঘামান না।'

ডাক্তার এখন একজন শুখো মানুষের চিত্ত বৃত্তান্ত শোনার জন্য দোলাকে বললেন, আমি আপনার স্বামীর সাথে এবার কথা বলবো। ওকে ডাকুন। 'শোন, ডাক্তারবাবু এসেছেন, তোমায় ডাকছেন, কিছু বলতে চান।'

নকশা-করা শহর-আঁকা চাদরটা নড়েচড়ে ওঠে; আস্তে আস্তে মুখের কাছ থেকে রঙিন চাদরটা সরে যায়। একটা মাথা চাদরটা থেকে বেরিয়ে আসে। ঘোলাটে চোখের কোনা লাল হয়ে আছে। মাথার ঘনপাতলা চুল পোলারের হাওয়ায় উড়ছে। কিছু অচেনা অজানা লোক ওকে বিরক্ত করতে এসেছে, এমনি ভাষা ওর চোখে মুখে ছড়ানো।

'আপনার ঘুম হয়?'

সে উত্তর দেয় না।

'এতো চাদর থাকতে আপনি কেন এই নকশা-করা চাদরটা গায় দেন।'

সে উত্তর দেয় না।

'উত্তর কলকাতা হাটখোলায় আপনাদের বংশের বাড়িটা এখনও আছে?'

সে উত্তর দেয় না।

দোলা জানায়, ওদের অংশটা বিক্রী করে তার শ্বশুর এই ফ্ল্যাটটি কিনেছেন।

'আপনি এই ফ্ল্যাটটি পছন্দ করেন ?'

সে উত্তর দেয় না।

'ছেলের সাথে কথা বলতে ইচ্ছা হয় না আপনার ?'

সে ছেলের দিকে তাকায়। নূপুর বাবার কাছে যায়। খাটে বসে প্রশ্ন করে, 'বাপি, তুমি আবার কবে কলেজে যাবে ?'

সে উত্তর দেয় না।

'আপনার চাঁদের আলো ভালো লাগে নাকি সূর্যের আলো।'

তবু সে নিরুত্তর। ডাক্তারের দিকে তাকায়।

'আপনার কোন্ ফুল, কোন্ রঙ প্রিয় ? যদি বলেন' —ডাক্তার নিরাশ হন, উত্তর পান না।

'আপনি কাকে ভয় পান, মৃত্যুকে নাকি জীবনকে ?'

সে ডাক্তারের প্রশ্ন এড়িয়ে সকলের দিকে দৃষ্টি ঘোরায়। নূপুরের দিকে দৃষ্টি ক্লোজআপ হতেই নূপুর বলে, 'বাপি, তুমি চুপ করে আছো কেন ? প্লিজ বাপি, গিভ্ সাম এন্সার।'

এবার সে উত্তর দেয় নূপুরকে, তুমি আমার সাথে ইংরেজিতে কথা বলবে না। তোমাকে আমি অনেকবার বারণ করেছি বাপি বলবে না, বাবা বলবে।

সে-র গলার স্বর ভাতের মতো নরম। সে আবার নক্শা-করা চাদরের-তলায় ঢুকে কাফন - ঢাকা মৃতদেহ হয়ে যায়। ডাক্তার বলেন 'উত্তর না দেওয়াটাও একটা মেণ্টাল সিনটম।'

ডাক্তারের শেষ রায়—'বডি সিনটম দেখে মনে হয় মনের রোগ এমন কিছু জটিল নয়।'

রায় শুনে দোলা নিশ্চিত নয় বলেই বলে—'তালে শুকিয়ে যাচ্ছে কেন ? কুকড়ে যাচ্ছে, ছোট হয়ে যাচ্ছে।'

একদিন আবার সব ঠিক হবে। এসব সাময়িক ডিপ্রেশন—বলেই ফিস নিয়ে ক্যাপসুল ও টনিক লিখে ডাক্তার চলে যায়। বলে যায়, মনের উপর চাপ সৃষ্টি করবেন না।

দোলার রাগ হয়। ডাক্তার আসে, ডাক্তার যায়। প্রশ্ন হয়, সে নিরুত্তর থাকে, নির্বাক থাকে। কেন সে শুকিয়ে যাচ্ছে ? কেন সে কলেজ যায় না ? কেন সে উত্তর দেয় না ? কেন সে কথা বলে না ? থাবার মতো প্রশ্নগুলো হিংস্র হয়ে উঠছে দোলার মধ্যে। কথা যে বলে না তা তো নয়। রাধার মার সাথে তো সে অনেক কথা বলে। রাধার মা ওর ছোটবেলার কথা শোনায় 'তুই কিছুতেই টাই প্যাণ্ট সার্ট পরে ইংরিজি স্কুলে যেতে চাইতিস না। বাবা তোকে বকে বকে পাঠাতো। তুই বড্ড জেদি ছিলি। দুগ্গাপুজোর সময়

একদিন কতগুলো ছেলে ঠাকুর তৈরী দেখতে আসে তোদের ঠাকুর দালানে। তুই একটা গরিব ছেলের সাথে বন্ধুত্ব করে ওদের বাড়ি গিয়ে ছাতুমাখা খাচ্ছিলি. তোর বাবা জানতে পেরে আমাকে পাঠায় আনতে। নিয়ে আসার পর তোর বাবা তোকে বেত দিয়ে মারল। তুই বড় হলি, ভালভাবে পাশ করে নামি কলেজে ভর্তি হলি। তখনকার কথা, আমার মেয়ে রাধা তোকে বন্ধুর বোনের চিঠি এনে দিল। তুই ভয়ে আর এগোলি না।' এসব অনেক কথা রাধার মা ওকে বলে। কখনও দোলার কানে আসে, কখনও আসে না। সবচেয়ে খারাপ লেগেছিল দোলার রাধার মার বিশ্রী অভিযোগ. 'আমার বাপু ঐ মানস শয়তান-টাকে ভাল লাগে না, যখন তখন আসা, ফষ্টিনষ্টি করা।' সে উত্তর দিয়েছিল. 'কি এসে যায় তাতে রাধার মা ? ওগুলো এক ধরনের বিকৃত নেশা। পুরুষ-দেরও থাকে, মেয়েদেরও থাকে। ওসব নেশা কেটে যাবে একদিন। জানি, তবু খারাপ লাগে।'

কথা বলতে চায় না দোলার সাথে। কথা বলতে চায় না নূপুরের সাথে। থাক্ রাধার মার কাছে সে। একমাস দোলা পিত্রালয়ে যায় না। ওর এসব অসুখ শুনে বাবাই দোলাকে বারণ করেছে যেতে। কিন্তু আর সে থাকবে না। মানস এ বাড়িতে এখন আসে না। অফিসে ফোনে যোগাযোগ হয় মানসের সাথে। দোলার ফোনের অপেক্ষায় থাকে মানস। দোলা ডাকলেই চলে আসে ঠিক করা জায়গায়। মানসের সংসারে টান পড়লে দোলা ওকে সাহায্য করে। নূপুরকে নিয়েই সে আজ পিত্রালয়ে যাবে। রাধার মাকে বলেছে সেকথা। কিছুদিন থাকবে, সাত দিন, দশ দিন, এক মাস, নাও ফিরতে পারে। হয়তো দোলার চলাফেরা, চালচলন, আচারব্যবহার ওর পছন্দ নয় বলেই সে এ রকম বোবা হয়ে গেছে। দোলা চলে গেলেই আবার সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু মানসকে নিয়ে তো সে নতুন করে ঘর করতে পারবে না। মানসের শরীরটা দোলার পছন্দ, কাছে টানে. কিন্তু মানসের স্বভাব, রুচি, আচরণ, শিক্ষা, ব্যবহার, সংস্কৃতি দোলাকে টানে না। কলেজের বন্ধু মানস থাকে ভাড়া বাড়িতে। স্ত্রী সেলাই শেখায়। একমাত্র মেয়ে পড়ে পাড়ার স্কুলে।

এক সময় দেখা যায় 'বাস দাঁড়াবে' যেখানে লেখা আছে, তার নিচে দোলা দাঁড়িয়ে আছে। হাতে বিশাল ভি আই পি এট্যাচি। নূপুরের কাঁধে নাইলনের ব্যাগ ঝুলছে। নূপুরের কাঁধটা একদিকে কাত হয়ে চেত্তা ঘুড়ির আকার ধরে আছে। এখনও দোলা চিন্তাভাবনা থেকে নির্মল হতে পারে নি। বারো বছরের বিবাহিত জীবনের স্মৃতির টুকরো টি ভির পর্দার মতো রোলিং হয়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে থামছে, আবার হচ্ছে। কিছু বিবাহিত জীবনের ছবি, কিছু তিক্ততা। ওর কণ্ঠস্বর মনের বিক্ষিপ্ত হাওয়ায় দোলে 'নূপুরকে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে দিও না। ওসব স্কুলে পড়ার অভিজ্ঞতা আমার আছে। মোটেই

ভাল নয়। তবু দোলা মানে নি, দোলা মানতে চায় না। পরদেশী কালচারে মুগ্ধ দাসি দোলার আজন্ম লালিত পারিবারিক কাগাব গা ধারনা, অভিজাত স্কুলে না পড়লে অভিজাত পরিবার গড়ে তোলা যায় না। অভিজাত পরিবার, বনেদি পরিবার, শিক্ষিত পরিবার, মধ্যবিত্ত পরিবার, ধনী পরিবার। আবার বিপরীত মেরুদণ্ডে আছে দরিদ্র অশিক্ষিত নিম্নবিত্ত পরিবার। এভাবেই তো মানুষ তার প্রিয়মনকে টুকরো টুকরো করে ফেলছে। ফাঁপা মানসিকতায় মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়ছে। নকল আভিজাত্যের পিছনে অকারণ ছোটা, অবিরাম ছোটা, দোলা প্লিজ স্টপ হিয়ার, আর নয়, থামো। কেন এতো রাত করে ফেরো প্রায় দিন। ছেলেটা একা থাকে, অথচ ফ্ল্যাটের ছেলেদের সাথে মিশতেও দাও না। মনের জেলখানায় বন্দি করে রেখেছ ছেলেকে। সারাক্ষণ রাধার মায় কাছে থাকাটা ভাল লক্ষণ নয়। সে মাকে চায়। হ্যা তুমি কর্তব্য কর, ছেলেকে অবহেলা কর না, খাবার সাজিয়ে রাখ, জামা কাপড় গুছিয়ে রাখ, বিছানা ঠিক করে রাখ মাস্টারমশাই এলে কি করতে হবে নির্দেশ রাখ, এসবই রাধার মাকে গুছিয়ে বলে যাও। কিন্তু নূপুর কর্তব্য চায় না, মাতৃত্ব চায়।

দোলা মানে না এসব কথামৃত, মানতে চায় না।

মা, আমাদের বাস চলে গেল। সুইচ টেপা গলায় নূপুর বলে।

দোলা ভাবতে থাকে ···

মা, খালি ট্যাক্সি চলে গেল।

দোলা ভাবতে থাকে···

পাশে রাখা ভি আই পি স্যুটকেস, মাঝারি গড়ন। গাছ থেকে মাঝে মাঝে হলুদ ফুল টুপটাপ পড়ছে দোলার গায়ে। কোনটা হলুদ ফুল, কোনটা দোলার গায়ের রঙ বোঝা যায় না। দোলার মনে এলোমেলো কনকনে হাওয়ায় উড়ছে স্বামীর কণ্ঠস্বর 'ঘন ঘন বাপের বাড়ি থাকলে নিজের বাড়ি কবে গড়ে তুলবে দোলা। আমি তো মনে করি বাড়ি মানে ফ্ল্যাট, ফোন, রঙিন টি ভি, ফ্রিজ, বাইক, ভিডিও এসব নয়। পরিবার মানে এসব পারিবারিক বিজ্ঞাপন নয়। পরিবার মানে আমি তুমি নূপুর। পরিবার মানে তোমার আমার সন্তানসন্ততির শিক্ষাদীক্ষা আচার-আচরণ, রুচি-সংস্কৃতি প্রেমপ্রীতি।'

দোলা মানে না এসব কথামৃত, মানতে চায় না। সে চিল হতে চায়, মাটি ছেড়ে অনেক উঁচুতে উড়তে চায়। কিন্তু এখন দোলার মনে 'হায় চিল, সোনালি ডানার চিল······ · ···, তোমার কান্নার সুরে বেতের ফলের মতো ম্লান চোখ মনে আসে।'

মা আবার আমাদের বাস এসে গেছে। একদম্ খালি বাস।

দোলা ওঠে না। খালি বাস চলে যায়। দোলার ভাবনার স্রোতে নূপুরের কথা ভেসে চলে যায়।

আবার একটা ট্যাক্সি মা। ডাকবো ?

না।

নেতিবাচক ভারি শব্দ দোলার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে। এ রকম একটা কঠিন কণ্ঠস্বরের সাথে নূপুর এই প্রথম পরিচিত হয়। নূপুর মা-র মুখের দিকে তাকায় যেন একটা সুন্দর পৃথিবী দেখছে। বেতের ফুলের মতো ম্লান চোখ দোলার মনে ছবি হয়। গম্ভীর দোলা মনের আকাশে সেই চোখে দেখে একটা বিশাল চিল ছোঁ মেরে নকশা-করা শহর-আঁকা রঙিন চাদরটা ঠোটে করে নিয়ে উপরে উঠে যাচ্ছে। ওর স্বামী খোলা জানলার ধারে বসে ঐ দৃশ্য দেখে শিশুর মতো আনন্দে হাততালি দিচ্ছে। নূপুর মার মুখের দিকে তাকিয়েই দেখে মার মুখের জটিল ভাষা সহজ হয়ে আসছে। মার কথাটা আরেকবার শুনবে বলে নরম শান্ত গলায় আবার প্রশ্ন করে, মা, মামার বাড়ি যাবে না ?

না। বাড়ি চল, আমাদের নিজেদের বাড়িতে, তোর বাবা একা আছে।

ফ্ল্যাট কেনার পর এই প্রথম দোলা ফ্ল্যাটকে নিজের বাড়ি বললো। দোলা দেখে, নূপুর ছুটছে নিজের বাড়ির দিকে।

□□□ পরমার্থ ভাষণ □□□

না পনরোই আগস্ট নয়। আজ চোদ্দই আগস্ট।

আজ মানসের জন্মদিন। প্রতি বছর হয়, এ বছরও হবে। মা কলেজে। বাবা অফিসে। বোন স্কুলে। মানস এখন একা এই ফ্ল্যাটে। মা ফিরবে, বোন ফিরবে, বাবা ফিরবে। সাতটার পর এই ফ্ল্যাট আর নির্জন থাকবে না। মানার বন্ধুরা আসবে। মানসের বন্ধুরা আসবে। মামা মাসী, পিসি পিসেমশাই আসবে। কাকা কাকিমা আসতে পারবে না। মা'র এক কাছের মেয়ে বন্ধু আসবে। বাবার এক বন্ধু আসবে। তাদের স্বামী আসবে, স্ত্রী আসবে। সবাই আসবে, আসবে না একজন সে প্রিয়া। আজ সকালে প্রিয়া ফোন করেছে। বোন মানা ফোন ধরেছে, মানস ছিল না। বলেছে, সে আসবে না।

এখন দুপুর। কাক ডাকে। মানস একা। গ্রিল-জানলার পর্দা সরালে দেখা যায়, কালো-সুতোর মতো রেল লাইন। কাছেই উল্টোডাঙ্গা স্টেশন। নাম পাল্টে গেছে, হয়েছে বিধাননগর রোড। মানস পর্দা সরালো না। টেপ চালালো। হেমন্তর গলায় রবীন্দ্রসংগীত 'আজি বিজন ঘরে।' একটু শোনে। তারপর বন্ধ করে দেয়। ভালো লাগে না। 'আত্মঘাতী বাঙালী' নীরোদ চৌধুরীর বই নেয়। শোয়। দু-এক পাতা পড়ে। তারপর বন্ধ করে দেয়। ভালো লাগে না।

ঘুরে আসি। ভাবে।

আজ মানস স্বাধীন হতে চায়। আঃ স্বাধীনতা। আজ সে ইচ্ছামত নিজেকে আনন্দে মাতিয়ে রাখতে চায়। ওর কাছে সাড়ে তিনশো টাকা আছে। মানসের নিজের টাকা। বাবা দিয়েছে, মা দিয়েছে। দিতে দিতে সাড়ে তিনশো টাকা হয়েছে। এই টাকা নিয়ে এখন সে বের হবে। টাকা নিয়ে সে একা ফুর্তি করবে, আনন্দ করবে। যা কিছু সে করবে একা, কেউ জানবে না, কাউকে জানাবে না, কাউকে না। কিছু আনন্দ থাকে যা ব্যক্তির সম্পূর্ণ নিজস্ব, কেউ জানে না। এ রকম আনন্দ মানসেরও থাকতে পারে, থাকা স্বাভাবিক। আঃ স্বাধীনতা, তুমি কত সুন্দর, তুমি কত পরম। স্বাধীনতার স্বাদ নিতে বের হয় মানস। সে বাইক নিয়ে বেরোতে চায় না। যেখানে খুশী বাইক নিয়ে যাওয়া যায় না। বাইকেরও শর্ত থাকে। বাইকের একটা চিন্তা থেকে যায়। আজ সে কোন চিন্তা করবে না, কিছু নিয়ে ভাববে না। সে আজ নিজের আনন্দ নিয়ে ভাববে, সে আজ নিজের জন্মদিন নিজে পালন করবে বাইবে, মনের বাইরে।

মানস তৈরী হয়। রঙ চটা র‍্যাঙলার জিনসের প্যান্ট, না-গোজা ঢোলা

চাইনিস কাট টি-সার্ট, চওড়া কব্জিতে টাইটান কোয়ার্জ, চোখে ফোল্ডিং রঙিন চশমা। মানসকে দেখে মনে হয় সিগারেট কোম্পানির ইয়ং মডেল মুখে সিগারেট নিয়ে গাড়িতে হেলান দিয়ে কাগজ পড়ছে। পকেটের ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় তিনশ টাকা, পার্সে পঞ্চাশ।

না, সে প্রিয়ার বাড়ি যাবে না। আজ সকালে প্রিয়া ফোন করেছে, সে এ বছর মানসের জন্মদিনে যেতে পারবে না। নিষেধ মানুষকে টানে, মানসকে না। সে অবহেলা করতে জানে, আবার গ্রহণ করতেও জানে। প্রিয়া কেন আসবে না? বাবার অসুখ? হয়তো। মমতাশঙ্করের নাচের রিহার্সাল? হয়তো। বাড়িতে কোন অনুষ্ঠান? হয়তো। সে রাজেশের বাড়িও যাবে না। সে আসবে। স্বাধীনতার স্বাদ নিতে সে কাউকে সঙ্গী করবে না।

আজ সে স্বাধীন। সে ভারতীয় নাগরিক। যা কিছু করা তার মৌলিক অধিকার। তবে কারোর ক্ষতি করে নয়, কারোর অমতে নয়। নিজের অমতে চলায় থাকে নিষিদ্ধ স্বাধীনতা।

মানস এখন রাস্তার ধারে দোকানের পাশে দেয়ালে হেলান দিয়ে দ্বিতীয় বোতল থামস-আপে তন্ময়। সে সময় মানসের একটা উদাস দৃষ্টি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। সেই দৃষ্টিতে বিশেষ দৃশ্য নেই। খুচরোর জন্য মানস হাত বাড়ায় না, দোকান থেকে সরে এসে বাস স্টপে দাঁড়ায়। অপেক্ষা করতে হয় না। একটা ট্যাক্সি এসে যায়। ভিতরে সুখী পরিবার। বাবা নামে, মা নামে, মেয়ে নামে। মেয়ে তাকায়, সামনে মানস। ট্যাক্সি খালি হয়। মানস এগোয়। ড্রাইভার হাত বাড়িয়ে মিটার-বক্স ডাউন করে। যাবে? বসুন। দুটি শব্দ উঠে আসে ভিন্ন স্বরে। মানস বসে। ট্যাক্সি চলে। সরে সরে যাওয়া গাছ থেকে গাছে মানসের দৃষ্টি লাফাতে লাফাতে যায়। কখনও কখনও গাছে গাছে হলুদ ফুল। হলুদ ফুল মানসের দৃষ্টি ধরে রাখে।

মানস, আমি লেখক। তোমার সাথে নিরিবিলিতে দুটো কথা বলতে চাই। আমাদের এই দরিদ্র দেশে তুমি সাড়ে তিনশ টাকা ওড়াতে যাচ্ছো কেন? ওই টাকায় তো ইন্দিরা বিকাশ পত্র কিনে নিতে পার। দেড়শ টাকা আরও ভরে পাঁচশো টাকার একটি ইন্দিরা বিকাশ পত্র। এখন তোমার বয়স পঁচিশ। ষাট বছরে সেই টাকা হবে ষাট হাজার। হয়তো আরও একটু কম বা বেশি। কিম্বা তোমার পরিচিত এক শিক্ষিত দরিদ্র বেকার যুবককে দাও। একশ টাকার লটারির টিকিট পচাত্তর টাকায় কিনে বিক্রী করতে পারবে। কিম্বা বাগরী মার্কেট থেকে তিনশ টাকার কসমেটিক কিনে চারশ টাকায় বিক্রী করতে পারে। এই কি মানস, তুমি গা এলিয়ে রিং করে ধোঁয়া ছাড়ছো।

সারি সারি দোকানপাট সরে যায়। বেহিসেবী সময় মানসকে এনে দেয় ঘুম ঘুম জগৎ। ট্যাক্সি চৌরঙ্গি এসে থামে। দরজা খোলার শব্দ হয়। মানস

নোট বের করে দেয়। সামান্য কিছু খুচরো নিতে হাত পাতে না। নোট দিয়েই সরে যায় দ্রুত। এলিটের সামনে এসে দাঁড়ায়. ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের একটি ফিল্ম। আনসেন্সারড, স্ট্রিকটলি এডালটাস পিকচার। সুইডেনের ফিল্ম। ব্ল্যাকারদের গলা শোনা যায়। পাঁচ কা বিশ, পাঁচ কা বিশ। খুব ভিড়। জনসাধারণ ছবিটা খায়। জীবনের কষ্ট ভুলে ব্ল্যাকারদের হাতে টাকা গুঁজে দেয়। ভিসিপিতে মানস বাড়িতে বসেই বিদেশি বই দেখে। অশ্লীল বই দেখাব অভিজ্ঞতা আছে। এত ভিড় একটা অস্বস্তি এনে দেয় মানসকে। একটা এক্স্ট্রা টিকিটের জন্য বিড়াল তপস্বী হয়ে দাঁড়িযে আছে অনেকে। ব্ল্যাকাররা নিজস্ব ভূমিকায় কিছু লোকের শ্রদ্ধা কুড়োয়। তবুও পাঁচটাকা কেন, দুটাকাও কমায় না। একটা অসীম আনন্দ মানসকে এই মুহূর্তে টানে. আমি যেতে পারি, কিন্তু যাব না। আর তখনি মানসের পকেটে পার্সবন্দি অর্থ ছটফট করে। বলে. 'আমায় মুক্তো কর।' ওখান থেকে সরে যায়। হাটে, হাটতে হাটতে ফুটপাতে ব্যাটারির বাক্সে বসে মাটির ভাড়ে চা খায়। পাশের দোকান থেকে নেয় চৌকো চৌকো আলু ভাজা। বাবা বলতেন. এখনও বলেন, আমরা খুব কষ্ট করেছি। খিদে মারার জন্য ফুটপাথে বসে চা খেয়েছি। খিদে পেলে ফুটপাথে বসে ছাতু-মাখা খেয়েছি। এখন মানসের বাবা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অফিসার। দক্ষ ডব্লিউ. বি. সি. এস, প্রশাসক। খুচরো পয়সা কারোর কাছ থেকে ফেরৎ না নিযে সেখান থেকে চলে আসে।

আবার হাটে। ফুটপাথে উঠে আসে। সন্ধ্যার ফুটপাথ বোঝা যায় না। বড় বড় দোকানে সাইড শোকেস থেকে বের হয়ে রাস্তায় পড়ে থাকে নিয়নের নিস্তেজ আলো। সাইড শোকেসের সামনে মানস মাঝে মাঝে থামে। রঙীন চশমাটা কপালের উপর তুলে দেয়। দেখে রেডিমেড জিনসের প্যান্ট সার্ট। নতুন ডিজাইন, নতুন কাটিংস। মড ডিজাইন একটা জিনসের প্যান্টের দাম দুশ পঞ্চাশ। কেনা যায়। পকেটে এখনও তিনশ টাকার বেশি। কিন্তু মানসের অনেক প্যান্ট অনেক সার্ট, অনেক গেঞ্জি। মা আনে বাবা আনে। বাবার সার্টও মানস গায়ে দেয়। আজকের ফ্যাশন ঢিলেঢালা পোশাক। মানসের কাঁধ চওড়া। স্মার্টনেস ফিরে পায়। চওড়া ইচ্ছাটা ছোট হয়ে আসে। মানস শোকেস থেকে সরে যায়। পকেটে হাত ঢোকায়। পার্স ঠিক আছে। পার্স বন্দি অর্থ ডানা ঝাপটায়। পকেটে খাঁচার পাখীর মতো ছট্‌ফট করে। বলে 'আমায় মুক্ত করো।' মুক্ত হতে না পেরে অর্থ নিস্তেজ হয়।

একটা ট্যাক্সি ডাকে। মানসকে ছেড়ে চলে যায়। আবার ডাকে। হাত নাড়িয়ে চলে যায়। এবার বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে। খালি ট্যাক্সি আসে না। একটু এগিয়ে যায়। খালি ট্রাম আসছে। সেকেন্ড ক্লাসে ওঠে। জানলার ধারে বসে। বাবা বলতেন, এখনও বলেন, আমরা যখন ছাত্র ছিলাম, খুব কষ্ট

করতাম। হাটতাম নতুবা সেকেণ্ড ক্লাস ট্রামে যাতায়াত করতাম। অভ্যাসটা রয়েই গেছে, এখনও মাঝে মাঝে উঠি। না, কোন প্রিয় নারীর অশরীরী ভাবনা আসে না। স্বাধীনতার স্বাদ সে পেতে চায়। আজ দেশ স্বাধীন,নাগরিক মুক্ত। সেই স্বাধীন দেশে মানসেরা কেমন আছে ; মানস ভাবতে চেষ্টা করে। ভাবতে গেলে রাজনীতি আসে। রাজনীতি মানসের পছন্দ নয়। মানস ফিল্ম ভালবাসে, ফটোগ্রাফি ভালবাসে। মানস এসকল চিন্তাভাবনা থেকে সরে গিয়ে প্রাপ্তবয়স্ক ভাবনার পাশে দাঁড়ায়। অর্থ সব স্বাধীনতা পায়ের কাছে এনে দিতে পারে। মানস পকেটে হাত রাখে, অর্থ ছটফট করে। অর্থ সব পাপ এনে দিতে পারে,অর্থ সব পুণ্য এনে দিতে পারে। অর্থ নিচে নামায় অর্থ উপরে তোলে। ভাবনা সবে যায়। হেদোয় নামে। একটা রিক্সা নেয়। দর না করে উঠে বসে। মানসের মুখে সেণ্ট্রাল এভিনু কথাটা শোনা যায়। দিন যায়, সন্ধ্যা যায়। সদ্য ফোটা রাত আসে। রিক্সাঅলা বড় রাস্তা পার করে গলির মুখে রিক্সা থামায়। একটা পাঁচ টাকার নোট রিক্সাঅলার হাতে গুজে দিয়ে 'এসো' বলে। দালাল আসে। সরু পাজামা, ফুলতোলা ঢোলা সাদা পাঞ্জাবি। না, আতরের গন্ধ নেই। বরং হাতে একটা পরিষ্কার গামছা। মুখে দামি জর্দার গন্ধ। প্রায় কানের কাছে মুখ এনে বলে, দশ থেকে একশ টাকা যেরকম খুশি। জিনিস ভাল পাবেন। পিক না ফেলায় কথাগুলো জড়িয়ে যায়। মানসের বুঝতে অসুবিধা হয় না। সে কোন কথা না বলে এড়িয়ে যায়। এ পাড়ায় বন্ধুদের সাথে দু-একবার এসে ঘুরে গেছে। ঘর দেখেছে, কিন্তু কোনদিন ঘরে যায়নি। আজ একা। স্বাধীনতার বিষ নিশ্বাস টেনে নেয়।

আজ তিনতলা দালানের একতলায় ঢোকে। লম্বা ঢাকা বারান্দার দুধারে সারি সারি এক ঘরের ফ্ল্যাট। প্রতি ঘরের সামনে নারীর মুখ। দোতলায় যায়। প্রতি ঘরের সামনে নারীর মুখ। তিনতলায় যায়। প্রতি ঘরের সামনে নারীর মুখ। দুর্গার মতো নারীর মুখ নয়,লক্ষ্মীর মতো নারীর মুখ নয়। সেই মুখে চঞ্চলতা নেই, উজ্জ্বলতা নেই, ফুল নেই ফল নেই। সেসব রক্তশূন্য মুখে সকল সাজের বাহার আছে, সবাই তৈরী মানসকে আনন্দ দিতে। হাসি ফোটায়, চোখ নাচায়,গান গায়,বুকের আঁচল খসায়। কেউ সিগারেট টানে, কেউ সুগন্ধি পান চিবোয়। কারোর হাতে গোলাপ ফুল, কারোর হাতে সিনেমা জার্নাল। সবাই যেন একটা কথা বলতে চায়—যৌন কাতর নাগরিক এসো আমার ঘরে। মানস ঘরে যেতে দেখে কোচিং-এর স্যারকে। আরও দেখে পঞ্চাশ টাকার একটা নোট গুজে দেয় এক পণ্যা নাগরিকার হাতের মধ্যে।

আবার স্বাধীনতা নামক অসুখটা মানসকে কামড়ায়। প্যাণ্টের পকেটে হাত রাখে। অর্থ ঠাণ্ডা পাপড়ের মতো নেতিয়ে আছে। পার্সে হাত রাখে, অর্থ নিস্তেজ হয়ে পড়ে আছে। আর ছটফট করে না। 'এসো মুক্ত করো,'

বলে না। মানসের অমুক্ত অর্থ ঘুমিয়ে আছে, কিন্তু যৌনকাতর ভদ্র নাগরিকের অর্থ সর্বদা মুক্ত। মানসের ভাবনা পাল্টে যায়। ছুটে আসে শ্যামলীর মুখ, দীপার মুখ, সুরশ্রীর মুখ। এরা মানসের গার্ল ফ্রেন্ড। এদের সাথে সিনেমায় যায়। পার্কে বসে, কফিহাউসে বসে। রাস্তায় হাটে, বাড়িতে যায়। হঠাৎ প্রিয়ার মুখটা নাকের কাছে চলে আসে। কি সুন্দর মুখ প্রিয়ার। সেই মুহূর্তে প্রিয়া পিকাসোর সরল মেয়েটি হয়ে মানসের নিজস্ব ঘরের দেয়ালে সেটে থাকে। পিকাসোর ছবিটির নিচেই মানসের খাট। এ কদিন মানস সেই খাটে প্রিয়ার সাথে সহবাসও করেছে। এদের সাথে সহবাসের ইচ্ছা জাগে না আর।

মানসের নাকে গন্ধ আসে। চিন্তা কেটে যায়। হাওয়া ভাসায় ধূপের গন্ধ, বেলফুলের গন্ধ। শাড়ি থেকে উড়ে আসে সেন্টের গন্ধ। সমাজটা পাল্টে গেলে এসব পণ্যা নারীর মুখ মায়ের মুখ বা বোনের মুখ হতো। প্রেমিকার মুখ হতো, স্ত্রীর মুখ হতো। মানস সেখান থেকে দ্রুত নেমে আসে। নামার সময় 'পছন্দ হলো না' শুনতে পায়। রাস্তায় নেমে এসে প্যাণ্টের পকেটে হাত দেয়। পার্স ঠিক আছে। পার্সবন্দি, পকেটবন্দি টাকা ঝিমিয়ে পড়েছে। দালাল আবার পিছু নেয়। দালালকে নিয়ে ফুটপাথে বেঞ্চে বসে। দুটো চা দিতে বলে। একটা লেবু চা। তারপর দুজনের মধ্যে কথা শুরু হয়। এখানকার পণ্যা নারীদের নিয়ে কথা নয়। তোমার বৌ আছে? আছে। ছেলেমেয়ে আছে? আছে। এরা কোথায়? দেশে। দেশ কোথায়? ইউ পিতে। বাবা-মা আছে? মা আছে। আর কথা হয় না। চুপচাপ চা-বিস্কিট খায়। মানস বিস্কিট খায় না। দশ টাকার একটা নোট দালালের হাতে দেয়। 'চা বিস্কুটের দামটা দিয়ে বাকিটা তুমি নিয়ে নিও। ওটা তোমার বখশিস।' দালাল সেলাম জানায়।

তখনি একটা এসপ্লানেডের মিনিবাস এসে যায়। মানস বসার জায়গা পায়। টিকিট কাটে। পকেটে দেশের দশের টাকা, এখন মানসের টাকা। ঠাণ্ডা পাপড়ের মতো নেতিয়ে আছে। আবার রাতের চৌরঙ্গি ফিরে আসে মানসের কাছে। পণ্যা নারীর মতো চৌরঙ্গি সাজে। পুরুষ চেনে চৌরঙ্গি। নারী চেনে চৌরঙ্গি। তাই চোখ মারে। কাছে টানে। উত্তেজনা বাড়ায়। অ-মানসেরা বারবার ফিরে আসে এখানে। মানসও ফিরে আসে একদিন। সাথে ফিরে আসে একটা জেদ। টাকা সে খরচ করবেই। নিজেকে সে টাকার ভেতর আবিষ্কার করতে চায়। তার চোখে জুতোর দোকানের বিশাল শো-কেস। সাজানো দামি চটি, স্যাণ্ডেল, সু। নানা ডিজাইন। পার্স বন্দি অর্থের ঘুম ভাঙ্গে। হয়তো এবার সে মুক্ত হবে। কিন্তু মানসের পাঁচ জোড়া জুতো। দুজোড়া মড সু। আজ জন্মদিন। হয়তো একজোড়া এসে যাবে। কেনার ইচ্ছা থাকলেও কেনা যায় না। মানস সেখান থেকে সরে আসে। আবার

হাটে। একটা ভাল দোকানে ঢোকে। চিকেন স্টু খায়। সাথে নেয় তিনপিস টোস্ট। চিকেন স্টু ওর প্রিয় খাদ্য। খাওয়া শেষ হয়। দাম মিটিয়ে বেরিয়ে আসে মানস। পান করার নেশা জাগে। কলেজ লাইফে পার্ক স্ট্রিটে একটা বারে আসতো। একা আসতো না। সমর, বিপুল, আবীর এরাও আসতো। মদ্য পান করা শখ ছিল। নেশা ছিল না। আজও মানস সেই বারের সামনে এসে দাঁড়ায়। আর তখনি 'হ্যাল্লো বয়। অনেকদিন পর দেখা। কেমন আছো? কি করছো?' শোনে। তাকিয়ে দেখে দীপক স্যার। উনি মদ্য পান করেন, মানস জানে। এক বছর এই স্যারের বাড়িতে প্রাইভেট পড়েছে মানস। 'সি এ পড়ছি' শোনার পর স্যার বারে ঢোকেন। মানস ভাবে, ডিপ-ফ্রিজে বাবাও দামি ওয়াইন রেখে দেয়। বাবা বারে যায় না। আমরাও সেখান থেকে পান করি। কমে গেলে বাবা কিছু বলে না। মার পছন্দ না। বোনও করে না। তবে স্বাদ গ্রহণে আপত্তি থাকে না কারোর। মানস ইচ্ছার নেশা ফিরিয়ে নেয়। মরার মতো পড়ে থাকে টাকা।

টাইটান কোয়ার্জ দেখে। রাত আটটা এখনও বাজে নি। দশ মিনিট আছে। ট্যাক্সি ধরে গেলে বাড়ি পেঁছিবে সাড়ে আটটার মধ্যেই। স্কুল থেকে ফিরে মানা দেখবে দাদা নেই। কলেজ থেকে ফিরে মা দেখবে ছেলে নেই। অফিস থেকে ফিরে বাবা দেখবে ছেলে নেই। মানসকে না দেখে মানা অবাক হবে। মানসকে না দেখে বাবা অলকেশ অবাক হবে। সবাই অপেক্ষা করবে।

আবার একটা ট্যাক্সির জন্য দাঁড়িয়ে থাকে মানস। দাঁড়িয়ে থাকে এবং দাঁড়িয়ে থাকে। হাতে সিগারেট।

মানস, আমি লেখক। টাকা ওড়াতে পারলে না তো। অথচ এই চৌরঙ্গিতে কালো টাকা এখন ফুর্তির জন্য উড়ছে। এমন সময় একটা দুর্ঘটনা ঘটে। লোক ছুটে যায়। মানসও ছুটে যায়। আহত যুবককে দেখে। পা দিয়ে রক্ত ঝরে। যন্ত্রণায় ছটফট যুবকের কষ্ট দেখে। খয়ে যাওয়া হাওয়াই চটি ছিটকে পড়ে আছে। রোগা যুবক। একটা খালি ট্যাক্সি আসে। ট্যাক্সি ঘিরে ফেলে। ট্যাক্সি থামলে চটপট চারজন মিলে ভিতরে তুলে নেয় কাতরানো যুবককে। চারজনের মধ্যে একজন মানস। চারটি রুমাল দিযে বাঁধা ক্ষতস্থান। রক্তে ভিজে যায় রুমাল। আহত যুবক জামা খুলে দেয়। পাশে ঝোলাব্যাগ রাখে। মানস লক্ষ্য করে যুবকের গেঞ্জি ময়লা এবং ছেঁড়া। রক্তে ভেজা রুমালের উপর জামা বাঁধা হয়। জামার পকেট থেকে একটা কার্ড পড়ে যায়। একজন তোলেন। দেখেন এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের কার্ড। দশ বছর রিনিউ চলছে। আহত যুবকের কাঁধের ঝোলাব্যাগে ঢুকিয়ে রাখেন। ট্যাক্সি মেডিকেল হাসপাতালের দিকে যায়। ১নং ভদ্রলোক বাটা থেকে জুতো কিনতে এসেছিলেন। কেনা হল না। ২নং ভদ্রলোক বার এ যাবেন এবং একটু

আধটু খুচরো ফুর্তি করবেন বলে এসেছিলেন। বারে বন্ধুরা অপেক্ষা করবে। বার-এ যাওয়া হল না। ৩নং ভদ্রলোক সপ্তাহে একদিন এসপ্লানেডে আসেন. সিনেমা দেখেন, বিরিয়ানি-মাংস-পরোটা খান, বাড়ি ফেরেন রাত করে। তার আজ খাওয়া হল না। ৪নং ভদ্রলোক মানস। ড্রাইভারের পাশে বসে আছে। সে টাইটান কোয়ার্জ দেখে। হাসপাতালে পৌঁছে দিয়েই ফ্ল্যাটে ফিরতে হবে। সবাই বসে আছে। স্বাভাবিক ভাবেই মা-বাবা রেগে থাকবে।

হাসপাতালের ভিতর ট্যাক্সি ঢোকে। দ্রুত দরজা খুলে দুজন বেরিয়ে আসে। এমারজেন্সিস খবর পায়। স্ট্রেচার আসে। আহত যুবক স্ট্রেচারের উপর। তিনজন স্ট্রেচারের সাথে যায়। একা মানস ড্রাইভারকে ভাড়া দিয়ে বলে. একটু অপেক্ষা কর। আমি এখনি ফিরবো। মানস ভিতরে যায়। ডাক্তার এসেছে। দুজন ডাক্তার। একজন জুনিয়র। সিনিয়র ডাক্তার বলেন. 'এখনি এম্পুট করতে হবে। রক্ত লাগবে। বাড়িতে খবর দিন।' মানস তিনজন ভদ্রলোকের কাছ থেকে টাকা চায়। সাধ্যমতো টাকা চায়। সবাই একটি কথা বলে, কাছে নেই। ১নং ভদ্রলোক বলেন, আমি বরং ওর বাড়িতে খবর দিয়ে আসি। বলেই তিনি আহত যুবকের কাছে যান। ঠিকানার কথা বলেন। যুবক যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে এখন নিস্তেজ যেমন মানসের পকেট বন্দি পার্সবন্দি অর্থগুলোর অবস্থা। ১নং ভদ্রলোক আহত যুবকের কাঁধ-ঝোলা ব্যাগ থেকে ডাইরি বের করে। ডাইরি থেকে ঠিকানা টুকে নেয়। ডাইরির দু একটা পাতা উল্টে যায়। এক টুকরো কবিতা চোখে পড়ে। ভুখা মানুষের হাতে হে প্রিয় সমাজ এখন কি দেবে? প্রেম? মৃত্যু? খাদ্য? নাকি শুধু স্বপ্ন? ভদ্রলোক শব্দগুলো পড়ে দুঃখ পায়। ডাইরি রেখে দেয়। আমি যাই, বলে চলে যায়। ২নং ভদ্রলোক 'কিছু মনে করবেন না দাদা' বলে তিনিও চলে যান। ৩নং ভদ্রলোক আগেই চলে গেছেন। তিনি কাউকে কিছু বলেন নি। যাবার আগে তিনি একবার পিছন ফিরে তাকিয়েছিলেন। যদি মানস চলে এসে আবার বলে, বাঃ কাটছেন! কিছু দিয়ে যান। না মানস যায় নি। মানস এখন একা। জুনিয়র ডাক্তার মানসকে বলেন, 'সবাইতো চলে গেল। তাহলে রক্ত? যাগ্‌কগে বাড়ির লোক আসুক। তারপর কাজ হবে।' মানস অভিজ্ঞতায় গম্ভীর হয়ে যায়। বলে, 'এখনি অপারেশন করুন। আমি রক্ত নিয়ে আসছি। এরপর ওর বাড়ির লোক এসে নিশ্চয়ই যাবে।'

মানস, না আর কোন দ্রুততা নয়, আস্তে আস্তে হাটে। রক্তের বোতল দেবার সময় ডাক্তারকে 'আজ আমার জন্মদিন' বলাটা ঠিক হল না। করিডর লম্বা বারান্দায় এখন আর কেউ নেই। মানস একা হাটে। পকেট ফাঁকা। আহত যুবককে ওটি-তে নিয়ে গেছে। সযত্নে রাখা নোটগুলো লাল ডানা লাগিয়ে বাঁদ্রপাখী হয়ে উড়ে গেছে। পার্স পড়ে থাকে বাড়ি ফেরার

দু-একটা ছোট নোট। মানসের নাকে হাসপাতালের গন্ধ উঠে আসে না। মানসের মনটা যেন মানসের মন থেকে এই মুহূর্তে সাদা পায়রা হয়ে উড়ে চলে যায়। খানিকটা সময় আকাশে উড়ে এসে আবার মানসের মনে এসে বসে।

ট্যাক্সি ঠিক দাঁড়িয়ে আছে। বুড়ো আঙুল চেপে দরজা খোলে। ভিতরে ঢুকে বন্ধ করে। 'উল্টোডাঙ্গা ভি-আই-পি রোড,' বলেই একটা হাটু ভেঙে গদির উপর তুলে দিতেই শরীরটা বেঁকে যায়। গা এলিয়ে দেয়। আবার হাতে সিগারেট। চোখ বোজে মানস। মানা কি টেপ চালায়নি? মানা সুচিত্রা মিত্রকে ভালবাসে। মানস ভালবাসে না। মানা 'কালো তা সে যতই কালো হোক' ভালবাসে। মানসও ভালবাসে। প্রিয়া কালো। প্রিয়া যেন সুচিত্রা মিত্রের গান। আবার প্রিয়া চলে আসে। মানস চোখ খোলে। বাকি সময়টুকু আর চোখ বোজে না। গা এলিয়ে দেয় না। টানটান হয়ে বসে।

ঠিক আটটা চল্লিশ মিনিটে পার্সশূন্য পকেটে সে এসে দাঁড়ায় তিনতলায় নিজেদের ফ্ল্যাটের সেগুন কাঠের চওড়া দরজার সামনে। কলিং-বেলে আঙুল ছোঁয়ায়। ভিতরে পাখির ডাক শোনে।

মানা দরজা খোলে। দাদাকে দেখে আনন্দে মানার গলার ভেতর থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসে দুটি উষ্ণ শব্দ 'প্রিয়া এসেছে।'

মানস ঢোকে। ঘরের ভিতরে গভীর গাম্ভীর্য। কারণ সবাই অপেক্ষা করছে। আর প্রায় তিন ঘণ্টা বাদে স্বাধীন দেশের জন্মদিন।

□□□ এক মুঠো সরষের খোঁজে □□□

সে মারা যাবে। এটা ওব ধারণা, এটা ওর ভাবনা। প্রজাপতির ডানা মেলার মতো ভয় খুলে যায় ওর মনে। সে ভাবে মৃত্যু এগিয়ে আসছে। শিশু যেমন হাটে, মৃত্যুও সেভাবে হেটে আসে ওর মনে। অসুন্দব ভয় ওর চোখে ছবি হয়ে যায়, অসুন্দর ভয় ওর মুখে ছবি হয়ে যায়।

ওর একটা ক্ষত আছে। কোমরের খানিকটা অংশ জুড়ে ঐ অশুভ ক্ষত। কখনও শুকোয়, কখনও শুকোয় না। ডাক্তার আসে, ডাক্তার দেখে। ওষুধ কেনে, ওষুধ খায়। কমে, আবাব হয। পুনরায ডাক্তার আসে, পুনরায় ডাক্তার দেখে।

ডাক্তার ঃ সেরে যাবে
সে ঃ সাববে না
ডাক্তাব ঃ সুগার আছে
পরীক্ষক ঃ সুগার নেই
ডাক্তাব ঃ ব্লাডে পাওয়া যাবে
পরীক্ষক ঃ ব্লাডে কিছু নেই
ডাক্তার ঃ বায়োপসিতে কিছু পাওয়া যাবে
পরীক্ষক ঃ বায়োপসিতে পাওয়া যায় নি

অবশেষে পবামর্শ আসে, বে দিন। শুকিয়ে যাবে। রে দেয। শুকোয়। কিন্তু দিন যায়, আবার চুলকোয়। আবার ক্ষত ফিরে আসে। ফলত ভয় ফিরে আসে। ফলত ক্রনিক মৃত্যু ভাবনা ফিরে আসে। পুনরায় চলমান ভয় চোখে ছবি হয। পুনরায় চলমান ভয মুখে ছবি হয়। সময় যায়, ওব লজ্জা ভয হয়ে যায। দিন যায়, ওর ঘৃণা ভয হয়ে যায়। বছর যায় ওব অহংকার ভয হয়ে যায। একদিন সে দেখে, ওব প্রেমও ভয় হয়ে গেছে।

একজন সাধু বলে, ভয়কে ভালোবাসো। ভয় সবে যাবে।

সে ভয়ের বই পড়ে ভয় যায় না
সে ভয়ের সিনেমা দেখে ভয় যায় না
সে ভয়েব নাটক দেখে ভয় যায় না
সে সাপ খেলা দেখে ভয় যায় না
সে পুনরায় রীতার সাথে প্রেম করে ভয় যায় না

একদিন রীতা। একদিন সে। একসাথে। সে তখন অন্যমনস্ক। মন থেকে মন সরে যায়। রীতা হাসে। হাসি-তে বলে,'অলোক একবার মনে ফিরে 'এসো।'

কথাটা সে শোনে। সে রীতাকে দেখে। রীতা সে-কে দেখে। ত্রিশ সেকেণ্ড কোন কথা নেই ঘরে। সে জানতে চায়, 'রীতা আগামিকাল যদি আমি মরে যাই। মৃত্যুকে আমার বড়ো ভয়।' রীতা পুনরায় হাসে। সে-র একটা হাত তুলে নেয়। হাতের আঙুলগুলো লম্বা করে। আঙুলে লাল এবং শ্বেত পলার দুটো রূপোর আংটি। রীতা সে-র হাতটা নিজের গালে তুলে নেয়। সে রীতার অতি কাছে যায়। রীতার শরীরের গন্ধ পায়। রীতা সে-কে কাছে টেনে নেয়। সে রীতার ব্লাউজের বোতাম খোলে। এখন আঙুলগুলো কাঁপে, আগে কাঁপতো না। রীতা আপত্তি করে না। রীতা মুখটা সে-র মুখের কাছে এগিয়ে নিয়ে যায়। সে রীতার স্তন থেকে হাত সরিয়ে এনে রীতার ঠোটটাকে নিজের ঠোটের কাছ থেকে হাত দিয়ে সরিয়ে দেয়। তারপর রীতার কাছ থেকে সরে এসে বলে, 'রীতা আমার ভয় করছে। তুমি চলে যাও। আমার শরীরে একটা ক্ষত আছে। তোমার হতে পারে।' সে-র মনে রীতা পুনবায় নেই। সে ভালবাসার খাঁচা খুলে দেয়। রীতা উড়ে যায়। চলে যাবার আগে বলে যায়, 'অলোক, তোমার শরীরে কোন ক্ষত নেই। ক্ষত তোমার মনে।'

ভয়টাকে নিয়ে সে রাস্তায় বেরোয়। ভয়টা ঠিকঠাক আছে কিনা সে খোঁজে। সে জামার ডান পকেটে হাত দেয়। ভয় ডান পকেটে নেই। সে বাঁ পকেটে হাত দেয়। ভয় বাঁ পকেটে নেই। সে বুক পকেটে হাত দেয়। ভয় বুক পকেটে নেই। সে জিন্সের প্যাণ্টের ডান পকেটে হাত দেয়। জিন্সের প্যাণ্টের ডান পকেটে নেই। সে জিন্সের বাঁ পকেটে হাত দেয়। ভয় জিন্সের বাঁ পকেটে নেই। সে বুঝতে পারে না, সে সিনেমা হলের নিচে দাঁড়িয়ে আছে। সে পাগলের মতো জিন্সের প্যাণ্টের হিপ পকেটে, কোমরের কাছে গোপন পকেটে, মানিব্যাগের পার্সের মধ্যে ভয়কে খোঁজে। সে-র মতো আরেক যুবাপুরুষ সিনেমা হলের নিচে দাঁড়িয়ে এই পকেটে, সেই পকেটে, এই ব্যাগে, সেই ব্যাগে সিনেমার টিকিট খোঁজে। দুজনের খোঁজা পাশাপাশি দুটি সরল রেখায় এগিয়ে চলে একই বিন্দুতে মিলবে বলে। একটু একটু করে দু-জনের চুপসে যাওয়া ভয় এবং আনন্দ একটা বিন্দুতে পরিণত হয়ে যায়। সে-র তখন মনে পড়ে যায় জামার ভেতরে একটি গোপন পকেট আছে। সে তখন জামার ভেতরের পকেটে হাত দেয়। ভয় সেখানেও নেই। ভয় সে-র মনের মধ্যে ঢুকে বসে আছে।

অবশেষে সে মনের ডাক্তারের কাছে পেঁছিতে পারে। সে স্লিপ পাঠায়। আধ ঘণ্টা বসে থাকে। সে এ সময় নিজের ক্ষত প্রসঙ্গে নিজের সাথে কথা বলে। প্যাণ্টের বেল্টটা খুলে দেয়। কোমরের ক্ষতটার ওপর হাত বুলোয়। গায়ের

কালোচামড়া এবং সাদা ক্ষতকে আলাদা করা যায়। এমন সময় অ্যাটেন্ড্যান্ট সামনে এসে দাঁড়ায়। সে ভেতরে যায়। পরীক্ষা হয়। তর্ক হয়।

আপনার ক্ষত নেই
আছে
বলছি নেই
আছে
আপনার ক্ষত শুকিয়ে গেছে
যায় নি
বলছি গেছে
না, যায় নি
আপনার ভয় হয় না
হয়
বলছি হয না
হয়
আপনি একা থাকেন
থাকি
আপনি বই পড়েন
পড়ি
আপনি রবীন্দ্রসংগীত শোনেন
শুনি
আপনি একা একা নন্দনে অন্য দেশের ফিল্ম দেখেন
দেখি
আপনি ড্রিংক করেন
করি। ঘরে
আপনি যখন ড্রিংক করেন তখন ভয় থাকে না
থাকে না
আপনি যখন ড্রিংক করেন না তখন ভয থাকে
থাকে
আপনি নারী সঙ্গ করেন
করি
আপনার আত্মীয়স্বজন আছে
আছে
যোগাযোগ রাখেন
না, একেবারেই না

কত বছর রাখেন না

প্রায় দশ বছর

আপনার বাবা-মা আছে

নেই

আপনার ভাইবোন আছে

এক দাদা আছে। বোন নেই

আপনি যান না

যাই না

সম্পর্ক রাখেন না

রাখি না

ভালবাসেন

ভয় ভালবাসতে দেয় না

ফ্ল্যাটে একা থাকেন

থাকি

একা থাকতে ভালবাসেন

ভালবাসি

শুনুন, আপনি একা থাকবেন না। একা চলাফেরা করবেন না। কলেজ লাইফের মতো সবার সাথে মিশুন। সবার সাথে প্রাণখোলা কথা বলুন, আড্ডা মারুন। যখন মিশবেন, গল্প করবেন তখন ভুলে যাবেন আপনি একজন ব্যাংকের ম্যানেজার। তখন ভুলে যাবেন, আপনার একটি নিজস্ব শোভন ফ্ল্যাট আছে। ভুলে থাকবেন, আপনার গড়া একটি নিজের জগৎ আছে এবং সেই জগতের একমাত্র নাগরিক আপনি।

দশ বছর পর, হবে হয়তো, একদিনে সে জেঠুর বাড়ি যায়। বাড়ি ঘিরে নৈঃশব্দ। সে-কে দেখে কেউ অবাক হয় না। জেঠুর ঘরে সে যায় যেন বেড়াল যাচ্ছে। ঘরে ভিড়। ভিড়ের মধ্যে দুজন ডাক্তার। জেঠুর খাটের চারপাশে জেঠুর ছেলেমেয়েরা, তাদের ছেলেমেয়েরা। খাটে শুয়ে থাকা জেঠুকে দেখা যাচ্ছে না, যেমন দেখা যায় না রাস্তায় পড়ে থাকা সদ্য দুর্ঘটনায় রক্তাক্ত নাগরিককে। সে ফিরে যায়। অনেক বিষণ্ন চোখ সে-কে লক্ষ্য করে, কিন্তু কথা বলতে কেউ একজনও এগিয়ে আসে না। সে নিচে নামে। সামনে রাস্তা। ট্যাক্সি আসছে। সে হাত তোলে। জেঠুর ঘর থেকে কান্না শোনা যায়। হঠাৎ ঠাসা নীরবতা ভেঙে যায়। ভয়ংকর শব্দ করে ব্রেক কষে সে-র সামনে ট্যাক্সি দাঁড়ায়। ট্যাক্সির সামনে রাস্তায় শুয়ে থাকা কুকুরটা গা ঝাড়া দিয়ে উঠে শ্লথ গতি নিয়ে সরে যেতে থাকে।

দশ বছর পর, হবে হয়তো, সে একদিন প্রিয় বন্ধু বিভাসের বাড়ি যায়। তিনতলার ফ্ল্যাট। কলিং বেল। ভিতরে টিংলিং টিংলি আওয়াজ। দরজা খোলার শব্দ। এক হাত খোলা কপাটের ভাজ। মাঝে এক সুশ্রী বিধবা মহিলা।

সে-র প্রশ্ন : আপনি !

উত্তর : আমি বিভাসের শাশুড়ি।

প্রশ্ন : বিভাস আছে ?

উত্তর : হাসপাতালে।

প্রশ্ন : কি হয়েছে ?

উত্তর : ক্যান্সার।

সে ক্যান্সারের ভয় নিয়ে ফিরে আসে।

দশ বছর পর, হবে হয়তো, সে যায় মাসিমার বাড়ি। সেই বেলেঘাটার পুরনো বাড়িতে। রাস্তার ধারে কব্জাবিহীন ভাঙা কপাট ঝুলছে। খোলা কপাটের পাশ দিয়ে ঢোকার রাস্তা। লম্বা উঠোন পেরিয়ে মাসিমার দরজা ভেজানো ঘর। সযত্নে সে কড়া নাড়ে। একপাট দরজা খুলে দেখে নেয় মাসিমার মেজো মেয়ে-কুমারী মিনি। সে-কে দেখে বিস্মিত গরিব মাসির মেজো মেয়ে। দরজা প্রশস্ত হয়। সে ভেতরে যায়। সেই একটি মাত্র কাঠের চেয়ার। একটা হাতল নেই। সে পরিচিত চেয়ারটায় বসে। অভ্যস্ত চোখে ঘরের চারদিকে তাকায়। মাসির আরও দুই কুমারী মেয়ে তখনো ঘুমোচ্ছে। পুরুষশাসিত সমাজ ব্যবস্থায় বিয়ের জন্য পাত্ররা পণ্যগণ্য কুমারীদের যে রঙ চায়, ওদের গায়ে সে রঙ নেই। ওরা কালো, হবে ভ্রমর নয়। সে ঘড়ি দেখে। পাঁচটা বাজে নি, পনেরো মিনিট বাকি আছে। দশ বছর আগে, হয়তো হবে, যে রকম চেহারা ছিল ঘরটির এখনও সেরকম চেহারা। শুধু বেরোবার দরজার উপরে মাসিমার একটি এন্-লারজ্ড্ ছবি। এটা আগে ছিল না। ছবির উপর একটি শুকনো মালা। ঘরে তখন মিনি ছিল না। বাথরুমে গেছে। সে ছবিটার দিকে তাকিয়ে আছে। চোখ নেমে আসে নি ছবি থেকে। যখন নেমে আসে, তখন দেখে মিনি সামনে।

সে প্রশ্ন করে : মাসিমা কখন ফিরবে অফিস থেকে

মিনির উত্তর : ছবিটা দেখে তুমি বুঝতে পার নি অলোকদা

সে : সত্যটাকে মেনে নিতে পারছি না রে মিনি। তাই তোর মুখ থেকে

মিনি : গত বছর মা মারা গেছে। তোমার ঠিকানা জানি না। খবর দিতে পারিনি। তুমি বসো। বাবাকে খবর দিচ্ছি।

সে ডাকে : শোন্ মিনি

মিনি ফিরে আসে।

সে : কি রান্না আছে ঘরে। দে।

মিনি ঃ আজ শুক্রবার ! রান্না নেই। সবাই সন্তোষী মা করি। বাবাও। তুমি বসো। আমি যাব আর আসব।

সে-র মেসোমশাই-এর কাছেই একটা দোকান আছে. চায়ের দোকান। ভোরে দোকান খোলে। এগারোটায় বন্ধ করে। মাসির দুটি কুমারী মেয়ে এখনও ঘুমোচ্ছে। সে ওদের দিকে তাকায়। ছেঁড়া শাড়ি ব্লাউজ। সেলাই করে পরেছে। ভেতর জামা নেই। চুলগুলো ঘন কালো নয়. লালচে ভাব আছে। ছোট মেয়েটি দ এর মতো শুয়ে ঘুমোচ্ছে। নাইলনের শাড়িটা হাঁটুর কাছে উঠে এসেছে। সায়াটা দেখা যায়। ছেঁড়া ফাটা ময়লা সায়া। ওদের হাতে বাঁধা বিপত্তারিণীর লাল সুতো। মাসির বড় মেয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। চোখ সরিয়ে আনে সে। দেয়ালে রাখে চোখ। সেই পুরনো দেয়াল ঘড়ি। পেন্ডুলাম দোলে আর শব্দ হয়। ঘড়ির পাশে বাঁধানো কালীর ফটো। তার নিচে আরেকটি বাঁধানো ছবি। ছবিতে আছে মাসিমা. সে-র-মা—দুইবোন। মাসিমার সামনে পাঁচ বছরের মিনি। সে-র-মার সামনে আট বছরের সে। অন্য দেয়ালে একটি পুরনো ক্যালেন্ডারে প্রাকৃতিক দৃশ্য, সূর্য উঠছে। ক্যালেন্ডারের পাশে মাসিমার দেশি রঙে আঁকা বুদ্ধদেবের ধ্যানের ছবি। বুদ্ধদেবের সামনে মৃত সন্তান কোলে এক মা। ছবিটি বাঁধিয়ে এনেছে মেসোমশাই। মাসিমা পট শিল্পীদের ধারায় ছবি আঁকতে পারতেন দেশি রঙ দিয়ে।

একটা আরশোলা সে-র গায়ে উঠে আসে। সে চমকায় না। টোকা মেরে আরশোলাটাকে সরিয়ে দেয়। সে-র মাথার উপর দেয়ালে একটা বড়সরো মোটা টিকটিকি। সে মাথা সরায় না। ডট পেনটা দিয়ে টিকটিকির ল্যাজটা ছুঁয়ে দিতেই টিকটিকিটা সরে যায়। সে উঠে পুরনো বেলজিয়াম গ্লাসের কাছে যায়। চুল আঁচড়ায়। হাত থেকে চিরুনিটা পড়ে যায়। তুলতে গিয়ে দেখে একটা ছোট ব্যাঙ সে-র পায়ের কাছে। সে পা সরায় না। সে চমকায় না। পা দিয়ে সামান্য শব্দ করে। খোলা দরজা দিয়ে ব্যাঙ বেরিয়ে যায়। সে আবার চেয়ারে বসে। সে-র চোখ পুনরায় বুদ্ধের ধ্যানের ছবির দিকে যেন তথাগত এখুনি চোখ খুলবেন। খুলেই বলবেন যাও, সরষের খোঁজ কর।

এমন সময় ফিরে আসে মিনি। হাতে চায়ের গ্লাস, নিমকি বিস্কুট।

'বাবা আসছে। তোমাকে বসতে বললো।' মিনির কথা শুনে সে বলে, 'আমি আজ আর বসবো না। আমি যাবার সময় মেসোমশাইর সাথে দেখা করে যাব।' হাফ কাপ চা খায়।

মিনি ঃ ওদের ডাকি। পুঁতির মালা গাথতে গাথতে ঘুমিয়ে পড়েছে—

সে ঃ না, থাক। ওরা ঘুমোচ্ছে, ঘুমোক। ওরা ক্লান্ত। ঘুমোক। আমি চলি।

সে ঘর থেকে উঠোনে আসে। ঘরের দরজার মুখে মাসির মেজো মেয়ে দাঁড়িয়ে। কথা নেই। একবার সে ফিরে তাকায়। মিনি দাঁড়িয়ে আছে। মিনির চোখেমুখে নিরন্ন সমাজের ভূগোলটা উঠে এসেছে।

সে উঠোন পেরিয়ে যায়। রাস্তায় আসে। আরও একবার ফিরে তাকায় মাসির পুরনো ভাঙাচোরা ফাটা বাড়িটাব দিকে। মিনি আবার রাস্তার ধারে এসে ভাঙা কপাটটা ধবে আগের মতো দাঁড়িযে আছে। রাস্তা দিয়ে একটা মৃতদেহ চারজনের কাঁধে চেপে যাচ্ছে। সে দেখে, মৃতদেহটি মাসির বড়মেয়ের মতো চিৎ হয়ে শুয়ে আছে বাঁশের খাটে যেন ভয এবং মৃত্যু পাশাপাশি শুয়ে আছে।

সে অনেকটা এগিযে গেছিল। ফিবে এসে দূরত্ব কমিয়ে এনে মিনির সামনে দাঁড়ায। আশ্বস্ত গলায় বলে, 'আমি কথা দিচ্ছি মিনি, আমি আবার আসবো।'

□□□ কালীপ্রসঙ্গে কালী পরিকল্পনা □□□

ক্যামেরা পোড়ো মন্দিরের চূড়োয় উঠে আসে। ইট বের করা, ভাঙা চূড়াটিকে ক্যামেরা ধরে। সেখান থেকে ক্যামেরা ধীরে ধীরে নামে নিচের দিকে। মন্দিরের স্ট্রাকচারের কোথাও পলেস্তারা নেই। পলেস্তারা খসে যাওয়া পরিত্যক্ত মন্দির ক্যামেরার মিড্ ক্লোজ আপ-এ ধরা পড়ে। ক্যামেরা এবার মন্দিরের ভেতর ঢোকে। বেদি আছে। ঠাকুর নেই। ঢুকে উপরের দিকে উঠে জানলার কাছে যায়। সেখানে সকালের রোদকে ধরে। জানলায় শিক নেই। পাল্লা নেই। ক্যামেরা সেখান থেকে জানলার বাইরে একটা ডালের কাছে চলে যায়। ডালে বসে একটা দোয়েলকে নিয়ে ক্যামেরা পুনরায় বাইরে আসে ষোল ফুট উঁচু মাচার উপর। সেখান থেকে ডাউন লং শট্। লং শটে দেখা যাবে লোক গিজ গিজ করছে মন্দিরের চাতালে। ক্যামেরার চোখ সেখান থেকে চলে যায় হারাধনের কাছে। হারাধন তন্ত্র সাধকের পোষাকে ঝোপঝাড়ের পাশ দিয়ে মন্দিরের দিকে এগিয়ে আসছে। হারাধন এই ফিল্মের ভিলেন, কালীর উপাসক। হারাধনের দুপাশে সাধুর পোষাকে ছদ্মবেশী শয়তানরা। পিছনে চারজন ঢাকি। ঢাকের আওয়াজ পুজোর পরিবেশকে বাস্তব করে তুলছে। ক্যামেরা প্যান করে। সুটিং জোনের বাইরে গ্রামবাসীদের ভিড়। হাবা পরেশ মাধব সবাইকে সামলাচ্ছে। পরিচালক সোমনাথ রায় ওদের সহযোগিতায় ও ব্যবহারে খুব খুশী।

'Cut' পরিচালকের একটি শব্দে ক্যামেরা থেমে যায়। মন্দিরের প্রবেশমুখে লাইটের প্রয়োজন। পরিচালক সোমনাথের গলার আওয়াজ 'লাইট' লাইটম্যান ভবেনকে ব্যস্ত করে তোলে। সোমনাথ মন্দিরের ভেতরে শূন্য বেদিটার দিকে তাকায়। বেদির চারদিকে কালীপুজোর যাবতীয় উপকরণ। সোমনাথ ডিটেলিং-এর দিকে প্রখর নজর রাখে। উপকরণে ডিটেলিং-এর ত্রুটি হলো কিনা ফাইনাল টাচের আগে বুঝে নেয়। মুখ ঘুরিয়ে পলাশকে খোঁজে। না পেয়ে ডাকে 'পলাশ, পলাশ'। সহ-পরিচালক পলাশ মল্লিক ডাক শুনে আসে। 'ডামি রেডি?' সোমনাথের প্রশ্ন শুনে পলাশ উত্তর দেয় 'না। একটু দেরি হবে। এইমাত্র মেক আপ-এ গেছে।' 'কেন? দেরি কেন?'—সোমনাথ জানতে চায়। হাতে সিগারেট নেয়। পলাশকে একটা দেয়। পলাশ আগুন ধরিয়ে দেয়। তারপর নিজেরটা ধরিয়ে বলে, 'সে অনেক কথা।' সোমনাথ চশমা কপালের উপর তুলে বলে 'সংক্ষেপে বল। সময় নেই। চমৎকার ওয়েদারটাকে নষ্ট করতে চাই না।' সোমনাথ শুরু করে।

ডামি এ গ্রামের এক যুবতী। গ্রামের নাম কালীতলা। যুবতীর নামও কালী। দশ বছরের কালীর সবাই ছিল, বাবা-মা-ভাই-বোন। পঁচিশ বছরের কালীর কেউ নেই। একমাত্র মামা আছে। মামার কাছে থাকে। মামার কাছে কালী বোঝা নয়, মামীর কাছে বোঝা। আবার মামী দাবিয়ে রাখে মামাকে। মামা মুনিশ বটে, তবে অলস। মামার কখনও কাজ জোটে, কখনও জোটে না। কালী গ্রামের নানা বাড়ির কাজ করে এক থালা ভাতের বিনিময়ে। কাজের মধ্যে পঞ্চায়েতের ঘর ঝাড় দেওয়া, জল তোলা কালীর এক নিয়মিত কাজ। কাজ করলে পয়সা। পয়সা দিতে পারলে মামী ভাত দেয়। কালীর প্রিয় জিনিস ভাত। পান্তা ভাত, গরম ভাত দুটোই। একথালা ভাত কালী লংকা, নুন আর একটু তেল পেলে একপলকেই খেয়ে নিতে পারে। একবাব বাজি ধরে দুজনের ভাত কালী একাই খেয়ে নিয়েছিল। এখন মামীর সুপরিকল্পিত অদৃশ্য অত্যাচারে কালীর একবেলা ভাতও পুরোটা জোটে না। অথচ কালী নিজের উপার্জনে খায় ঠিকই তবে মামীর উপরি কিছু থাকে না। তা নিয়ে মামীর সাথে অশান্তির পরিবেশ তৈরী হয়। ভাত না পেলে কালীর মনে মন থাকে না, কালীর যৌবনে যৌবন থাকে না। কালীর শরীরে তখন কালীমূর্তি ফোঁস ফোঁসায়।

আর তখনি কালীর সেই দুঃখের সময়, কষ্টের সময় পাশে এসে দাঁড়ায় হাবা, নন্দকার বোবা ছোট ভাই। নিয়ে যায় নিজের বাড়ি। এক থালা ভাতের সামনে কালীকে বসিয়ে দেয়। লজ্জা নেই, মান নেই, কালী সুন্দর খায়।

এই কালীকেই ডামি করা হয়েছে। গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্বাচিত সদস্য নন্দকাকা পলাশকে নিয়ে গেছিল কালীদের খয়ে যাওয়া ভাঙা মাটির ঘরে। সেই ঘরে মাথা অনেকটা নিচু করে ঢুকতে হয়। খড়ের চালার উপর একটা গিরগিটি। ওটা দেখে পলাশ ঘরে ঢোকে নি। কুঁড়ে ঘরের সামনে পলাশ দাঁড়িয়ে আছে দেখে নন্দকা হাঁক দেয় 'কালী অ কালী।' কালী ভিতরে ছিল। বেরিয়ে আসে। পিছনে মামী। মামীর পিছনে মামা। তিনজন পলাশের সামনে। পলাশ চোখ থেকে ফোল্ডিং সানগ্লাস নামায়। কাঁচ মোছে। রুমাল থেকে দামি সেন্টের গন্ধ তিনজনের নাকে আসে। নন্দকার আনন্দ হয় বলতে, 'কালী তোকে সিনেমা করতে হবে। এই বাবুটি এয়েচেন তোকে নিতে। পাঠ নেই। শুধু কালী সেজে খাঁড়া হাতে নিয়ে দাঁড়াতে হবে। একশ টাকা তোকে দেবে।' বলেই নন্দকা পলাশের দিকে তাকিয়ে বলে, 'টাকাটা দিয়ে দ্যান।' পলাশ চোখে চশমা বসিয়ে সিগারেট ঠোঁটে রেখে পার্স বের করে একশ টাকার একটি নোট কালীর হাতে দেয়। 'দেখি, দেখি'—কালীর হাত থেকে মামা নেয়। মামা জীবনে এই প্রথম একশ টাকার একটা আস্ত নোট দেখে। 'দেখি দেখি' মামার হাত থেকে থাবা মেরে মামী নেয়। গায়ে ব্লাউজ নেই। নইলে ব্লাউজের ভেতর রাখতো। নিয়ে ফুটিফাটা দেয়ালের মাটির ঘরে ঢুকে যায়। ভেতর

থেকে মামীর গলা শোনা যায়, 'চলে যা কালী। এসে খাবি। গরম ভাত আর মাছ দেবো। এখন একটু পান্তা আছে। তেল নুন মেখে লংকা দিয়ে খেয়ে যা।' মামীর কথায় গরম ভাতের ম ম গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে কালীর চোখা নাকের চারপাশে। 'দাঁড়াও নন্দকা, আসছি' বলেই কালী পান্তা খেতে ভেতরে ঢোকে। এর আগে কালী পান্তা চেয়ে পায় নি। মামী বাজা। একজন বলেছে রোজ পান্তা খেলে বাজা মাগিরও ছেলে হয়। তাই মামী নিজের জন্য রোজ পান্তা তুলে রাখে। আজ সেই পান্তাভাত খাবে কালী। কালীর আনন্দ হয়। পান্তাভাত খাওয়ার আনন্দ। সিনেমা নামার আনন্দ নয়। পান্তা খেয়ে কালী ফিরে আসে। কালীকে মাঝে রেখে পলাশ ও নন্দকা হাটছে। এবার কালী বলে, 'আমায় কি করতে হবে।'

'কালীমূর্তি' ধারণ করে বেদির উপর দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। তুমি তো এমনিতেই—' সামনে হাটছে আর বলছে পলাশ, 'কালো। সেজন্য তোমার কালো শরীরে কালো রঙ মাখাতে হবে না। তবে—' একটু থামে পলাশ। কয়েক পা হাটে। হলদে ফড়িং পলাশের নাকের পাশ দিয়ে উড়ে যায়। তারপর গলার আওয়াজ নামিয়ে বলে, 'ব্লাউজটা খুলতে হবে তো। ওসব জায়গায় একটু কাল রঙ মাখতে হবে। তুমি নিজের হাতে মাখবে। কেউ যাবে না। কি বলেন নন্দকা?' নন্দকা সায় মানে। কালী হাটে। হাটতে গিয়ে খানি জমিতে পড়ে যায়। পলাশ তুলতে যায়। কালী নিজেই উঠে আসে। 'আরও একটু কথা আছে কালী। শাড়ি সায়া পরা থাকলে ওসব জায়গায় শরীরের তুলনায় একটু ফরসা লাগে। তাই না নন্দকা?' গাম্ভীর্য বজায় রেখে নন্দকা সায় মানে। 'সেজন্য ওসব জায়গাতেও কালো রঙ মেখে তোমাকে দাঁড়াতে হবে।' বলতে বলতে সরু মেঠো পথে পলাশ হাটে। পেছনে কালী। কালীর পেছনে নন্দকা। নন্দকার গলা শোনা যায়, 'কালীর সায়া নেই। ওর একটাই ময়লা শাড়ি। আরেকটা আছে। তোলা থাকে। কোথাও গেলে মামীর সায়া পড়ে যায়।' নন্দকার গলা শুনে হঠাৎ কালী দাঁড়িয়ে পড়ে। সামনে পলাশ দাঁড়িয়ে আছে, পেছনে নন্দকা। দুপাশে ধানখেত। সরু মাটির রাস্তার পাশে একটা শুকনো খাটো খেজুর গাছ। গাছে একটা দাঁড় কাক। কাকের পেছনে কাকতাড়ুয়া। তারপর কালীর কথা, 'সরো নন্দকা। আমি যাই। আমি ও কাজ পারবো না। গায়ে কাপড় থাকবে না। নন্দকা তুমি আমার সাথে চলো। মামীকে বলবে টাকা ফেরৎ দিতে।' নন্দকা কালীকে দাঁড় করায়। তারপর বোঝায়, 'আরে বোকা, কালীর গায়ে কি কাপড় থাকে? তুই তো তখন দেবী কালী, মানুষ কালী থাকবি না। তুই তখন দেবতা হয়ে যাবি। দেবতা রে দেবতা।' কালী চলে যাচ্ছে। পেছন পেছন নন্দকা ওসব কথা বলতে বলতে যাচ্ছে। তারপর কালীর সামনে গিয়ে দুহাত ট্র্যাফিক পুলিশের মতো ছড়িয়ে কালীর পথ

আটকায়, বলে, 'কালী আমি ওদের কথা দিয়েছি তোর কষ্টের কথা ভেবে। মামী তোকে খেতে দেয় না। কষ্ট দেয়। অত্যাচার করে।' পলাশ সিগারেট ফেলে দিয়ে ছুটে যায়। গিয়েই বলে, 'না, থাকবে। এক টুকরো কাপড় নাই-এর নিচে থাকবে। তার ওপর কাটা হাত সাজানো থাকবে। আরও একশ দেবো।' নন্দকা সাথেসাথে লোভটা কালীর সামনে তুলে ধরে বলে, শুনলি কালী। মামী এই টাকার কথা জানতেও পারবে না। একশ টাকা পেয়ে একটা শাড়ি, দুটো সায়া কিনবি। তোর ছেঁড়া ব্লাউজ আর বত সেলাবি বে। ঐ টাকায় একটা ব্লাউজও হয়ে যাবে। হাবার সাথে হাটে যাবি। সায়া কিনবি, শাড়ি কিনবি। হাবা তোকে কাঁচের চুড়ি কিনে দেবে। নাগর দোলায় চড়বি। টাকা তোর কাছেই থাকবে।' কালী তাকায় নন্দকার দিকে। তারপর বলে, 'তুমি সব কথায় হাবাকে টানো কেন? হাবাকে আমি বে করবো না। কথা বলতে পারে না। ঠিক আছে। চলো যাচ্ছি।' এই নন্দকা কালীতলা গ্রামের লোকের উপকার করে। আগে চাষবাস করতো। এখন নন্দকা শুধু রাজনীতি করে। ভোটে দাঁড়ায়, ভোটে জেতে। অবশেষে এই নন্দকাকার কাছে কালী হার মানে।

পরিচালক সোমনাথকে সব কথাই পলাশ খুলে বলে। পাশে নন্দকাকা। নন্দকাকে দেখিয়ে পলাশ বলে, 'এ গ্রামের নন্দকাকা। সবাই বলেই নন্দকা। গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য। সবার চেয়ে বেশি ভোটে জেতে। এই গ্রামে সুটিং এর ব্যাপারে নন্দকাই সব ব্যবস্থা করেছেন।' কালীকে রাজি করাবার জন্যেও নন্দকার ভূমিকার কথা বলে। বড় করে বলে পলাশ, খাটো করে নয়। পলাশের ঠাকুর্দা এই কালীতলা গ্রামেরই লোক ছিল এক সময়। সোমনাথ নন্দকার দিকে তাকায় সম্মানের চোখে। 'বিড়ি খান—' নন্দকা বিড়ি দেয় সোমনাথকে। সোমনাথ ফিরিয়ে দেয় না। কালো মোটা ফ্রেমের চশমা কপালের উপর থেকে নামিয়ে নাকে রাখে। উঠে দাঁড়ায়। জিনসের পকেট থেকে দেশলাই বের করে। কাঠি ধরায়। নন্দকার মুখের কাছে নিয়ে যায়। নন্দকা মাথা নিচু করে। তারপর সোমনাথ নিজেরটা ধরায়।

সোমনাথ ব্যস্ত হয়। একটু রেস্টের পর ব্যস্ততাটা যেন দ্বিগুণ হয়ে পড়ে। সোমনাথের হাক ডাক একটা গতি এনে দেয়। পলাশ কালীকে ডাকতে যায়। এবার শেষ দৃশ্য। সোমনাথের গলা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

লাইট/রেডি। সাউন্ড/রেডি। ক্যামেরা/রেডি। ট্রাকিং/রেডি। ক্রশ সাউন্ড/রেডি। সাসপেন্স মিউজিক/রেডি। অর্কেস্ট্রা/রেডি। সাউন্ড রেকর্ড মেশিন/রেডি। অফ ভয়েস/রেডি।

এভাবেই সোমনাথ খুবই দ্রুততার সাথে সব কিছু পরীক্ষা করে নেয়। মিলিয়ে নেয়। মাপজোখ করে। সবাইকে ঠিক ঠিক নির্দেশ দেয়। কালীকে

কিছু নির্দেশ দিয়ে আসে। হারাধনকে চিনিয়ে দেয়। স্যুটিং জোনের বাইরে কালীতলার গ্রামবাসীদের ভিড়। ভিড় সামলায় হাবা পরেশ মাধব। প্রযোজক মাখন বর্মন ওদের আন্তরিক ব্যবহারে খুব খুশি।

ক্যামেরা কালীমূর্তির সামনে এগিয়ে আসে। মূর্তি বড় হতে থাকে। ক্যামেরা কালীমূর্তির মুখটাকে ধরে। মাথায় রাংতার মুকুট। মুকুট সাজানো হয়েছে সোনালি, রুপালি, সবুজ নীল, লাল রাংতা দিয়ে। জোরালো আলো মুকুটের উজ্জ্বলতাকে বাড়িয়ে দিয়েছে। তারপর চোখের কাছে সরে যায়। দুটো চোখে কঠোর ক্রোধ। রাগ ফাটছে। অফ ভয়েস। হারাধনের গলায় মন্ত্রের আওয়াজ। কালীর ধ্যানং করালং বদনাং ঘোরাং' ছড়িয়ে পড়ছে। ক্যামেরার চোখে উঠে আসে লম্বা রক্ত জিভ। নকল সাদা দাঁত আলোয় চিক্ চিক্ করছে। ক্যামেরা নেমে আসে। গলায় নরমুণ্ডের মালাকে ধরে। মালা কালীর শরীরের একমাত্র গৌরব ভারি স্তনকে পুরোটা ঢেকে রাখতে পারে না। ফাঁকের ভিতর দিয়ে ক্যামেরার চোখ চলে যায়।

ক্যামেরাম্যানকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে গলা থেকে বুক পর্যন্ত দশ সেকেণ্ড ক্লোজ-আপ-এর ভেতর ধরে রাখতে। ক্যামেরাম্যান সৌমেন সিনেমা-জগতে বিখ্যাত ক্যামেরাম্যান। সে ঠিক নরমুণ্ডের মালার ভিতর দিয়ে ফাঁক খুঁজে নিয়েছে। আর তখনই এক্সট্রা লেন্স গুঁজে দিয়েছে। এবার ক্যামেরা নেমে আসে নাভির কাছে। নাভির নিচে নকল কাটা হাতের সপ্তকী। সেখানেও দশ সেকেণ্ড থাকার নির্দেশ আছে। সৌমেন নির্দেশ পালন করেছে। সোমনাথ পাওনা টাকা প্রায় সবই সৌমেনকে মিটিয়ে দিয়েছে। ক্যামেরা চলে আসে কালী-মূর্তির পায়ের কাছে। জোড়া আলতা-পরা পা! সৌমেনের আলতা-পরা পা ভাল লাগে। সেখানে সে নিজের মতো ক্যামেরা ঘোরায়। পাশে মাটির মহাদেব। ক্যামেরা সেখান থেকে ফিরিয়ে আনার সময় একবার মহাদেবকে গ্রাস করে।

ক্যামেরা এবার কালীর কাছ থেকে সরে এসে তিনজন ঢাকি এবং কাসর ঘণ্টা হাতে দুটি বালককে তুলে নেয়। ঢাকি এবং দুজন বালককে এখানে কাজে লাগিয়ে দিয়েছে নন্দকাকাই। ঢাক বাজে, কাসর ঘণ্টা বাজে, গতি-উদ্দাম। মাঝে মাঝে তিনজন ঢাকি নাচে, বালক নাচে। ক্যামেরা ওদের নাচ তুলে নেয়। সেখান থেকে ক্যামেরা এগোয় উপাসকের কাছে। হাত জোড় করে, চোখ বুজে কালীর ধ্যানের মন্ত্র পাঠ করছে 'করাল বদনাং ঘোরাং মুক্তকেশী চতুর্ভুজম কালিকাং দক্ষিনাং দিব্যাং মুণ্ডমালা বিভূষিতাম্।'

এই উপাসকের নাম হারাধন চৌধুরী। কোন এক গ্রামের প্রচুর জমির মালিক। নামে বেনামে তার প্রচুর জমি। তিনি অত্যাচারী এবং ধর্ষণকারী। তবে কালীর নিষ্ঠাবান উপাসক। শহরে থাকেন। বছরে একবার গ্রামে

আসেন। এখনও ইনি অনেকের কাছে মালিক। অনেকের কাছে এখনও জমিদার। এই ফিল্মের নায়কের পিতা। জমি ছাড়াও শহরে নানারকম ব্যবসা আছে। গোপন ব্যবসা গাঁজা আফিং ড্রাগ। এটি শেষ দৃশ্য।

মন্দিরের ভিতরে মন্ত্রপাঠ। ফিল্মের কিছু এক্সট্রা গ্রামবাসী সেজেছে। মন্দিরের বাইরে তাদের চিৎকার 'আমাদের পাওনা টাকা ফিরিয়ে দাও। আমাদের দলিল ফিরিয়ে দাও।' তাদের উপর ছদ্মবেশী সাধুর দল অত্যাচার করছে। তারা অত্যাচারিত হচ্ছে। মার খাচ্ছে। পড়ে যাচ্ছে। আবার উঠছে। চেঁচাচ্ছে 'আমাদের পাওনা টাকা ফিরিয়ে দাও। আমাদের দলিল ফিরিয়ে দাও।'

ক্যামেরা ডামির হাতে ধরা নকল খড়্গটার কাছে আসে। জোরালো লাইট খড়্গের ওপর। টিনের খড়্গ অরিজিন্যালিটিকে ধরে রেখেছে। আলোয় আলো ঠিকরে বের হচ্ছে, চক্ চক্ ধারালো অস্ত্রের মতো। সাউণ্ড ট্র্যাক-এ টেপ রেকর্ডে মন্ত্র পাঠ উঠে আসে। হারাধনের মন্ত্রপাঠের সময় একবার ইণ্টার-কাট হবে। দেখানো হবে গ্রামের অত্যাচারিত প্রজাদের অসহায় মুখের ক্লোজ-আপ। কাটা ছেঁড়া, ভাঙাচোরা মুখ। মাথায়, চোখে, হাতে ব্যাণ্ডেজ। এই দৃশ্য আগেই তোলা আছে। সেখান থেকে ক্যামেরা আবার চলে আসবে হারাধনের কাছে। হারাধনের গলায় রক্ত জবার মালা নিয়ে ক্যামেরা চলে আসে কালীমূর্তির হাতে ধরা বিশাল এক নরমুণ্ডের কাছে। নরমুণ্ডের গলা থেকে টপ্ টপ্ আলতার ফোঁটা। আলতার ফোঁটার ক্লোজ-আপ। সেখান থেকে ক্যামেরা উঠে আসে কালীমূর্তির মুখের কাছে কালীতলার কালীর নাকে একটা বড় লাল নাক ছবি। সেটা ক্যামেরা ধরে নেয়। তারপর পর্দা জুড়ে লম্বা লাল জিভ। বিগ্ ক্লোজ-আপ। অফ্ ভয়েস। কালিকাং দক্ষিণাং দিব্যাং। আমাদের পাওনা মিটিয়ে দাও। মুণ্ডমালা বিভূষিতাম্। আমাদের দলিল ফিরিয়ে দাও। মহামেঘপ্রভাং শ্যামাং। মা, মাগো হারাধনকে শাস্তি দাও। তথা চৈব দিগম্বরীম্। ঢাক ঢোলের শব্দ। কাসর ঘণ্টার শব্দ। চিৎকার। আর্তনাদ। মন্ত্রপাঠ। ক্যামেরা চলে আসে হারাধনের পিঠের উপর। হারাধন উবুড় হয়ে প্রণাম করছে। মাথা কালীমূর্তির পায়ের কাছে। ক্যামেরা মিড্-সট-এ চলে যায়। কালী হাত তুলে খাঁড়া ধরে হারাধনের গলায় বসিয়ে দেয়। হারাধনের গলা বেশ খানিকটা কেটে যায়। দৃশ্যটি ডিজলভড্ হয়। কালীর মুখের পরিবর্তে নায়িকার মুখ হারাধনের চোখের সামনে এসে যায়। অত্যাচারের প্রতিশোধ নিতে এসেছে নায়িকা, বুঝতে পারে হারাধন। ক্যামেরা হারাধনের হাতের কাছে যায়। হারাধন ফুলমালার তলায় রিভলবারটা চেপে ধরে। হারাধন হাত তুলতে যাবে, এমন সময় পুলিশের গুলি এসে হারাধনের হাতে লাগে। হারাধন পড়ে যায়। সেখান থেকে ক্যামেরা লং সটে

চলে আসে। পুলিশ মন্দির ঘিরে ফেলেছে। ছদ্মবেশী শয়তান সাধুরা এ্যারেস্টেড্। পুলিশের বড়সাহেব হাত কড়া ঝুলিয়ে হারাধনের সামনে এসে দাঁড়ায়। এভাবে শেষ দৃশ্য শেষ হয়। তখন দুপুর।

সুটিং জোনের বাইরে কালীতলার গ্রামবাসীদের ভীড় পাতলা হয়ে আসে। কয়েকজন গ্রাম্য তরুণ নায়িকার গায়ে গা লাগাবার ধান্দা করলে হাবা পরেশ মাধব তাদের ধাক্‌কা মেরে সরিয়ে দেয়।

কালী জানে ফালাশাড়ি সেলাই করে কি ভাবে পরে লোকের সামনে আসতে হয়। সেলাই করা ফালাশাড়ি পরেই কালী পলাশের কাছে আসে। পলাশ এখন গোছগাছে ব্যস্ত। কালীর একশ টাকা এখনও বাকি। কালী টাকা চায়। পলাশ পরিচালকের কাছে যেতে বলে। কালী সোমনাথের কাছে যায়। সোমনাথ চেয়ারে গা এলিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছে, হাতে সিগারেট। কালী টাকা চায়। সোমনাথ প্রোডিউসার মাখনবাবুর কাছে যেতে বলে। কালী মাখনবাবুর কাছে যায়। মাখনবাবু দু'টা বাদে কালীকে আসতে বলেন।

কালীর খিদে পায়। কালী চলে যায়। দু ঘণ্টা পর আসবে। প্যাক আপ শুরু হয়। ভ্যান-এ মালপত্র উঠছে। কালী যায়। পলাশ দেখে। একবার ডাকে। ডাকটা অনারকম। টাকা পাইয়ে দেবার মতো ডাক নয়। 'কালী' শব্দটা কালীর কানে যায় না। কালীতলার হাওয়া টেনে নেয়। এবার পলাশ গলাকে আরও উচুতে তোলে। দুবার ডাকে 'কালী, এই কালী।' কালী আসে, ছুটেই আসে। বড় আশা নিয়ে ছুটে আসে। কালীর ঘন কালো চুলে হাওয়া লাগে। কানের দুপাশে চুল উড়ছে। 'মালটা তুলেছে খাসা' কারোর একজন হীন মন্তব্যে পলাশ রেগে 'বানচোৎ' বলতে বাধ্য হয়। তারপরেই সিরিয়াস পরিবেশ তৈরী করে কালীকে দশ টাকা দেখিয়ে পলাশ বলে 'যাবি? চ না স্কুল ঘরে।' পলাশ হাসে। যুবতী কালীর কাছে পুরুষ মানুষের এমত হাসির ভাষা অপরিচিত নয়। 'না' বলেই কালী চলে যায়। একটু থেমে স্মরণ করায় 'মাখনবাবু দুঘণ্টা বাদে পাওনা টাকাটা নিয়ে যেতে বলেছেন।' শুনে পলাশ হাসে। ঠোটের কোনে মিহিদানার মতো হাসি। এই হাসি কালী বোঝে না।

কালীর পেটে এখন খিদে। প্রচণ্ড রোদ। রোদের ভিতর দিয়ে কালীর অভ্যস্ত চলা। রোদের জ্বালা এবং খিদের জ্বালা। রোদের জ্বালা হার মানে। কালীর শরীর জ্বলে। কালী হাটে, কিভাবে হাটছে, কতটা দ্রুত হাটছে, বুঝতে পারে না। যেন খিদের চিতায় শুয়ে আছে কালী। খিদের আগুন ভাসিয়ে নিয়ে যায় কালীকে। সিনেমার কেষ্টবিষ্টুরা ওকে খেতে পর্যন্ত দেয়নি। নিজেরা খেয়েছে। সিঙাড়া-কচুরী। দফায় দফায় চা। একবার আড়ালে ডেকে, কাছে ঘেসে কালীর বুকের কাছে শালপাতার ঠোঙা ঠেকিয়ে মেক-আপ-

ম্যান বলেছিল 'খাও।' কালী খায় নি। বুকের কাছে ঠেকানো হাতটা সরিয়ে দিয়েছিল মাত্র। যতটা পথ ততটা খিদের ভাবনা। আর একটু এগোলেই কালীর মেটে ঘর। এক সময় মেটে বাড়ির কাছে উপস্থিত হয় কালী। নালাটা ডিঙোলেই পুরনো বিশাল আমগাছ। বাজা আমগাছ যেমন মামা, যেমন মামী। কালী যেন গরম ভাতের গন্ধ পায়। স্বপ্নের ঘ্রাণ নিয়ে কালী মাথা নিচু করে 'মামী ভাত' বলে ঢোকে আধা আধাঁরিয়া মাটির ঘরে, কিন্তু মামী নেই। কেউ শোনে না কালীর গলা। দুপুরে মামা দাওয়ায় শুয়ে থাকে। সেখানে মামা নেই। মামার দিবাতন ঘুম নেই।

ভেতরেও মামা নেই। ভেতর ফাঁকা। সামান্য থালাবাসন, শাড়িসায়া লুঙি গামছা কিছুই নেই। আলনার পরিবর্তে ফাঁকা দড়িটা ঝুলছে। টিনের স্যুটকেস নেই। ছেঁড়া মাদুরটাও নেই। পুরনো চৌকিটা পড়ে আছে। চৌকির ওপর একটা ময়লা তালিমারা কাথা পাতা থাকতো, নেই। চৌকির ওপর কালোসাদা বেড়ালটা ঝিমোচ্ছে। খানিকটা বিস্মিত সময়, কালী খিদের কথা ভুলে গেছে। গ্রামের সবাই সুটিং দেখতে ব্যস্ত। এ রকম একটা চমৎকার সুযোগ মামা মামী সুন্দরভাবে ব্যবহার করতে পারে কালী ভাবেনি। তবে ভাবা উচিত ছিল। কারণ কালী জানে একবার মামী বাপের বাড়ি গয়ে একমাস আসে নি। সে সময় আইবুড়ো কালীর বোঝা নিয়ে মামা-মামীব তর্ক, মারামারি। পঞ্চায়েতের লোক আসে। নন্দকা আসে। হাবা আসে। কালীকে ছোটখাটো কাজ পাইয়ে দেয়।

কালী ঘর থেকে বের হয়। বেরিয়েই দেখে সামনে নন্দকা। নন্দকাকে সামনে দেখেই কালী কাঁদে। নন্দকা কালীর ভেজা কথাগুলো শোনে, 'আমার সর্বস্ব নিয়ে আমায় ফেলে মামা-মামী চলে গেছে নন্দকা। আমি মামার কাছে টাকা জমাতাম, সে টাকাও নিয়ে গেছে।' ব্যাপারটা বুঝতে নন্দকার সময় লাগে না। সুটিং দেখতে গ্রামের প্রায় সবাই গেছে। তারই সুযোগ নিয়েছে কালীর মামা-মামী। মামার কাজ নেই। মামার শ্বশুর বাড়ির অবস্থা ভাল। যাব যাব করছিল! নন্দকা জানে। কালীর কথা ভেবে যেতে পারছিল না। হাতে নগদ একশ টাকা পেয়ে চলে গেল। আবার কালীর ভিজে কথাগুলো নন্দকার মনে ব্যথা জাগায়, 'আমার যে নন্দকা খিদে পেয়েছে। আমি এখন খাব কি? গরম ভাত মাছের লোভ দেখিয়ে মামী বাপের বাড়ি পালিয়েছে।' নন্দকা কালীকে কাছে টেনে বাপের আদরে বলে, 'চ আমার বাড়ি খেয়ে নিবি।' বাপের আদরে কথাটার তাৎপর্য এই, নন্দকা ও কালীর বাবা একসাথে রাজনীতি করা শুরু করেছিল। কালীর বাবা মৃত্যুর আগে বলেছিল, নন্দকা যেন কালীকে চোখে চোখে রাখে। যার জন্য নন্দকার এখানে আসা। আসল কথাটা বলে নন্দকা, 'তোর পাওনা একশ টাকা ওরা দিয়েছে?' কালী ময়লা শাড়ির আঁচলটা

দিয়ে চোখ মুছে উত্তর দেয় 'না। দুঘণ্টা বাদে যেতে বলেছে।' খিদেতে কথাগুলো তিন দিনের বাসি হয়ে যায়।

নন্দকা উত্তর শুনে অবাক। বলে, 'সে কি রে! ওরা যে চলে যাচ্ছে। ভ্যানে মাল উঠছে দেখলাম। তুই আমার বাড়িতে খেয়ে হাবাকে নিয়ে আয়। আমি ওদের আটকাচ্ছি। কালীতলার লোকদের ঠকানো।' নন্দকা এতদ্রুত হাটে যে মুহূর্তে কালীর চোখের আড়াল হয়ে যায়। নন্দকা প্রথমে পা চালায়, পরে আরও জোরে, শেষে দৌড়ে। পথে গ্রামের যুবকদের সাথে দেখা হতেই কালীর ঘটনা বলে, সংক্ষেপে এবং দু-এক কথায়। নন্দকার সাথে যুবকরা ছুটছে। ওদের পিছু কমবয়েসী ছেলেমেয়েরা। সন্তান কোলে কিছু বৌ, খালি গা এবং হেটো ধুতি পরা কিছু বয়স্ক। কালী নন্দকার বাড়ির দিকে রওনা হয়। এই প্রথম সে হাবার কথা মন দিয়ে ভাবে। হাবা জুনিয়র স্কুলের পিওন। কালীর বন্ধুরা হাবার ভালবাসার প্রসঙ্গ তুলে হাসাহাসি করলে কালীও হাসতো, বলতো ওদের, 'কাকে শোনাব রে রসের কথা। ও কি উত্তর দিতে পারে?' কালী অন্যমনস্ক। হাটে। কালীর পাশ দিয়ে লোক চলে যায় মন্দিরের দিকে। টাকা না পাওয়ার কথা জিজ্ঞেস করে। ওদের চোখে বিস্ময়। ঠোঁটে প্রশ্ন।

সামনে আবার পোড়ো মন্দির। ভেতরটা ফাঁকা। রাস্তায় দুটো প্রাইভেট কার। কালোটি ডাবলিউ. বি. এস ২৭০৯১, সাদাটি ডাবলিউ. বি. এস ৭১৯৮২। পেছনে দুটো ভ্যান। নায়িকা এবং নায়িকার সচিব এখনও পৌছয় নি। ওরা প্রাইভেট কার-এ উঠলেই গাড়ি ছাড়বে। এই সময়টুকুর জন্য নন্দকা এসে পৌছতে পেরেছে। নন্দকা প্রথমে এসেই ডাবলিউ বি. এস ৭১৯৮২-র সামনে দাঁড়িয়েছে। গ্রামের যুবকরা তার দুপাশে ভিড় করে আছে। দ্বিতীয় কারেই ছিল পলাশ। নন্দকা ভারি গলায় বলে, 'পলাশবাবু কালীকে আরও একশটাকা দেবার কথা ছিল। টাকাটা দিয়ে দ্যান।' পলাশ সোমনাথের দিকে তাকায়। সোমনাথ সামনের গাড়িতে মাখনবাবুকে দেখিয়ে দেন। নন্দকা মাখনবাবুর কাছে যান। মাখনবাবু গ্রামবাসীদের ভিড় দেখে বিপদটা বুঝে নেন। থানায় খবর দেওয়া ছিল। কিন্তু আজ বারোটায় পুলিশদের রিলিজ ডে ছিল। পুলিশ চলে গেছে। নায়িকা ও নায়িকার সচিবের উপর মাখনবাবুর রাগ শরীরের ভেতর ফেটে চুরমার হয়। ওরা পৌছে গেলে, এতোক্ষণ চলে যেতো। নায়িকার আলসেমি, ঢিলেমি, সাজসজ্জা মাখনবাবুর কাছে অসম্ভব বিরক্তিকর।

'একশ টাকাই তো কথা হয়েছিল'—মাখনবাবুর কথায় বিরক্তি, সাথে অবহেলা।

'না, পলাশবাবু আরও একশ টাকা দেবেন আমার সামনে কথা হয়েছিল।'

বলেই নন্দকা চুপ করেন। আরও একশ টাকার কথা পলাশ মাখনবাবুকে

বলেছেন। দেশলাই-এর উপর ঠকাস ঠকাস শব্দ। জ্বলে ওঠা সিগারেটে আগুন। এভাবেই ভয়কে দূরে সরিয়ে রাখা। পরেশ গাড়ির দরজার কাছে মুখ এনে বলে, 'আপনি বলেছেন দুঘণ্টা বাদে আসতে। আর এখন একঘণ্টা না হতেই পালাচ্ছেন। টাকাটা দিয়ে তবে যান।'

'কোন রকম ঝামেলা করবেন না। কথা দিয়েছেন, কথা রাখুন'—মাধব নামক যুবকের প্রতিবাদী গলা। মাখনবাবু মাধবের হাতের দিকে তাকান। হাতে কিছু নেই। কথা বাড়তে থাকে। মাখনবাবু বাড়তে দিতে চান না।

নায়িকা এবং নায়িকার সচিব আসছে। নায়িকার পরনে জিনসের টাইট প্যাণ্ট। চাপাফুলের রঙের মতো পাতলা ব্যাগিসার্ট। চুল খোলা। চোখে সান-গ্লাস। ভিড়ের কাছে এসে দাঁড়ায়। ভাবে, নায়িকাকে দেখার জন্য ভিড়। কিন্তু ভুলটি বুঝতে পারে, তর্কের বিষয় বুঝতে পারে। গাড়ির দরজা খুলে নায়িকা মাখনবাবুর পাশে বসে। সচিব ড্রাইভারের পাশে। মাখনবাবু বলেন, 'স্টার্ট কর।' তারপর ভিড়ের ভিতর কালীকে খোঁজেন। কালীকে দেখতে পান না। ড্রাইভার গাড়ির চাবি ঘোরাবার আগেই পরেশ চাবি তুলে নেয়। মাখনবাবু বলেন, 'চাবিটা দিয়ে দিন।'

'কালীর পাওনা টাকা পেলেই কোনো ঝামেলা হবে না।' মাধবের বলায় উত্তেজনা নেই, 'নিরাপদে চলে যেতে পারবেন।'

'আপনাকে দেবো কেন মশাই। কালীকে দেবো। কালী নেই। চাবি দিয়ে দিন। ঝামেলা করবেন না।' মাখনবাবু তড়পাবার চেষ্টা করে। ভয় না পাবার অভিনয় করেন।

এমন সময় কালী এসে যায়। মাখনবাবুর সামনে দাঁড়ায়। কালীর পাশে হাবা, ছ-ফুট লম্বা, লোহার শরীর। হাতে লাঠি। একজন বয়স্ক লোক ঠেলে এসে নন্দকার পাশে দাঁড়ান। লম্বা সাদা দাড়ি। সাদা চুল। এসে বলেন—'পঞ্চাশ টাকা দিয়ে মশাই ঝামেলাটা চুকিয়ে ফেলুনতো।'

নন্দকা সম্মান বজায় রেখে একটু ধমকের সুরে বলেন, 'খুড়ো, তুমি আবার এখানে এলে কেন? যাও, যাও, এখান থেকে এখন যাও তো। চিরকাল গ্রামের মানুষেরা ঠকে এসেছে। সব দিন এক থাকে না। দিন পাল্টায়।' খুড়ো যেমন এসেছে, তেমন চলে যায়, কারণ নন্দ কথাটা মিথ্যে বলেনি।

মাধব কাছে আসে, বলে—'আপনি মশাই মনে হচ্ছে ঝামেলা চাইছেন। টাকাটা দিন।' এবার হাবা এগিয়ে আসে। মাখনবাবুর গাড়ির দরজা একটানে খুলে ফেলে। দরজার স্প্রীং কেটে যায়। ডান হাতটা মাখনবাবুর দিকে বাড়িয়ে দেয়। মাখনবাবু নায়িকার শরীরে হেলে পড়ে। কালী হাবাকে সরিয়ে নেয়।

নায়িকা স্বাতী সেন ঐক্যবদ্ধ গ্রামবাসীদের দেখে বলে, 'দিয়ে দিন।'

মাখনবাবু কাত্ হয়ে পার্স বের করেন। একশ টাকার একটা নোট তুলে নেন্। কালীকে ডাকেন। হাতে দেন। সাথে সাথে গাড়ির সামনে ভিড় করা কালীতলার গেঁয়ো লোকগুলো কচুরি পানার মতো দুপাশে সরে যায়। গাড়ি এগোয়। নায়িকা ব্যাগ থেকে একটা দশ টাকার নোট বের করে কালীকে দিতে গিয়ে বলে, 'তোমার বখশিস্'। বলেই দশ টাকার নতুন নোটটা দলা পাকিয়ে রাস্তায় ফেলে দেয়। কালী সেটা তুলে নেয়। গাড়ি ধীরে চলতে শুরু করেছে। স্প্রীং-কাটা দরজাটা নাইলনের সুতো দিয়ে বাঁধা হয়েছে। কালী ছুটতে ছুটতে দলা পাকানো নতুন দশ টাকার নোটটা নায়িকার দিকে ছুঁড়ে মারে। আর তখুনি ক্রমাগত হাততালির ঐকতান শোনা যায়।

সবাই চলে গেলে একমাত্র একা দাঁড়িয়ে থাকে কালী। পুরনো মন্দিরটার দিকে মুখ। কালী পুরনো মন্দিরের দিকে এগিয়ে যায়। মন্দিরের ভিতর গিয়ে দাঁড়ায়। কয়েকটা শালিখ, কয়েকটা চড়ুই ওড়ে ফেরে। ভিতরে ভ্যাপসা ঘরে একটি কালো ভ্রমর গুনগুনায়। পায়রার গলা শোনা যায়। শূন্য বেদিটার দিকে কালী তাকায়। আস্তে আস্তে সেই শূন্য বেদিতে একটি ফ্রক পরা কালীমূর্তি উঠে আসে। রোগা কালীমূর্তি। দিনের পর দিন পরিপূর্ণ খেতে না পেলে, যেরকম মূর্তি হয় সে রকম রোগা কালীমূর্তি। অথচ বুকের মাংস পরিপুষ্ট স্তনের আকার নিয়েছে। মুখে লম্বা টিনের টকটকে লাল জিভ। মাথায় রাংতা এবং পিচবোর্ড দিয়ে তৈরী মুকুট। এ রকম বেশে কালী সেজে বাবার সাথে কালী বের হতো চৈতমাসে। বাবা সাজত মহাদেব। কালীর হাতে থাকতো মাটির সরা। সরায় থাকতো পয়সা আর জবাফুল।

শূন্য বেদির সামনে চোখ বুজে বসে থাকে কালী। সে এখন কার কাছে থাকবে? কালী আগামি দিনের থাকার কথা, খিদের কথা ভাবে। কালী খেতে ভালবাসে। জামা না, শাড়ি না, চুড়ি না। খিদের কথা এখন কালী কাকে বলবে? বালিকা বয়সে মাকে বলতো, মা মারা গেল। কিশোরী বয়সে বাবাকে বলতো, বাবা মারা গেল। যুবতী বয়সে মামা-মামীকে বলতো, মামা-মামী চলে গেল। কালী এখন একা। কালীর এখন কেউ নেই, শুধু যৌবন আছে।

পেছনে পায়ের শব্দ। কালী চোখ খোলে। ফিরে দেখে মহাদেব। হাবার হারিয়ে যাওয়া ভাল নাম। তারপর দুহাত তুলে বলে, 'মহাদেব আমাকে বুকে তুলে নে।'

মহাদেব হাত বাড়ায়। কালীর হাত শক্ত করে ধরে।

□□□ চারুবালা সমস্যা □□□

হঠাৎ ঘরে অন্ধকার ছুঁড়ে মারে। প্রথমে চমকে ওঠে সরল, তারপর সবাই। অন্ধকার দেয়ালে দেয়ালে ধাক্কা খায়। অন্ধকার ফেটে যায়। গলগল করে গলানো আলকাতরার মতো রাত এগারোটায় অন্ধকার বের হয়ে আসে। বাইরে চাঁদ নেই, আকাশ নেই। বাইরেও খুব অন্ধকার। বাইরের খোলা জানলা দিয়ে ঘরে ঢোকে। ঘরের অন্ধকারকে আরও ঘন করে তোলে। তৃতীয় ঘরটিতে থাকে সরল ও সরলের স্ত্রী। শোয়ার আগে সরলের স্ত্রী হেয়ার ড্রেস করে। গায়ে পাউডার মাখে। সরল ঘুমোবার আগে বই পড়ে, কখনো অফিসের কাজ করে। আজ দুজনেই অন্ধকারে তলিয়ে যেতে থাকে। অন্ধকারে কিভাবে সাঁতার কাটতে হয় ওরা জানে না। অন্ধকারে কিভাবে ভেসে থাকতে হয়, তাও জানে না। এতো অন্ধকার ঘরে কে কোথায় এখ। কিভাবে আছে কেউ বুঝতে পারে না। দামি ড্রেসিং টেবিলটা ভাসে। স্টিলের এটো থালা বাসন খড়কুটোর মতো ভাসে। তলিয়ে যাবার আগে ধরার চেষ্টা করে। না পারায় সরলের স্ত্রীর গলা শোনা যায়, 'সরল আমি অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছি। চারুবালাকে বলো কাল সকালে যেন এটো বাসনগুলো মেজে দিয়ে যায়। আর আমার হেয়ার-ব্রাশটা যেন বের করে রাখে। দুদিন ধরে হেয়ার-ব্রাশটা পাচ্ছি না। আমাকে খুব ভোরে বেরোতে হবে। স্ত্রীর গলা শুনে সরল হাত বাড়ায়। কিন্তু হাতের স্পর্শ পায় না। হয়তো ভাসতে ভাসতে স্ত্রী সেগুন কাঠের ওয়ার ড্রোবের পেছনে চলে গেছে। অন্ধকারে খাট দোলে। সরলের গলা শোনা যায়, 'এণাক্ষী অন্ধকার আমাকে যেন কোথায় নিয়ে যাচ্ছে। এটা নিশ্চয়ই চারুবালার কাজ। ও-ই অন্ধকার ছুঁড়ে মেরেছে। ওকে দিয়ে সব কাজ করাবে। বজ্জাত মেয়েছেলের তিনদিন ধরে কামাই। এবার মায়না কাটবো। চারুবালা এলেই বোলো কাল যেন সকালে এটু ফাস্ট লন্ড্রী থেকে আমার প্যান্ট সার্ট নিয়ে আসে।' সরলের গলায় বিরক্তি ধরা পড়ে। কারণ চারুবালা তিনদিন আসে নি। সে বলে গেছে একদিন সে মিছিলে যাবে। কিন্তু বাকি দুদিন কেন সে আসেনি?

বন্যার জলের মতো অন্ধকার দ্বিতীয় ঘরটি ভাসায়। এই ঘরে নীনা থাকে। নীনা ঘুমোবার আগে ফিল্ম জার্ণাল পড়ে। অন্ধকার পড়তে দেয় না।

অন্ধকার নীনাকে ঘিরে রাখে। নীনা বিরক্ত হয়। নীনা অন্ধকারে ভাসতে থাকে। শিলিং ফ্যান বন্ধ। সুতোর মত গরম নীনাকে বাঁধে। নীনা জানলার পর্দা তুলে দেয়। আবার গভীর অন্ধকারে তলিয়ে যাবার আগে

নীনার গলায় বিরক্তি ধরা পড়ে, 'মা, নিশ্চয়ই চারুবালা অন্ধকার ছুঁড়ে মেরেছে। যদি কাল চারুবালা আসে, বলবে আমার অফিস যাবার আগে বিছানার চাদর, বালিশের ওয়ার, হাফ্ ডজন রুমাল, চারটে ব্লাউজ যেন কেঁচে দেয়, গন্ধ ছড়াচ্ছে।'

হু হু শব্দ হয় না। তবে ঠিক বন্যার জলের মত প্রথম ঘরে ঢুকে থই থই করছে অন্ধকার। বাইরের অন্ধকার এসে ঘরের অন্ধকারকে খিরের মত ঘন করে। ঘনীভূত অন্ধকারে সুহাস লেপ্টে যায়। এই ফ্ল্যাটের প্রথম ঘরে সুহাস থাকে। সে রাতে ঘুমোবার আগে ভি-সি-আর-এ বিদেশী ফিল্ম দেখে। আচমকা অন্ধকারে তলিয়ে যায় বন্ড ফাইটিং। একমাত্র অন্ধকারে জেগে থাকে বিশাল রজার মুর। চার্লি সুহাসের প্রিয়। সুহাসের গলায় বিরক্তি প্রকাশ পায়। চারদিন আগে চারুবালাকে বলেছিল মণ্ডলের দোকান থেকে চ্যাপলিনের ক্যাসেট আনতে। আনে নি। বলেছিল বইগুলো আর টেবিলটা গুছিয়ে রাখতে। করেনি। বলেছিল জিন্সের শার্ট আইরন করে রাখতে। রাখেনি। সুহাসের গলা শোনা যায়, 'বাবা, চারুবালা যেন কাল এসেই আমার ঘর আগে পরিষ্কার করে। দুদিনে ঘর নোংরায় ভরে গেছে।' ফ্ল্যাটের তৃতীয় ঘর থেকে কোন উত্তর আসে না। হয়তো ভারি অন্ধকার ঠেলে গলার স্বর বের হয়ে আসতে পারছে না। সবাই অতল অন্ধকারে ঘুমিয়ে পড়েছে।

ওরা স্বপ্নের অন্ধকারে দেখে ঘরের অন্ধকারটা একটা কালো ডিম হয়ে গেছে। ওরা চারজন মিলে কালো ডিমটায় তা দেয়। ডিমটা তা খায় আর বড় হয়। ডিমটা এক সময় বেশ বড় হয়। তারপর ডিমটা ফেটে যায়। একটুও শব্দ হয় না; ফাটা ডিমের খোলস থেকে গোলাকার কুসুম বের হয়। গাঢ় হলুদ কুসুম। অন্ধকার একটু একটু করে ভেঙে যায়। কুসুমের গাঢ় হলুদ আলো ছড়িয়ে পড়ে। হলুদ গাঢ় হলে লাল দেখায়। সেরকম একটা আলো অন্ধকারকে ক্রমশ গ্রাস করে নিচ্ছে। গাঢ় হলুদ কুসুম থেকে চারুবালা বের হয়ে আসছে। প্রথমে একটা দুটো চারুবালা, পরে শ শ। আরও পরে হাজার হাজার। চারজন চেঁচায় চারুবালা আ আ আ। পেছনের ডাক চারুবালা শুনতে পায় না। কারণ চারুবালা মিছিলের প্রথমে। ওরা কাছে এগোবার চেষ্টা করে। কিন্তু পারে না।

মিছিল বড় হতে থাকে। চারজন আবার চীৎকার করে, চারুবালা আ আ আ

তারপর সল্টলেকে একটা ভোর আসে। তখন ওদের ঘুম ভেঙে যায়। খোলা জানলা দিয়ে মিষ্টি হাওয়া আসে। ওরা মিষ্টি হাওয়ার প্রশংসা করে না। জানলা দিয়ে কৃষ্ণচূড়া গাছ দেখা যায়। বিশাল গাছের মাথায় খোলা ছাতার

মতো লাল ফুল ছড়ানো। ওরা কৃষ্ণচূড়া গাছ দেখে না। একটা দোয়েল ডাকছে। ওরা দোয়েলের ডাক শোনে না। শুধু তিনটি প্রশ্ন শোনা যায়। একজন শুয়ে থাকে। ঘুম ভাঙ্গে না।

চারুবালা আসেনি? প্রশ্ন ডিগবাজি খায়

চারুবালা আসেনি! বিস্ময় ডিগবাজি খায়

চারুবালা আসেনি? প্রশ্ন ডিগবাজি খায়

আজ তিনদিন। চারুবালা আসেনি। চারুবালা সমস্যা নিয়ে ওরা গত রাতে ঘুমোয়। চারুবালা সমস্যা নিয়ে জাগে। এতো ভোরে ওদের সুখকে ভীষণ গাম্ভীর্যে ভারি করে তোলে। গাড়ি কেনা যায়, ফ্ল্যাট কেনা যায়, চারুবালাকে কেনা যায় না। অন্ধকারের মতো সকল সমস্যাকে ওরা ভীষণ ভয় পায়। চারুবালা সমস্যা আরও জটিল। ওরা একবার ফ্ল্যাটের ছাদের দিকে তাকায়। সিলিং ফ্যান ঘুরছে, দেখে। ভয়তরাস ঘুমকাতর এসব পরিবার রাতে বিদ্যুৎ কখন এসেছে খবর রাখে না, যেমন খবর রাখে না কেমন করে বা কেন চারুবালারা পাল্টে যায়। সমস্যাগম্ভীর মুখগুলো যখন একত্রিত হয় তখন ফ্ল্যাটের ভিতর পাখির আওয়াজ হয়। আর তখুনি সমস্যাগম্ভীর মুখগুলো পাল্টে যায়। মুখে নিয়ে আসে সাদা পালকের উজ্জ্বলতা। খুশি ঢলে পড়ে মুখে। সরলও এণাক্ষীর কণ্ঠে আনন্দের স্বর শোনা যায়। একটি তখনও বিছানায়, অপরটি বাথরুমে।

চারুবালা এসেছে।

চারুবালা এসেছে।

সরল ছুটে যায়। পিছনে এণাক্ষী। দরজা খোলে। সামনে চারুবালার বড় ছেলে বলে, 'মা আর কাজ করবে না। মা কারখানায় একটা ভাল কাজ পেয়েছে।' ওর কথা শুনে এণাক্ষী দুঃখিত ও হতাশ হওয়ার আগে দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালাবার মতো ফস করে বলে, 'তুই কর বাপ।' এটো শালপাতার মতো 'বাপ' শব্দটা সময়ের হাওয়ায় দুলতে দুলতে যখন ছেলেটির কানের কাছে আসে, তখন ছেলেটি বুঝতে পারে 'বাপ' শব্দটি মায়ের মতো উচ্চারিত হয় নি। ফলত চারুবালার বড় ছেলের কাছে এণাক্ষীর 'বাপ' শব্দটা গুরুত্ব পায় না। ছেলেটি উত্তর দেয়, 'আমি আবার স্কুলে ভর্তি হয়েছি। আমি লেখাপড়া শিখব।' কথা কটি বলেই সিঁড়ি দিয়ে তর্ তর্ করে দ্রুত নেমে যায়।

এণাক্ষী মনের মধ্যে যে আশার কাঠিটা জ্বালিয়ে রেখেছিল, সেটা দপ্ করে নিভে যায়।

□□□ মধুময় এবং মধুময় □□□

গুমোট বিকেল জবুথবু হয়ে শুয়ে আছে অন্তর্জলী যাত্রার বৃদ্ধের মতো। মাঝ গঙ্গার বুক থেকে উঠে আসছে না ঝিরঝিরে ঠাণ্ডা বাতাস। মধুময়ের ভেজা বুকে খেলা করে না মুহুর্মুহু বিকেলের বাতাস। একটু একটু করে বিকেল নিস্তেজ হয়ে পড়ছে। মধুময়ের ঘেমো শরীরের ওপর দিয়ে দিনের নিভু নিভু আলো পিছলে যাচ্ছে। সন্ধ্যার ময়লা পোশাকে চওড়া গঙ্গা ছোট হয়ে যায়। নির্জনতায় ডুবে থাকা মধুময়ের কানে উঠে আসে জলচলার তির্ তির্ শব্দ। অশথের ঘন পাতার ছায়া খেলা করে মধুময়ের বোতাম খোলা বুকে। পরিত্যক্ত ভাঙা ঘাটে একটা খোলা নৌকা দুলছে। মাঝি নেই লোকজন নেই। দিন চলে যায়। অশথের ঘন পাতা প্রায় ঢেকে রেখেছে, নিয়নের আলো। লম্বা বেঞ্চের এক কোনে বসে থাকে মধুময়, মধুময়ের আত্মা, মধুময়ের মন। দুটো বিড়ির পর আর বিড়ি ধরায় না। কত বছর পর, মনে করতে পারছে না, গঙ্গার নির্জন ধারে জিরোতে এসেছে সে। না, প্রতারণা নয়। জিরোতে সে আসে নি, পালিয়ে এসেছে।

আচম্‌কা একটা প্রশ্ন 'তুমিই তো মধুময় অধিকারী' শুনে মধুময়ের ভাল লাগা নির্জনতা ভেঙে যায়। 'তুমিই তো মিছিল কেটে এখানে সরে এসেছো' এরকম প্রশ্নের তাপের ঝলসানি খেয়ে মধুময় দেখে তার ডান দিকে বেঞ্চের অন্য কোনে প্রশ্নকর্তা বসে আছে। সেরকম অন্ধকার জায়গাটাকে ঘিরে না রাখলেও মধুময় লোকটিকে পুরোপুরি চিনে উঠতে পারলো না। অর্ধেক নজরে জামা প্যাণ্ট আর শরীরের আকার দেখে মনে হয় ওরই মতো বয়েস, ওরই মতো দেখতে। মুখ ফসকে উত্তর বেরিয়ে না এলেও মধুময় দার্শনিকের মতো গাম্ভীর্য বজায় রেখে দ্বিতীয়বার লোকটার দিকে না তাকিয়ে কণ্ঠস্বরে কোন বিকার না রেখে উত্তর দেয় 'হ্যাঁ, আমি মধুময় অধিকারী। শরীর ভাল নেই বলে মিছিল থেকে সরে এসেছি। কিন্তু তুমি? তোমার পরিচয়।'

'আমার নামও মধুময় অধিকারী।'' বলার সাথে সাথেই বিকট শব্দে চক্ররেলটি চলে যাচ্ছে। ঝম্ ঝম্ ঝম্ ঝম্ শব্দের কাপুনি এসে ধাক্কা মারে মধুময়ের চমক লাগা চিন্তাভাবনায়। ইচ্ছা থাকলেও সে আর ডান দিকের অন্য মধুময় নামক লোকটির দিকে তাকায় না। না তাকিয়েই সে পাল্টা প্রশ্ন করে 'মশায়ের কোথায় থাকা হয়?' মাছির মতো নীরবতা খানিক উড়ে

বেড়ায়। তারপরই ডানদিক থেকে উত্তর আসে 'উত্তর কোলকাতার আহিরীটোলার বস্তিতে।' উত্তর শুনে বুকে দপ্ দপ্ শব্দ অনুভব করে মধুময় যেন বুকের আগুন নিভে যাবে।

মাথাটা ঝিম ঝিম করে। কারণ সেও উত্তর কলকাতার আহিরীটোলায় টিনের বস্তিতে থাকে। মধুময়ের ঘরের নাম্বার বার বাই ওয়ান বাই টু। মধুময় ভাবছে লোকটাকে জিজ্ঞেস করবে কিনা বাড়ির নাম্বারের কথা? আর এখুনি পরিচিত কণ্ঠস্বরটি শুনতে পায়। 'তুমি ভাবছো আমার ঘরের নাম্বারটা কি হতে পারে। আমিও বার বাই ওয়ান বাই টু-তে থাকি। আচ্ছা মধুময়বাবু তুমি তো সরকারি কর্মচারি। পিওনের কাজ করতে করতে এখন ফাইলকিপার হয়েছে।'

রাস্কেলটা আবার আমাকে 'বাবু' বলছে। শালা ইয়ার্কি করবার আর জায়গা পেল না। ইয়ার্কি শালা তোর বাপের সাথে মারা গে যা। না, না, বাপ তোলাটা উচিত হয়নি। শালার বাপ হয়তো আমারই বাপ হয়ে যেতে পারে, সবই যখন মিলে যাচ্ছে। মধুময়, আমি বাপ উইথড্র করছি। ও হো, আমি তো এখনও মুখ থেকে কথাটা বের করিনি। উইথড্র করার প্রশ্ন আসছে কেন। পবিত্র গঙ্গা আমাকে শুদ্ধ করো। আমার অপরাধ ক্ষমা করো। আমি বেশ উত্তেজিত। উত্তেজনা আমার রক্তকে খেপাচ্ছে।

পাপাহহারি দুরিতারি মা গঙ্গে, তোমার ঝিরঝিরে ঠাণ্ডা হাওয়া কোথায় গেল? আমি ঘামছি, আমার শরীর থেকে নুন ঝরছে। গঙ্গা মা আমার আমাকে শুদ্ধ করো, গঙ্গং জলং নির্মলম্। যজমানি পুরুত আমার বাবার কাছ থেকে শোনা ভাঙা মন্ত্রগুলো কাগজের ফুলের মতো শোভাবর্ধন করে অযত্নে রয়ে গেছে এখনও আমার ঘুম জাগানিয়া স্মৃতিতে।

আবার কথা ভেসে আসে।

'আমিও সরকারি কর্মচারী। পিওন থেকে ফাইল কিপার হয়েছি। পঁচিশ বছর কাজ করছি চার ছেলেমেয়েকে মানুষ করেছি।' লোকটার কথাগুলো সাপের মতো মধুময়ের বুকের ভেতর দিয়ে হেটে চলে যায়। শরীরটা সিরু সিরু করে। ডান দিকে তাকাতে পারে না। মনটা ছম্ ছম্ করে কিন্তু দেখতে ইচ্ছে করছে লোকটা পুরোপুরি ওর ডুপ্লিকেট কিনা। লোকটার ডানদিকে না-জানলা না-দরজা, বিম্ খোলা ব্রিটিশ আমলের একটা পোড়ো দালান। সেই দালানের ছায়া অন্য মধুময়ের শরীরটাকে কালো চাদরের মতো জড়িয়ে রেখেছে। হঠাৎ এক টুকরো নিয়নের আলো বাঁ দিকের অশথ গাছের ঘন পাতার ফাঁক দিয়ে লোকটার টেকো মাথায় ছিটকে পড়ে। পুনরায় অন্ধকার ফিরে আসে সেখানে। ঠিক সেসময় মধুময়ের ডান চোখের বাঁকা দৃষ্টি লোকটার শরীরে আটকে যায়। মধুময় অবাক হয়ে ভাবে, আশ্চর্য হুবহু এক চেহারা। তবু মধুময়

শরীরটাকে উত্তেজিত না করার ভান করে। চার ছেলে মেয়েকে মানুষ করতে কত পরিশ্রম করতে হয় জানিস্। তাদের ভালমন্দ খাওয়া-পরা, তাদের লেখাপড়া, তাদের অসুখ বিসুখ—জানিস্ এসব আমায় করতে হচ্ছে সারা জীবন ধরে। দারিদ্র কি জিনিস অভাব কি জিনিস কোনোদিন বুঝতে দিইনি ছেলে-মেয়েকে। সেটা আমরা, এই আমি মধুময় অধিকারী, এই আমার গিন্নী প্রভা অধিকারী হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি অভাব কি জিনিস দারিদ্র কি জিনিস, দুঃখ কি জিনিস কষ্ট কি জিনিস।

এবার মধুময়ের চিন্তার মধ্যে লোকটা ঢুকে যেতেই মধুময় সরাসরি টানটান প্রশ্ন করে :

সত্য বল তুমি কে ?

আমি মধুময়

তুমি কোথায় থাক ?

তোমার শরীরের মধ্যে

তাহলে এখানে কেন ?

তোমার শরীর থেকে বের হয়ে এসেছি

কেন এসেছো ?

যে তুমি কোনদিন ঘুষ খাওনি, আজ খেলে, সেজন্য তোমার শরীরের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে তোমাকে অফিস থেকে ফলো করতে করতে এখানে এসেছি।

তো তুমি কি চাও ?

আমি চাই না তুমি ঘুষ খাও। এতে সংগ্রামি জীবন নষ্ট হয়। সংগ্রামি জীবন এভাবে নষ্ট হলে সমাজ কখনো গতিশীল হতে পারে না।

শালুআ. জ্ঞান দিচ্ছে মাইরি। মধুময় ঝিমিয়ে পড়ে খানিকক্ষণ, জলে ভেজা বাসি রুটির মতো নেতিয়ে যায়। শুকিয়ে যাওয়া গেনজিটা আবার ঘামে ভিজতে থাকে। জবুথবু চিন্তাভাবনাগুলো আবার নাড়া খায়। রক্তের প্রবাহে হাওয়া লাগে। সতর্ক পদক্ষেপে অন্ধকারের মতো উত্তেজনা একটু একটু করে এগিয়ে আসে। 'শোন, মধুময় সময়ের কাছে আমি অসহায়। কোনদিন আমি আমার গিন্নীকে ভাল শাড়ি বেলাউজ কিনে দিতে পারি নি। আমার কি ইচ্ছে করে না ? পঁচিশ বছর ধরে কোনদিন আমি আমার রোগা অম্বলের রুগী গিন্নীকে বড় ডাক্তার দেখাতে পারিনি। আমার কি ইচ্ছে করে না ? ছেঁড়া বেলাউজ ছেঁড়া সায়া ছেঁড়া জনতা শাড়ি পরে এমনই অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে যে গিন্নীর শরীর থেকে লজ্জাই পালিয়ে গেছে। অভাবি শরীরে ভাজ পড়তে পড়তে আমার গিন্নীর শরীরটাই ছোট হয়ে গেছে। আমি আর ছোট করতে চাই না। শোন মধুময়, সময়ের কাছে আমি অসহায়। আজ আমি ঠিক করেছি, একজোড়া নতুন বেলাউজ আর সায়া কিনে নিয়ে যাব। আজ

আমাদের বিয়ের তারিখ। আমি মনস্থির করে ফেলেছি বছরে এই একটি দিন পেলে আমি ঘুষ খাব। কি, ঘুমিয়ে পড়লে?'

'না ঘুমোই নি। যে খায় সে দিন বাছে না। আচ্ছা মধুময় তুমি তো পঁচিশ বছর ধরে কত না মিছিল কত না সংগ্রাম কত না মিটিং করেছো এই সমাজটাকে বদলে ফেলার জন্য। আর আজ কিনা ভেতরের পকেটে ঘুষের টাকা নিয়ে কালাহাণ্ডির দুর্ভিক্ষের মিছিলে যোগ দিয়ে কিছুদূর গিয়েই পালিয়ে এসেছো এই গঙ্গার ধারে। কি ভাবছো এতো? পাপকে, অন্যায়কে হজম কবতে পারছো না? বদহজমের জ্বালা নিশ্চয় সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়েছে। প্রায় তিরিশ বছর ধরে তুমি না কতো শ্লোগান দিয়েছ মিছিলে মিছিলে। স্মরণ করো মধুময়, ভাবো।

সিকোয়েন্স ১

মিছিল এগোচ্ছে। খাদ্য আন্দোলনের মিছিল। লাল ঝাণ্ডা উড়ছে। দুপাশের ফুটপাথে বেশ কিছু জমে থাকা মানুষ। রাজভবনের সামনে পুলিশের ব্যারিকেড। শ্লোগান: আমাদের সংগ্রাম। চলছে চলবে। হঠাৎ মিছিল ভাঙে টুকবো টুকরো হয়ে যায়। পুলিশেব লাঠি দেখা যায়। কাঁদুনে গ্যাস ছোঁড়া হয়। পুলিশ ভ্যান-এ মিছিলের লোকদের তোলা হয়। ভ্যানের ভেতব শ্লোগান শোনা যায়। মধুময় ফুটপাথের ধাবে শুয়ে। তাকে ঘিরে মিছিলেব লোক। কপাল থেকে রক্ত নেমে আসে সরুচিকন কচি কচি গোঁফে। হাস পাতালের সাদা গাড়ির পেছনে লাল ক্রসেব দরজা খুলে যায। মধুময় হাস পাতালে যায়।

সিকোয়েন্স ২

লম্বা মিছিল এগোচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদ বিচ্ছিন্নতাবাদ সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে মিছিলের স্রোত বইছে কলকাতাব রাস্তায। সামনেব সারিতে শেকলের মতো হাত ধরাধরি করে দশজন। তাদেব পেছনে মধুমষ। হাতে লাল ঝাণ্ডা। মধুময়ের পেছনে একটা টেম্পো। টেম্পোর দুধারে এবং মাঝখানে লাল ঝাণ্ডা। হাওয়ায় উড়ছে। টেম্পো থেকে গণসংগীত শোনা যায়। মিছিল এগিয়ে যায়। টেম্পো এগিয়ে যায়। শ্লোগান: সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক। বিচ্ছিন্নতাবাদ রুখছি, রুখবো। সাম্প্রদায়িকতা রুখছি, রুখবো।

সিকোয়ান্স ৩

যুদ্ধবিরোধি মিছিল। হাতে হাতে পোস্টার।

পোস্টার ১

পৃথিবীর বুকে কম করে পনেরো হাজার যুদ্ধ হয়েছে

পোস্টার ২

পনেরো হাজার যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছে ৪০০ কোটি মানুষ

পোস্টার ৩

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ৪ কোটি ১৪ লাখ ৩৫ হাজার মানুষের প্রাণ গেছে।

পোস্টার ৪

দু'কোটি মানুষ বিকলাঙ্গ হয়েছে

পোস্টার ৫

৩০ ০০১ কোটি টাকার মানব সম্পদ ধ্বংস হয়েছে

পোস্টার ৬

মধুময়ের হাতে পোস্টার আমরা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ হতে দেব না।

সিকোয়েন্স ৪

কর্মচারিদের লম্বা মিছিল। কালাহাণ্ডির দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে মিছিল। প্রত্যেকের বুকে ব্যাজ। রাস্তার দুধারে জমে থাকা কিছু মানুষ। তাদের হাতে লিফলেট। তারা পড়ছে। মধুময় মিছিলের শেষ প্রান্তে। বুকে ব্যাজ। মধুময়ের কাঁচা পাকা পাতলা গোঁফের ধারে একটা মাছি ঘুরছে। গোঁফের ধারে টিফিনের কণা লেগে আছে।

শ্লোগান : দুর্ভিক্ষ সমাজের অভিশাপ। অভিশাপ মুক্ত করো।

মনে পড়ছে মধুময় সিকোয়েন্সগুলো? আর আজ তুমি সুখ চাও। ভেবেছো সংগ্রাম শেষ হয়ে গেছে। তুমি তো ভালোই জানো সমাজ ব্যবস্থা পুরোপুরি না বদলালে সংগ্রাম শেষ হয় না। বদলালেও কি হয়? তক্কো থাক। কিছুলোক তো চিরকাল সাফার করে। তারা কখনও সুযোগ নেয় না। সুযোগের পাছায় নাথি মারে পেচ্ছাব করে থুতু ফেলে। সুযোগ নেওয়াটাকে তারা রীতিমতো ঘৃণা করে। আবার কিছু লোক সংগ্রামের মধ্যে থেকেও সুযোগ নেয়। গোপনে সুযোগের সাথে সঙ্গম করে। সুখ ভোগের নেশায় সমস্ত কিছু ভুলে যায়। তাদের অনেক সময় চেনা যায়, অনেক সময় চেনা যায় না। শেষ বয়সে তুমিও কি গোপনে সে পথে পা বাড়াচ্ছো?

চুপ করো চুপ করো আমায় একটু একা থাকতে দাও। কেন তুমি আমার পিছু পিছু এলে? তুমি আমার শরীরের ভিতর আছো, সেখানেই থাকো। আমি তো তোমাকে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছিলাম। কেন তুমি জাগলে? কেন

তুমি আমার শরীর থেকে বেরিয়ে এলে ? তোমার এসব খোচামারা কথাবাত্তা তাছাড়া এনালিসিস্ অফ মাই লাইফ ডকুমেণ্টেশন ভাল লাগতাছে না। আমার মাইয়্যাডা 'টিউশন করে নিজের খরচ চালায়। ভালভাবেই বি. এ. পাশ করেছে। পোলাডাও টিউশন করে নিজের খরচ চালায়। না, বিড়ি সিগারেট খায় না। একটু আধটু হিন্দী সিনেমা দেখে। কেউ ওরা একটা চাকরিও জোটাতে পারে নাই। ছোট ছেলে মেয়ে দুইডা এখনো পড়ে। আর আমার বৌ খাটে। ছেঁড়া বেলাউজ ছেঁড়া সায়া দেখেও ওদের দয়া মায়া হয় না। বলে কি না, 'ওটাই আসল মায়ের রূপ। এই মা-ই আমাদের প্রিয়। আমরা এই আদর্শ 'মায়ের জন্য কাজে কর্মে প্রেরণা পাই। বেঁচে থাকার প্রেরণা পাই।' ভাল কতা, প্রভা ওদের কাছে মা, কিন্তু আমার কাছে যে স্ত্রী। আমার তো ইচ্ছে করে বিয়ের তারিখে,আর কিছু না পারি একডা নতুন বেলাউজ নতুন সায়া দিই। তুমি তো জানো মধুময় বিয়ের দিনটা আমরা কতো দুঃখের ভিতর দিয়ে কাটাই। অফিস ফেরত শুধু গোলাপফুল কিনে গভীর রাতে শুঁকি। আহা, কতো ভালবেসেই না আমরা বিয়ে করেছিলাম।

তাহলে মধুময় তুমি এতোদিন ঘুষ নাওনি কেন? সুযোগ তো ছিল। আজ তুমি পিয়ন থেকে ফাইল কিপার হয়েছ। এখন সরাসরি হাতে সুযোগ পেয়েছো। তাই লোভ সামলাতে পারছো না? সেজন্য আজই প্রথম পঞ্চাশ টাকা নিয়ে দুটো ফাইল সামনে এগিয়ে দিয়েছো যাতে কাজটা একদিনের মধ্যেই হয়ে যায়। আমার মনে হয় অবচেতন মনে তুমি হতাশা পুষে রেখেছিলে। কারণ তুমি স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে পাশ করেছিলে। ইংরেজিতে সেভেণ্টি পার্সেন্ট নাম্বার পেয়েছিলে। আশা ছিল পড়াশোনা করে ভাল চাকরি করবে। পারলে না। ঢাকা থেকে উদ্বাস্তু হয়ে চলে আসা, বাবার মরে যাওয়া, অভাব দারিদ্র তোমার স্বপ্নকে তোমার আশাকে মেরে ফেললো। সেই হতাশাটা কি আবার চাড়া দিয়ে উঠল? তোমার ছেলেতো শিগগির গ্রামীণ ব্যাঙ্কে চাকরি পাবে। এরপরও তুমি হতাশাকে আদর যত্ন করে ওয়েলকাম করছো? ছেলের কথা ভেবে কি? চাকরি পেলেই ছেলে হয়তো ওর ভালবাসার অসবর্ণ মেয়েটিকে বিয়ে করে আলাদা সংসার পাতবে। এই ভয়ে?

এসব ভাবনা চিন্তা একটু একটু করে সুখাতর্ মধুময়কে নিস্তেজ করে দেয়। একটু আগেই কলকাতার সুখী সূর্যকে গঙ্গার ওপারে একটু একটু করে অস্ত যেতে দেখেছে মধুময়। মধুময় গা এলিয়ে দিয়েছে কাঠের বেঞ্চে। মাথাটা নোয়ানো পেছনের লম্বা কাঠে। গোটানো পা দুটো স্টান লম্বা করে সামনের দিকে এগোনো। মধুময় আকাশ দেখছে। আকাশের গায়ে রঙ ওঠা কালো চাদর। এরকম অবস্থায় মধুময়কে দেখে মনে হচ্ছে, নিস্তেজ মধুময় যেন হাসপাতালের বেডে শুয়ে রুগ্ন গলায় বলছে, 'কিন্তু আমি আর গিন্নীর কষ্ট দেখতে

পারছি না   পঁচিশ বছর দেখে দেখে এখন আমি আর সহ্য করতে পারছি না। ওর না বলা মুখ আমাকে ভীষণ কষ্ট দেয়। বছরে এই একটা দিন, ক্ষমা করো মধুময় ক্ষমা ক'রো, একটুখানি স্বামীস্ত্রীতে সুখে থাকতে চাই।'

তাহ'লে মধুময় ঘুষের পয়সায় তুমি সুখ কিনতে চাইছো। সুখাতি' তোমাকে ক্রমশ গ্রাস করে নিচ্ছে। তুমি বাঁধা দেবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছো? তোমার ওয়াইফ প্রভা কি এই সুখে রাজি হবে? তুমি তোমার এই অপকর্মটি প্রভার কাছে গোপন না করে একবার বলে দেখো তো, কি বলে?

না মধুময় আমার প্রভা রাজি হবে না। আমি তো ওকে চিনি। ত্যাগ ওকে মহান করে তুলেছে। ও রাজি হবে না বলেই আমি ওকে গোপন করতাম। আমি যে জ্বলছি। আমি আর কি করতে পারি? আমি এখন কি করবো?

তোমার পকেটে এখনও কালাহাণ্ডির দুর্ভিক্ষের রিপোর্ট লিফলেট আছে, তুমি তো ভাজ করে সামনের পকেটে রেখে দিয়েছো। একবারও পড়নি। পড়, পড়ে দেখ সেই রিপোর্ট।

রিপোর্ট ১

ওড়িশার কালাহাণ্ডি ও কোরাপুটের খরা ক্লিষ্ট মানুষদের পাশে দাঁড়ান। তাদের অর্থ দিয়ে সাহায্য করুন।

রিপোর্ট ২

ওড়িশার কালাহাণ্ডির দুর্ভিক্ষ কবলিত প্রায় আটাশটি গ্রামের মানুষকে ত্রাণ সরবরাহ করুন।

রিপোর্ট ৩

মাসকাপদর গ্রামে সত্তরটি পরিবারের ক্ষুধার্ত আদিবাসী মানুষেরা ক্ষুধায় কাতরাচ্ছে। ঘাস পাতা কচু এসব খেয়ে দিন কাটাচ্ছে, খিদের জ্বালায় রাত কাটাতে পারছে না।

রিপোর্ট ৪

কেরপাই, কেচুলেখা, থুয়ামেল, বাসপুর, নাকরুণ্ডি ও লাঞ্জিগড়ের বিস্তীর্ণ এলাকা দুর্ভিক্ষ কবলিত বলে ঘোষণা করা হোক।

রিপোর্ট ৫

কোরাপুট জেলার কাশীপুর ব্লকে চারশ লোক অনাহারে প্রাণ হারিয়েছে। কারোর মতে অনাহারে মৃত্যুর সংখ্যা দুশো।

'এই যে শুনছেন, শুনছেন' তিনবার বলার পর মধুময় নাড়া খায়। বোজা চোখটা আধ ফোটা ফুলের মতো খুলে যায়। মধুময়ের ঘুম ঘুম ভাবটা কেটে যায়। মধুময় চারদিক তাকায়। চারপাশ অন্ধকার ঘিরে ফেলেছে। অশথের

ঘন পাতার ফাঁকফোকর দিয়ে নিয়নের আলো কখনো কখনো অন্ধকারকে ছিঁড়ে ফেলছে। ডান পাশে বসা লোকটা পুনরায় বলছে, 'বলছিলাম একটু আগুন হবে।' মধুময় বিড়ি সিগারেট খেলেও এই মুহূর্তে হ্যাংলার মতো আগুন চাওয়াটা সে অপছন্দ করছে অথচ কিছু একটা উত্তর দিলে ভাল হয়। মধুময় উত্তর খুজতে থাকে। উত্তর খুঁজে পায় না। মধুময় উত্তর না দিয়েই চলে যায়। যেতে যেতে শোনে লোকটা বলছে 'বলছিলাম একটু আগুন হবে। ও মশাই হবে না?'

রাত নটায় মধুমর অহিরীটোলায় ফেরে। গলিতে ঢুকতেই মনটা খুব হালকা লাগে। ভেতরের পকেটে পঞ্চাশ টাকা নেই। ইউনিয়ন অফিসে গিয়ে ডোনেট করে এসেছে কালাহাণ্ডির দুর্ভিক্ষের ফাণ্ডে। টিনের ঘরে পা দিয়েই প্রভাকে ডাকে। ডাকতে ডাকতেই ঘরে ঢোকে। টিনের দেয়ালে ছোট্ট আয়নার সামনে মুখ রেখে প্রভা চুল আঁচড়াচ্ছিল। ঘরে আর কেউ নেই। ছোট ছেলে মেয়ে দুটি কোচিং-এ গেছে। বড় ছেলেমেয়ে দুটি টিউশনি করে ফেরে নি। প্রভা মুখ ঘোরায়। 'কি বলছো' বলে মধুময়ের কাছে একটু এগিয়ে আসে। মধুময়ের বৌ প্রভা কাছে আসে। প্রভার খসখসে হাতটা তুলে গোলাপ ফুল দিয়ে বলে,'ধরো। আজ আমাদের বিয়ের তারিখ?' তারপর নতুন সূচ আর সুতো বের করে বলে 'এ মাসটা চালিয়ে নাও লক্ষ্মীটি। ছেঁড়া সায়া বেলাউজ আর পরো না। বিয়ের তারিখে চোখে লাগে। সামনের মাসে অবশ্যই কিনে আনবো।' প্রভা জানে সামনের মাসটাও বাসি হয়ে যাবে। জেনেও প্রভা যখন হাত বাড়িয়ে সূচ সুতোটা নেয়, তখন দেখা যায় প্রভার ঠোঁটের কোনে এক টুকরো অভাবের হাসি হীরের টুকরোর মতো জ্বল জ্বল করছে।

□□□ সুখদেবের কুকুর □□□

॥ এক ॥

গ্রামের নাম দয়াপুর। পশ্চিম বাঙলার পশ্চিম দিকের গ্রাম। দুর্গাপুরের উঁচু পাকা রাস্তা ধরে যেতে হয়। দুর্গাপুরের পাকা রাস্তা থেকে আরও পাঁচ মাইল ভেতরে। সেই গ্রামে উল্লেখ করার মতো দুটি কুকুর আছে। কুকুর দুটির অভিভাবক একটি ছোট্ট ছেলে। ছেলেটির নাম সুখদেব। সবায় সুখা বলে। কিন্তু বানানটা হওয়া উচিত 'শুখা'। কারণ সুখদেব দেখতে শুকনো ডালের মতো। তাছাড়া গরিবের ছেলেতো, সেরকম ভালমন্দ খাওয়া সে পায় না। এই সুখাই কুকুর দুটোর নাম রেখেছে কানা কালু এবং খোঁড়া লালু। একটা কুকুরের চোখ কানা। খুব ছোটবেলাতেই কালুর চোখে একজন বড় মানুষ ইট ছুঁড়ে মেরেছিল। কালুর দোষ বড় মানুষটা যে কলা পাতায় খেয়েছিল, খাওয়ার পর সেই কলাপাতাটা কালু চেটেছিল। তারপর ক্যাঁউ ক্যাঁউ করতে করতে ছুটেছিল। চোখটা দিয়ে রক্ত পড়েছিল। সুখদেব তখন পাঠশালা থেকে পড়াশোনা করে ফিরছিল। কালুকে ধরে রক্ত মুছে দিয়ে ঘাসপাতা রগড়ে লাগিয়ে দিয়েছিল। তারপর বাড়িতে গিয়ে ন্যাকড়া দিয়ে চোখটা বেঁধেছিল। তখন থেকেই সুখদেবের সাথে কালুর ভাব হয় এবং কুকুরটাকে কানা কালু বলে ডাকে। সুখদেবের মা একদিন বলেছিল, 'তুই ওকে কানা কালু বলে ডাকিস্ কেন? ওর মনে কষ্ট হয় না?' সুখদেব উত্তর দেয়, 'কালু কানা মানে বুঝে না। উতো আমার মতো লেখাপড়া করে না।'

আর খোঁড়া লালু জন্মের পর থেকেই খোঁড়া। পেছনের ডান পা-টা একটু ছোট। সেজন্য লালুকে একটু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাটতে হয়। খোঁড়া লালুও একদিন সুখদেবের পিছু পিছু বাড়িতক্ এসেছিল। পরে বাড়ির ভিতর ঢুকতে সাহস পাচ্ছে না দেখে সুখা ওকে 'তু-তু' করে ভিতরে নিয়ে এসেছিল। ব্যাপারটা হয়েছিল কি, একদিন পাঠশালার টিফিনে সুখদেব পারুটি পেয়েছিল। সে বাবলাগাছের অল্প ছায়ায় একা বসে পারুটি খাচ্ছিল। আর দেখছিল লালুকে। পাঠশালার আর সব ছেলেরা মহাআনন্দে পারুটি দাঁত দিতে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছিল। তাদের পায়ের কাছে খোঁড়া লালু ঘুরছিল আর মাঝে মাঝে শুকনো মুখটা তুলে ছেলেদের গালভরা মুখের দিকে পিটি পিটি

তাকাচ্ছিল। কেউ ওকে সামান্য একটু পারুটিও ছিঁড়ে দিচ্ছিল না। হঠাৎ কি মনে করে খোঁড়াতে খোঁড়াতে সুখদেবের কাছে এলো। কাছে এসেই সুখদেবের সামনে সোজা হয়ে দুপায়ের উপর ভর দিয়ে সুখদেবের দিকে মুখ তুলে বসলো। মাটির সাথে ল্যাজটা লেপটে থাকলেও ছোট সাপের ল্যাজের মতো নড়ছিল। সুখদেব পারুটি ছিঁড়ে মাটিতে না ফেলে হাত দিয়ে লালুর মুখের কাছে ধরলো। গপাৎ করে মুখে পুরে নিল। টিফিনের পরও একটা পিরিয়ড হয়েছিল। ততক্ষণ পর্যন্ত লালু বসে ছিল। ছুটি হতেই সুখদেব বাড়ি ফিরলে পিছু পিছু খোঁড়া লালু এসেছিল।

ক্লাস ফাইভের ছাত্র হ'তো সুখদেব। এক বছর অসুখের জন্য পড়তে পারেনি। আর তাছাড়া বাবার সাথে অবনীভূষণের জমি নিয়ে ঝগড়া বিবাদ হওয়াতেও সুখদেবের একবছর নষ্ট হয়েছিল। সেজন্য সুখদেব চতুর্থ শ্রেণীতে পড়াশোনা করে।

॥ দুই ॥

মাথার উপর দুপুরের তাপ। আর মাথার ভেতর চিন্তার উত্তাপ। দুয়ে মিলে একটা ভীষণ রাগ জন্মায় মাধবের শরীরে। শরীরের রক্তকণায় সেই রাগ টগবগায়। অবনীভূষণের বাড়ি থেকে একটা প্রচণ্ড রাগ নিয়ে ফিরছে মাধব। চলতে চলতেই গাছ থেকে ডাল ভেঙেছে। পাতা আর ছোট ডাল ছেটে দিয়ে ডালটা লাঠির মতো করেছে। আর মনে মনে ভাবতে ভাবতে বাড়ির দিকে দ্রুত হেটে যাচ্ছে। আজ কুকুর দুটোকেই শেষ করে দেবে। যমের দুয়ারে পাঠিয়ে দেবে কানা আর খোঁড়াকে। ছেলের কথা ভাবতেই রাগটা মাধবের কমে আসে। সুখা তার পঞ্চম সন্তান এবং একমাত্র পুত্রসন্তান। আর চার জনেই মাধবের কন্যা। সবার বিয়ে দিতে গিয়েই বাপ-ঠাকুর্দার সামান্য জমি অবনীভূষণের কাছে বিক্রী করে দিয়েছে কম দামে। এখন মাধব ভাগচাষী। অবনীভূষণের জমি চাষ করে, তবে ইদানীং বামফ্রণ্ট সরকার আসার পর অবনীভূষণের জমিতে ভাগচাষী হিসাবে নথিভুক্ত করে নিয়েছে মাধব। কিন্তু আজ অবনীভূষণ যাচ্ছেতাই অপমান করেছে মাধবকে। অবনীভূষণ আবার পঞ্চায়েতের লোক। ঘটনাটা সামান্য হলেও অবনীভূষণ বড় করে দেখেছে। কানা কালু অবনীভূষণের বাইরের দালানে ঠাকুর ঘরের দরজা খোলা পেয়ে ঢুকেছিল। পাথর বাটিতে ছিল দুধ। সেই দুধটুকু চুকচুক করে খেয়ে নিয়েছে। অবনীভূষণের অতি বৃদ্ধা বিধবা মাকে দেখতে পেয়ে কালু দৌড়ে পালিয়ে গেছিল। পালিয়ে গেছিল একেবারে সুখদেবের কাছে। সুখদেব তখন পাঠশালায়। কানা কালু এখন একেবারে বেঞ্চের তলায় সুখদেবের পায়ের কাছে। সুখদেব, বুঝতে পেরে ওকে কোলে তুলে নেয়।

মাধব বাড়ি ফিরেই চেঁচায় -'কানা কুতায় ?' দুপুর তিনটে বাজে। মাধবের বৌ ধ্বসে যাওয়া মাটির বারান্দায় বসে চিরুনি দিয়ে চুল আঁচড়াচ্ছিল, ময়লা আঁচলটা মাটিতে বিছিয়ে। আঁচলে উকুন পড়ছিল, আর সেই উকুন বুড়ো আঙ্গুলের নখ দিয়ে মারছিল। উকুন মারার পুটুস পুটুস শব্দ মাধবের চেঁচামেচিতে আর শোনা যাচ্ছিল না। মাধবের প্রশ্ন শুনে জবাব দেয়—'উতো সুখার সাথে সাথে ঢোকে।' তারপর শুধায়—'খোঁড়া কুতায় ?' নির্লিপ্তভাবে চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে সুখার মা জবাব দেয়—'উতো আমার সাথে ঘাটে গিছলো। এঁটো খাচ্ছিল। উখানেই আছে।' মাধব খিড়কির ভাঙা দরজার বাঁশের খিলান খুলে ঘাটের কাছে যায়। গিয়ে কোথাও খোঁড়াকে দেখতে না পেয়ে চোখের দৃষ্টি এসে থামে পুরানো তেঁতুল গাছটার তলায়। সেখানে একডাল ছায়া নিয়ে খোঁড়া লালু ঘুমোচ্ছে। খোঁড়া লালুকে ঐ অবস্থায় দেখে মাধবের মায়া হলো। ওতো সুখারই বন্ধু। তাছাড়া ওতো দোষ করেনি। করেছে কানাটা। কানার বিরুদ্ধে অবনীভূষণের নালিশ, 'তোকে সাবধান করে দিচ্ছি মাধাই। কালুকে যদি সরিয়ে না দিস, তাহলে পঞ্চায়েত ডেকে তোকেই জুতোবো। হ্যাঁ বলে দিলাম।'

এমন সময় ক্যাঁউ ক্যাঁউ করতে করতে কানা ঢোকে। পিছু পিছু সুখদেব। শব্দ শুনেই মাধব দাওয়ায় ফিরে আসে। সুখার মা তখনও উকুন বের করছে, আর মারছে। ডালটা তখনও মাধবের হাতে ছিল। ডালটা তুলে কানাকে মারতে যাবে, অমনি সুখার মা মাধবের হাতট চেপে ধরে বলে, 'মাইরবে নি বুইলছি। সুখার সাথি। ও সুখার কম্‌রিড।"

মাধব কথাটা শোনে। কালু ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে রান্নাঘরের নিভানো মাটির ভাঙা উনুনের পাশে বসে আছে। রান্নাঘরের খড়ের চালা পচতে পচতে ভেঙে পড়েছে। আকাশের অনেকটা এখন চালের বড় বড় ছেঁদা দিয়ে ঢুকে পড়ে। মাধব স্নান করতে চলে যায়। যখন অবনীভূষণের লোক মাধবকে খবর দিতে গিয়েছিল, তখন মাধব মাঠের পাকা ধান কাটছিল। ধান-কাটা ঐ অবস্থাতেই রেখে মাধব গিয়েছিল। আবার স্নান খাওয়া সেরে ধান কাটতে যেতে হবে মাধবকে। সাপের মত ভয় তির্‌তির্‌ করে বুকের ভিতর দিয়ে হেটে যায়, যদি ধান সব কেউ কেড়ে নিয়ে যায়। সে সুখদেবকে বলে, 'সুখা মাঠে যা, আর শুন্‌, যদি কখুনো শুনি অবনীশালোর বাড়িতে তুর ইকেুর ঢুকছে, তাহলে দুটোকেই শ্যাষ করে দিব। এই মুর্‌ শ্যাষ কথা। হ্যাঁ—।'

মাধব স্নান করতে চলে যায়। মা শুধায় সুকদেবকে, "টিফিন আজ পাস নাই ?" সুখদেব উত্তর দেয় 'না'। সুখদেবের মা ভাত বাড়তে যায়। দাওয়ায় চাটাই-এর ছেঁড়া আসন পেতে সুখদেব খেতে বসে। অন্য আসনটি বাবার জন্য শূন্য থাকে। কানা কালু খোঁড়া লালু উঠোনে বসে থাকে। ওদের মাথার

উপর গন্ধনেবুর গাছ। গাছের ছায়া ওদের গায়ে। বাবা আসে। খেতে বসে। ভাত আনে মাধবের বৌ। একথালা ভাত। পাশে কাঁচালঙ্কা, নুন। অনেক রকম শাকপাতার সেদ্ধ। আর আছে খেসারির ডাল। খেতে খেতে বলে—'জোৎদারদের যুগ শ্যাষ হয়েছে। ইবার মুদের যুগ। পুনচায়েৎ হইয়েছে। চাষের অদ্দেক ধান না পেইলে ছাইড়বো না একদানা ধান। শুনে রাখ মুর কথা। হ্যাঁ বৌ, ই কথাই বুইলুলে রাখলাম।' 'ভাতের গরাস' মুখে দেয় আর বক্ বক্ করে যায় মাধব। সুখদেব বাপের কথা বোঝার চেষ্টা করে।

মাধব আবার বলে-'সার দিলাম, বীজ দিলাম, খোল দিলাম। অদ্দেক নিব না তো কি? আবার অবনীশালো বুলে কি না জলকর দিতে। জলকর কি মুর দেওয়ার কতা? পুনচায়েৎ বুইলছে—কর দিবি না মাধো। উটা অবনীর পালা। উ দিবে।' এক ঘটি খাবার জল নিয়ে এসে মাধবের বৌ বলে—'অবনী শালাওতো বামফন্টের নোক।'

'হ্যাঁ, নোকে বলে, কিন্তু মুদের পাটির নোকতো নয়। আর ও শালো তো আগে মুদের পাটির বিরুদ্ধে ছিলো। বড় ধুত্তুর।'

খাওয়া শেষ হয মাধবের। গন্ধনেবুর গাছের পাশে মুখ ধুতে যায়। সুখদেবের খাওয়া হয় নি। মাধব মুখ ধুয়ে ফিরে এসে বলে 'শোন সুখা, ভাল করে শোন। কাল মুদের মিছিল আছে। কইলকাতায় যেতি হবে। ধান রইল। নজর দিবি। এক রেতেই অনেক কাণ্ড হয়ে যায় বে সুখা। তুই ও বৌ নজর রাখবি'। সুখা বাবার কথা শোনে। আর শোনে কালু, লালু। সুখা ওদের ভাগের অংশ খেতে দেয়।

দুপুর গড়ায়। সুখদেব মাঠের দিকে রওনা হয়। পিছু পিছু কালু লালু। মাধব বিড়ি ধরায়। মাধবের বৌ এঁটো থালা বাসন সরিয়ে নিয়ে যায়। পরে একটা ছেঁড়া মাদুর পেতে দেয়। মাধব বলে, মুদের আরাম নাই রে। ধান কাটতি যেতে হবে না। ধান কাটার সময় মিছিলের ডাক দিলে মুদের খেতি। শহরের ন্যাতারা এসুব বুজে নারে সুখার মা। মোরা বুলাই-ছিলাম ধান কাটা শেষ হোক, তাপ্পর মিটিং। না ঐ শালো অবনীটা বাগরা দিলে মুদের কতায়। শালোর কোনো মতলব আছে।' এসব বলতে বলতে মাধব ছেঁড়া মাদুরে গা এলিয়ে দেয়। তারপর বলে, ''খেয়ে নে না। তারপর আয়। তুইও আমার পাশে শো। এখুনতো পেটে কিছু না কিছু দানা পানি পড়ে। দানাপানি পড়লেই আদুর করতে ইচ্ছে জাগে রে সুখার মা। আয় না। কাছে আয়।''

সতেজ দুপুর হাসে। মাধবের বৌ-এর মুখে এখন সেই হাসি।

॥ তিন ॥

রোদ্দুর কিরণ ছড়াচ্ছে। নারকেল, তাল, বট, অশথ, এসব গাছের ফাঁক-ফোকোরের ভিতর দিয়ে সকালের সোনা সোনা রোদ্দুর গলে গলে ছড়িয়ে পড়েছে পাকাধানের খেতের উপর, গাঁয়ের মানুষের বাড়ির গোবর ছড়ানো সাদা মাটির উঠোনে। গায়ের মানুষ জড়ো হয়েছে অবনীভূষণের পাকা বাড়ির সামনে বিশাল বুড়ো বটগাছটার তলায়। ঝাণ্ডা নিয়ে সবাই আসছে।

অনেক জীর্ণ ঘরের শীর্ণ বৌরাও এই মিছিলে যোগ দেয়। নীলকণ্ঠ এদের নেতৃত্ব দেয়। অবনীভূষণও যায়। সে ওদের দলের লোকদের একত্রিত করছে। আজ বিকেল ৫টায় কলকাতার শহীদ মিনারে মিটিং। মিটিং শেষ হলে যে যার ঘরে ফিরে যাবে। মাধবের গ্রামের লোকদের ফিরতে ফিরতে ভোর হয়ে যাবে। মাধবের ভয় দূর হয় না। হয়তো এ রাতেই ধান সরিয়ে নেবে অবনীভূষণ। যদিও মাঠ পাহারা চালু হয়েছে। কিন্তু আজ সবাই মিটিং-এ যোগ দিচ্ছে। মাসে মাসে মাঠ পাহারার জন্য মাধবকেও চাঁদা দিতে হয়। মাঠ পাহারার সেক্রেটারি নীলকণ্ঠ। সেও আজ মাধবদের দলটাকে নেতৃত্ব দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। একমাত্র অবনীভূষণের দলের লোকেরাই আজ মাঠ পাহারায় থাকবে। পঞ্চায়েত এটাই ঠিক করে দিয়েছে। মাধব এর মধ্যে মতলব খুঁজে পায়। সে নীলকণ্ঠকে সব বলেছে। বলেছে 'দ্যাখ বাবা নীলু, মাঠ পাহারার ব্যাপারটায় খুব মনে সন্দ হচ্ছে। মুদের একজন থাকলি হতো।'

নীলু উত্তর দেয়—'এ মিছিল সকল নেতারা ডাক দিয়েছে। সবাইকে না গেলে চলবে কেন? যদি ধানচুরির ব্যাপার ঘটে আমরা লড়বো। তাছাড়া ধান কাটার মরশুম বলে আমরা তো ডেট বদলে দিয়েছি, তুমি কেন ওতো ভাবছো মাধবদা? চলতো লাইন ধরে এগোও। সাড়ে নটাব ট্রেনটা ধ তে হবে।'

মাধব শেষবারের মত সুখা আর সুখার মাকে বুঝিয়ে দিচ্ছে, সাবধান করে দিচ্ছে। লাইন ধবার আগে কালু আর লালুকে আদর করতে ভুলে যায় না। কালু লালু আদর পেয়ে ল্যাজ নাড়ে। আর তখনই গ্রামের বাতাসে ধাক্কা মারে নীলকণ্ঠের গলার আওয়াজ……

॥ চার ॥

বিকেলে জটলা হয়। শিশুদের জটলা, বলা ভাল বালকদের। ওরা সব সুখার বন্ধু। যেমন—নিত্য প্রামানিকের ছেলে রসময়, লুৎফর মিঞার ছেলে বশীর, কালিদাস পাঁজার ছেলে কাজল, আর আছে কালু-লালু। ওদের সাথে যোগ দেয় আরও দুটি ছেলে। ছেলে দুটি জেলে পাড়ায় থাকে। এক-জনের নাম গদাই অপরজনের নাম নাটা। এই ছ জনের জটলা। তরুণ

বাহিনীর মিটিং। ওদের নিয়ে বড়রা মাথা ঘামায় না। সুখা বলে ওদেরকে 'আজ রাত জাগবি ? বড়রা যেমন পাহারা দেয়, পাহারা দিবি ধানখেতে ?'

কালিদাস পাঁজার ছেলে বলে—'ঠিক বলেছিস সুখা। তুর মাথায় বুদ্ধি আছে বটে। গ্রামের বড়রা সবাই মিছিলে গিছে। আজ আমরাই বেতে পাহারায় যাব।' নিত্য প্রামানিকের ছেলে রসময় গম্ভীর হয়ে জানায়. 'বড় দুজন ঠিক হয়েছে। ওরাই আজ মাঠ পাহারায় থাকবে।

বশীর রসময়কে জানিয়ে দেয়—'দুজনে পাহারা হয় ? বড়রা ছ'জন মিলে মাঠ পাহাবায় যায়। আজ আমরা সবাই মিলে পাহারায় যাব।'

রসময় পুনরায় বলে—'আমাদের ধান অন্য গাঁয়ের নোকরা এসে চুরি করে নিয়ে যেতে পারে। আমরা থাকতে এ হতি দিব না. কি বলিস্ ?'

'তাহলে শোন বলি'—সুখা আরম্ভ করে—'একটা করে লম্বা লাঠি নিতে হবে। আর রেতে উখানে গাছের উপর দুজন ঘুমাবো, তিনজন জেগে থাকবো। বুঝলি ?' কাজল শুনে উত্তর দেয়, –'চোর এলে ওদের ডেকে তুলবো। তারপর ছ জনে ছটা লাঠি নিয়ে অন্ধকারের ভিতর দিয়ে গিয়ে ছ দিক থিকে তাড়া করবো।'

জগাই আর নাটা বলে— আমরা জাপ্‌টে ধরি থাকবো, আর তুরা লাঠি দি মারতি নেগে যাবি—কিন্তু মুদের যে লাঠি নেই।'

সুখা জগাই আর নাটাক আশা দিয়ে বলে—'বাবার দুখানা লাঠি। একটা তুদের আমি দিব।'

এই ছজনে নিজেদের মধ্যে কথাবার্তায় এতই মগ্ন ছিল যে, ওদের কারোরই মনে নেই কালু-লালুর কথা। তখনই ওদের খেয়াল হল, যখন কালু-লালু ক্যাউ ক্যাউ করে উঠল। সুখা দেখল কালু-লালু ওদের দিকে মুখ তুলে ল্যাজ নাড়ছে। ওদের দুজনকে দুই বগলে নিয়ে সুখা বললো—'কানা-খোঁড়াও আমাদের সাথে রেতের বেলায় মাঠে যাবে। কিরে যাবি তো ? আবার ঘুমিয়ে পড়বি না তো ?'

কুকুর দুটো কুঁই কুঁই শব্দ করে সম্মতি জানায়।

পাখিরা কুলায় ফেরে, গরুরা গোয়ালে। ছেলেরা ঘরে ফেরে। হাঁসেরা হাঁসালয়ে। দিন যায়, সন্ধ্যা হয়।

সুখার মা কুপি জ্বালায়। সুখা পড়তে বসে। কালু-লালু দাওয়ায় ঝিমোয়। সুখা পড়ে, পড়তে পড়তে ভাবে। সুখা ভাবে, ভাবতে ভাবতে পড়ে। এমনি করে রাত হয়। সুখার মা রুটি খেতে দেয়। ডাক শোনা যায়। বশীর ডাকে—'সুখা'। সবাই এক এক করে আসে। অল্প স্বল্প গল্প হয়। সুখার শুকনো রুটি চিবোনো শেষ হয়।

ছয় তরুণ বাহিনী হাতে লাঠি নিয়ে বের হয়। পিছু পিছু কালু-লালু।

আঁধার গ্রাস করা গ্রাম। মুখে ওদের কথা নেই। হাটায় ওদের শব্দ নেই। প্রাকৃতিক কোন শব্দ নেই। পথ চেনা. বাবার জমি আরও চেনা। বশীর. কাজল --এরাও ভাগচাষীর ছেলে। এদেরও ঝামেলা অনেক। যতো ঝামেলা পাকায় অবনীভূষণ। গ্রামে অবনীভূষণের জমি সবার চেয়ে বেশী, নামে এবং বেনামে। একজনকে দিয়ে চাষ করায় না। মজুরি দিয়েও চাষ করায়।

অবনীভূষণ কাউকে ভয় পায় না। ভয় পেলে এত সম্পত্তি নামে-বেনামে ধরে রাখতে পারতো না। সে শুধু ভয় পায় নিয়তিকে, ঈশ্বরকে। ঘরের দেবতা নারায়ণীকে। হ্যাঁ, অবনীভূষণ আরও একবার ভয় পেয়েছিল সত্তর সালে। ভয় পেয়েছিল সত্তর সালের সন্ত্রাসকে। সে সময় লাশটাই পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল।

হ্যাঁ, যে কথা বলছিলাম। নিয়তি বাম। এখন মাধব তার বংশের পলতে পেয়েছে। এই সুখা। সুখা চলছে বংশের দাবি রক্ষা করতে। জমি ছাড়া করতে পারবো নাকো বাবুরা। চাষ আমরা করবোই। ধান আমরা তুলবোই। সুখারা গিয়ে পেঁছিয় জমির ধারে। জমির ধারে বুড়া আমগাছ। অবনীবাবুদেরই আমগাছ। ওরা বসে।

'জানিস্' গল্প শুরু করে বশীর। 'আমার ঠাকুর্দা রেতের বেলায় তার লোকজন নিয়ে মেরে এয়েছিল জমিদারের লাঠিয়ালকে।'

কাজল প্রশ্ন করে, 'কেন মারতি গিয়েছিল ?'

'শুন, তাহলে বলি,' বলেই বশীর শুরু করে। 'ঠাকুর্দার আমলে আমাদের নোকেরা একটা আন্দোলন করেছিল। যদি জমিদাররা জমির আন্দেক না দেয়, তাহলি তিনভাগের দুভাগ ধান দিতে হবে। উতে জমিদাররা রাজি হয় নি। অবনীকাকুর বাবাও রাজি হয় নি।

সেবার জল হয়েছিল অনেক। চাষ তো হলো। অনেক ধান হল। এবার ধান তোলার পালা। অনেক জমিতে পার্টির লোক লাল নিশান পুতে দিয়েছিল। আগে জমিদাররা জমির খরচ না দিলে চাষীরা আন্দেক ধান পেত। সেই আন্দেক ধানই আমার ঠাকুর্দাকে জমিদার দিতে চেয়েছিল। কিন্তু রাজি হয়নি। জমিদারের লোক লাঠিয়াল নিয়ে ধান তুলতে গেল। পারলো না। মুদের নোক আটকে দিল। তারপর একদিন শহর থেকে গুণ্ডা নি এলো। বাবা ছিল তখুন ছোট। তখন মুদের বয়সের ছেলেরা সব সংবাদ দিত পার্টির নোকেদের। এভাবেই দলের নোক গোপনে জানতি পারলো গ্রামের জমিদাররা শহর থেকে গুণ্ডা এনেছে। আর যায় কুতা। তখুনি ঠাকুরদার নোকজন লাঠি বর্শা এসব দিয়ে গুণ্ডা মারতি চলি গেল। পরদিন সকাল বেলায় সকলে দেখলো একটা গুণ্ডা মরে পড়ে আছে। আর সবাই পালিয়ে গিয়েছিল। পুলিস এয়েছিল, জমিদার এয়েছিল। গ্রামে

গ্রামে অনেক সন্ত্রাস হয়েছিল। কিন্তু কেউ জানীত বুঝিতে পারলো না, কি করে মারা গেল? কারা মারলো।'

'এটাতো তেভাগা আন্দোলনের গল্প? তাইতো বশীর?'—কাজল প্রশ্ন করলে বশীর জানতে চায়—'তুকে কে বইল্লে রে?'

কাজল উত্তর দেয়, 'নীলকণ্ঠদা। নীলকণ্ঠদা এরকম গল্প অনেক বুইলতে পারে। তালে শুন আমি বুইলছি। সে অনেকদিন আগের লড়াই। তখুন ইংরেজরা মুদের দেশ শাসন করতো। একবার বন্যা হলো। ধান নষ্ট হইয়ে গেল। জমিদারতো আর খাজনা দিতে পারে না। ইংরেজদের রাগ হয়। সত্যি কতা বললে ইংরেজদের রাগ হয়। সত্যি কতা বুলতে কি, জমিদাররা মিথ্যা কতা বললে ইংরেজদের। জমিদার কিন্তু খাজনা আদায় করেছিল মুদের নোকদের, যারা জমি চাষ করতো তাদের কাছ থেকে। জোর করে আদায়, মেরে ধরে আদায়। আমাদের পুর্বো পুরুষেরা ছেলেমেয়ে বেচে দিলে। তারপর জমিদারের খাজনা শোধ দিলে। সবাই কি আর দিতে পাবলো। তারা মরলো। এরাও মরলো না খেযে। সাবা রাজ্যে অভাব, দুভিক্ষে ভরে গেল। চারটাকায় ছেলেপুলে বেচে দিত। একজন জমিদার ছেলো। তার নাম ছেলো যুগোলকিশোর রায়চৌধুরী। সি তো চাষীদের অনেক ঘর আগুন ধইরে দিয়েছে, চাষীরা নালিশ জানায়। জানালে কি হবে? ইংরেজ নোকরা ধইবে, ধইরে আবার ছেড়ে দেয়। যুগোলকিশোর আরও মারধর করে।'

জগাই আর নাটা একসাথে বলে—'মুদের নোক কিছু বুলছে না।' কাজল উত্তর দেয়—'বুলছে, বুলছে, ওবা এমন শয়তান। একবার প্রজারা খাজনা দিলে। কাগজ পত্র সই হলো। কিন্তু শয়তানরা কাগজপত্র গোপন কইবে বললে প্রজারা খাজনা দেয় না। তখুনি লড়াই বাঁধলো, সে কি লড়াই। জমিদাররা মরতে নাগলো। ইংরেজরা পালাতে নাগলো। মুদেব জয় হল।'

সুখা বললে—কুতায় লড়াইটা হল বলতো?

কাজল—সে নামটা আমি ভুইলে গেছি। মনে নেইকো।

সুখা—বাংলা দেশে ময়মনসিং।

এমনি সময়ে হঠাৎ ওদের নজরে আসে কালু লালু ক্যাউ ক্যাউ করে করতে ছুটছে। ওবাও দূরে তিন চারটে ছায়া দেখতে পেল।

সুখা বললো—পাঁচজন পাঁচ দিক দিয়ে গিয়ে উদের ধবতে হবে। সাবধানে ছুটু দে।

ওরা পাঁচ দিকে ছড়িয়ে পড়লো। অন্ধকারে ওদের চেনা গেল না। সুখা, কালু লালু সেদিকে ছুট দিল। মাধবের জমির মধ্যে চারটি লোক ঢুকে পড়েছে। কালু লালু দুজনের লুঙি কামড়ে ধরেছে।

ওরা দুজন কালু-লালুকে ছাড়াবার চেষ্টা করছে। লাঠির আঘাত

করছে। কালু-লালু লুঙি ছেড়ে পা কামড়ে ধরলো। ওরা যন্ত্রণায় ছটফট করছে। অন্ধকারে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। ওদের দলের অন্য দুজন মাধবের ধান তুলছে আর ঠিক সে সময় চার তরুণের বাহিনী লাঠি নিয়ে আচমকা অন্ধকারে ওদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। কালু লালু ধান চোরের লাঠির আঘাত সহ্য করতে না পেরে পা ছেড়ে দিল। ছেড়ে দিতেই দুজন ধান চোর পালাবার জন্য ছুটতে লাগলো। কালু লালু ক্যাঁউ ক্যাঁউ করতে করতে পুনরায় পিছুপিছু ছোটে। বাকী দুচোর ধান রেখে পালায়। লাঠির আঘাতে যন্ত্রণা উপচে পড়ে মাথায়। মাথায় হাত দিয়ে চেপে ধরে ছুট্ লাগায় তবু ওরা।

একটা ক্রোধের রাত এমনি ভাবে শেষ হয়। মোরগ ডাকে। সূর্য চোখ খোলে। পাঁচ কিশোর জাগে। না, গরিবের ধান ওরা নিয়ে যেতে পারে নি। দূরে স্টেশনের পথের দিকে তাকায়। নীলকণ্ঠ তার দলবল নিয়ে তখন মিছিল থেকে ফিরছে।

□□□ একটা এ্যালসেসিয়ানও বোঝে □□□

প্রিয় ভারতবর্ষে অনেক জমানো সমস্যা আছে। ওসবের মধ্যে শিশু-শ্রম সমস্যা নিয়ে ভাবা যেতে পারে। ইট-ভাটায়, চায়ের দোকানে, মিষ্টির দোকানে, ছোট-খাটো কারখানায়, গলিতে বস্তিতে নানারকম কাজে শিশুদের শ্রম বিক্রি করতে হয়। এসব নিয়ে আলোচনা চলছে এন. রায়ের বাড়ির তিনতলায় রঙিন টিভির ৫১ সি. এম স্ক্রিনে। আলোচনা করছেন নাগেশ্বর রায়, সুন্দর চক্রবর্তী এবং লতিকা মণ্ডল। সমাজতাত্ত্বিক নাগেশ্বর রায় এখন নিজের ঘরে বসে নিজেকে দেখছেন রঙিন টিভির স্ক্রিনে। পাশে স্ত্রী, বয়কাট হেয়ার। ঘরভর্তি লোক। থাকাটাই স্বাভাবিক। বড়ছেলে ও বড়ছেলের স্ত্রী, তাদের হামু দো এবং হামারা দো. অবশ্যই ছেলে এবং মেয়ে। ছোটছেলে ভাল ফুটবল খেলে বি-ডিভিশনে এবং ওর বান্ধবি। এন রায়ের বড়মেয়ে এবং ওর স্বামী। স্বামীর ঐ এক কথা ছেলে যখন এম. এসসি পড়বে তখন ভাববেন টেলিরামা, না সোনোডাইন, না ক্রাউন। ভাববেন সাদাকালো, না রঙিন। এখন শ্বশুর-বাড়িতে আসে, কখন কখনও।

বাসুদেবের প্রতি পরিবারের আচরণবিধি।

বাসুদেব এক গ্লাস জল দিয়ে যা ; এক প্যাকেট রিজেন্ট কিং কানুদার দোকান থেকে, লিখে রাখতে বলবি ; আমার জন্য একটা পান, একশবিশ জর্দা দিতে বলবি ; এক প্যাকেট পানপরাগ জর্দা ছাড়া ; বাসুদেব ছাদ থেকে শুকনো জামা-কাপড় নামিয়ে এনেছিস তো ; জিমিকে হাগাতে নিয়ে যা ; টবে ভাল করে জল দিবি ; ফুলগুলো শুকিয়ে যাচ্ছে ; আবার ছ'কাপ চা করে নিয়ে আয়, চিনি কম দিবি ; দোতলা একতলার ঘরগুলো ভাল করে মুছেছিসতো ; একতলার কলে বাসনগুলো নিয়ে যা, আজ আর কাজের মেয়েটা আসবে না ; এগারোটা কাটলেট নিয়ে আয়, জিমির জন্য একটা পরোটা, সুবলের দোকান থেকে আনবি। এতোসব ঠান্ডা-গরম আদেশ এগারো বছরের বাসুদেবের কান দিয়ে মাথায়, মাথা থেকে তলপেটে এবং সেখান থেকে পাক খেতে খেতে এক সময় বাসুদেবের নিভু নিভু খিদেকে উসকে দেয়।

টিভির পর্দায় শিশু-শ্রমিকদের ছবি এবং কথাবার্তা।

আমাদের মনে হয় শিশু কল্যাণ সমিতি গঠনের ভিতর দিয়ে শিশু শ্রমিকদের সমস্যার সমাধান সম্ভব। আপনার কি মনে হয় মিঃ রয় ?

আমারতো মনে হয় শিশু-শ্রমিক শোষণ একটা মারাত্মক ব্যাধি। তৃতীয় বিশ্বে বিশেষ করে আফ্রিকায়, সংক্রামক রোগের মতো ছড়িয়ে পড়ছে। এর মূল কারণ তিনটি। একটা আঙুলটেনে দারিদ্রতা, দুটি আঙুলটেনে নিরাপত্তার অভাব, তিনটি আঙুলটেনে অমানবিকতা—এভাবেই কথা বলেন নাগেশ্বর রায়।

লতিকা মণ্ডল—ঠিক বলেছেন অমানবিকতা। এই মুহূর্তে আমার মনে পড়ছে অস্কার ওয়াইল্ড-এর কথা "Children are the most beautiful flowers of all." সেলফিস্ জায়েণ্ট-এ পড়েছিলাম। সেলফিস্ জায়েণ্টের সেলফিসনেস কেটে গিয়েছিল। কিন্তু আমাদের সমাজের ঐসব লোকদের যারা শিশুদের শ্রম সস্তা দরে কিনে নিয়ে দ্বিগুণ তিনগুণ মুনাফা করছে তাদের সেলফিসনেস কাটেনি। মিঃ নাগেশ্বর রায় উত্তর দিলেন: ঠিকই বলেছেন মিসেস মণ্ডল।

মিঃ এন রায়, নাগেশ্বর রায় এ বাড়ির সবার বাবা। জিন্সের প্যাণ্টপরা জামাই বললেন,'আপনি অরবিন্দ বা বিবেকানন্দ কোট করতে পারতেন।' সরকারি অফিসার আর রায় এ বাড়ির বড়ছেলে ঘরের আলোচনায় যোগ দিয়ে বলেন, 'আপনি তো বাবা, মাকর্স বা লেনিন কারোরই উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটা বোঝালেন না। তবু সুনন্দ চক্রবর্তী কিছুটা বললেন।' ছোটছেলে আর চুপ করে থাকতে পারলো না, বললে—'তবে টিভির কর্তৃপক্ষ আপনাকে গুরুত্ব দিয়েছে বেশি।' বড়ছেলের স্ত্রী সুনেত্রা ফ্যাশন্ড্ ফেস্ড, বলেন, 'আপনি ঠিকই বলেছেন বাবা। টিভির অল্প সময়ের মধ্যে বেশি কথা বলা যায় না।' যাকে নিয়ে এত কথা তিনি নাগেশ্বর রায়, চুপ। একমাত্র বাসুদেবকে মাঝে-মধ্যে আদেশ করছেন। তবে বাসুদেব এতোসব আদেশের মধ্যে কোন্টা নাগেশ্বর রায়ের আদেশ সেটা বেছে নিতে পারে না।

বাসুদেবের প্রতি পরিবারের আচরণবিধি।

বাসুদেব পিঠটা টিপে দিয়ে যা, হয়ে গেলে বাসুদেব আমার পা-টা, খেলে খেলে বড্ড টনাচ্ছে, হয়ে গেলে আমার হাতটা, হয়ে গেলে আমার কোমরটা, হয়ে গেলে আমার কয়েকটা পাকাচুল তুলে দিবি, হয়ে গেলে আমার হাতপায়ের আঙুলগুলো টেনে দিবি। কোন্টা মেয়েদের গলা এবং কার গলা, কোন্টা ছেলেদের গলা এবং কার গলা, বাসুদেব সারাক্ষণ কাজের ভিতর দিয়ে বুঝে উঠতে পারে না।

'শিশু-শ্রম এবং তার প্রতিকার' টিভির এই পনেরো মিনিটের প্রোগ্রামটি শেষ হতেই ছোটছেলে নব ঘুরিয়ে বাঙলাদেশ নিয়ে আসে। আর তখন চার্লি চ্যাপলিনের 'দ্য কিড' ফিল্মটি দেখানো হচ্ছে সেখানে। নাগেশ্বরের স্ত্রী অলকা

বলেন জামাইকে, 'আজ তোমরা থেকে যাও। ভালো বইটা মিস্ করো না। শাস্তারও দেখা উচিত।' কন্যা শাস্তাও হাসব্যান্ডকে রাজি করায়।

টিভির পর্দায় 'দ্যা কিড।'

কেনিংটন বস্তির লাঞ্ছিত জীবনযাত্রা, দাতব্য হাসপাতাল থেকে প্রসবিত্ত শিশুকে কোলে নিয়ে মহিলার বের হয়ে আসা, গীর্জায় আসা বুড়ো এবং অল্প-বয়েসী কনের গাড়িতে প্রসবিত শিশুকে ফেলে মহিলার পালিয়ে যাওয়া, ঐ গাড়ি নিয়ে চোরদের পালানো এবং আবর্জনার স্তূপে শিশুটিকে ফেলে দিয়ে চলে যাওয়া, তারপর চার্লির আগমন এবং কান্নার শব্দ ধরে আবর্জনার স্তূপের কাছে গিয়ে শিশুটাকে বের করে আনা, শিশুর গলায় লটকানো 'শিশুটির প্রতি দয়া-পরবশ হোন' লেখাটি পড়ে চার্লির বাঁচার অস্তিত্বকে ধরে টান মারা এবং শিশুটিকে নিয়ে বস্তিতে ফিরে এসে নোংরা পরিবেশে প্রাঞ্জল ভালবাসা দিয়ে শিশুটিকে আগলে রাখা, তারপর শিশুটির বড় হয়ে ওঠা এবং বাসুদেবের বয়সের কাছাকাছি চলে আসা—এই পর্যন্ত দেখে ঘরের লোকজন খুব একটা চুপচাপ বসেছিল না।

জিমির মুখের দিকে কাটলেট ছুঁড়ে মারা, চার্লি চ্যাপলিনের অভিনয়ের প্রশংসা করা, শিশু চরিত্রে জ্যাকি কুগানের অভিনয়ের খুঁটিনাটি আলোচনায় Chaplinesque ধারার চুলচেরা বিচার, চলচ্চিত্রে চার্লির শিল্পগুণ বা বিষয়বস্তু নিয়ে বিশ্লেষণ, 'বাস্তব থেকে পলায়ন' শিশুত্বে ফিরে যাওয়া, ইত্যাদি যুক্তি তক্কো এবং সের্গেই আইজেনস্টাইন-এর লেখা কোট করে চ্যাপলিনের উক্তি 'আমি ওদের ঘেন্না করি—ঐ বাচ্চাগুলোকে।' তা শুনে স্টেটিস্টিক্স্ তুলে ধরা যে 'দ্য কিড' দেখে পৃথিবীর পাঁচ ভাগের দু ভাগ লোকই চোখের জল ফেলেছে তারই স্রষ্টা নাকি শিশু ভালবাসে না। এসব চলমান কথাবার্তার মাঝেই নাগেশ্বরের পরিবারের কুকুর জিমির মুখে আপেলের টুকরো ছুঁড়ে দেওয়া, কাটলেটের টুকরো ছুঁড়ে দেওয়া এবং জিমির চিবানোর দিকে বাসুদেবের চেয়ে থাকা, শুধুই চেয়ে চেয়ে দেখা, এইসব চলছিল যতক্ষণ না এই দৃশ্যটি এলে দেখা গেল চ্যাপলিনের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে ধস্তাধস্তি করে টেনেহিচড়ে পুলিশ কুগানকে তুললো অনাথ আশ্রমের গাড়িতে, আর কুগান মরিয়া হয়ে হাত পা ছুঁড়তে লাগলো। চার্লি ছাদের পর ছাদ ডিঙিয়ে পুলিশকে ঠকিয়ে লাফিয়ে পড়ল চলন্ত গাড়ির ছাদে। অনাথ আশ্রমের বাবুটিকে গাড়ি থেকে ফেলে দিয়ে জড়িয়ে ধরলো হারানো ছেলেকে। ড্রাইভার গাড়ি থামায়, দ্যাখে চার্লির বুকে লেপ্টে রয়েছে জ্যাকি কুগান। দুজনেরই গাল বেয়ে জল ঝড়ছে। এই দৃশ্যই এনে দিল ঘরের ভিতর দুঃখের শীতল হাওয়া। পরিবাবের সবাই যেন সেই মুহূর্তে শোক-দিবসের মতো দুমিনিট চুপচাপ, সুনসান।

বাসুদেবের প্রতি পরিবারের আচরণবিধি।

একমাত্র এগারো বছরের বাসুদেব তিন ঘণ্টার মধ্যে খোকাখুকি থেকে বুড়ো-বুড়ি পর্যন্ত প্রত্যেকের আদেশ পালন করতে গিয়ে তিনতলা থেকে একতলা, একতলা থেকে তিনতলা, তিনতলা থেকে ছাদে, ছাদ থেকে দোতলা, দোতলা থেকে একতলা, একতলা থেকে আবার তিনতলা, তিনতলা থেকে আবার একতলা, একতলা থেকে রাস্তায়, রাস্তা থেকে গলি পেরিয়ে দোকানে, দোকান থেকে তিনতলা, এভাবেই নামছে উঠছে, উঠছে নামছে। জিমির খাওয়া দেখে দেখে, ঘরের ভিতর মানুষজনের খাওয়া দেখে দেখে এগারো বছরের বাসুদেব নিজের খিদেটাকে চেপে রাখতে পারে না। পারে না বলেই এই চিন্তাটাও তার মাথায় এসে যায়, ওকে যদি কেউ এক টুকরো কাটলেট বা আপেল ছুঁড়ে দিত তাহলে সেও জিমির মত মুখ বাড়িয়ে লুফে নিতে পারতো। কারণ বাসুদেব ছোটবেলায় হাট থেকে ছোলা কিনে একটা উপরে ছুঁড়ে দিয়ে মুখ আকাশের দিকে তুলে ছোলাটি মুখে লুফে নিতো। একটাও মাটিতে পড়তে দিতো না। সর্বোসাকুল্যে তিনতলা তিনতলা তিনতলা এমনি করে সারাদিনের ওঠানামা যোগ দিলে পনেরোতলা, এই এগারো বছরের বাসুদেব নামক অনাথ শিশুটি পেটের দায়ে কাজ করতে নেমে ওঠানামা করে। অতএব প্রচণ্ড এক পাশব খিদে তাকে চূড়ান্তভাবে ধর্ষণ করতেই পারে।

সারাদিন বাসুদেব কি খায়? বাবার গলায় কে যেন বলে, বাসুদেব হিসেব দে তো। সকালে এক কাপ চা। দামি চা নয়। দুটো বাসি রুটি বা কপালে থাকলে বাসি লুচি। আসলে বাসুদেবের কপাল নির্ভর করে বাড়ির কত্তামশাইদের উপর। দুপুরে রেশনের আতপ চাল একমাত্র বাসুদেবের জন্য, এবং আতপ চালের উপকারিতা নিয়ে বাসুদেবকে উপদেশ গেলানো। বাসুদেবের জন্য আলাদা কিনে আনা কম দামের আধপচা মাছ। বাবুদের সেদ্ধচালের সুগন্ধ বাসুদেবের খিদে বাড়িয়ে দেয়, ইলিশমাছের সুগন্ধ বাসুদেবের খিদেকে আরও বাড়িয়ে দেয়। গরম গরম লুচির সাথে রাত্রের কষামাংসের গন্ধ পেয়ে বাসুদেবের খিদে দাপটের সাথে ওর শরীরে চলা ফেরা করে। বাসুদেব খিদে রুখতে পারে না, খালি ভাবে নিজের খাবার রুটি আর তরকারি কখন খাবে।

এমন কি ওরা যখন জিমিকে আদর করে চুমু খায়, গলা জড়িয়ে ধরে গাল ঘষে, লোমের শরীরটাকে আলুথালু করে, আদরে আদরে জিমি যখন চিৎ হয়ে শুয়ে আরও আদর খেতে চায়, তখনও অনাথ বাসুদেবের খিদে পায়। স্নেহের খিদে। ছোট বেলায় কোন্ সময়ে, বাসুদেব এখন আর মনে করতে পারে না যে তার মা মারা গেছে। কে আগে গেছে মা না বাবা তাও সে মনে করতে পারে না। আসলে দানবের মতো ভয়ংকর খিদেটা বাসুদেবকে সব ভুলিয়ে দেয়। দিদির কোল ঘেসে মানুষ, বাসুদেব দিদির বে' হবার পর থেকেই

বাড়ি ছাড়া, দেশছাড়া। বাসুদেবের গ্রামটাই বাসুদেবের দেশ। গ্রামছাড়া হয়ে শহরে তিন চারটে বাড়িতে কাজ করে করে নাগেশ্বর রায়ের বাড়িতে এখন। বাড়ির কাজের কুৎসিত অভিজ্ঞতা বাসুদেবকে এমন জায়গাতে এনে ফেলেছে যে, সে স্থির করে রেখেছে একটু বড় হলেই আর বাড়ির কাজ করবে না। কারখানায় কাজ করবে এবং মিছিল করবে। বাসুদেব গরিবদের মিছিল দেখেছে। বিরাট লম্বা মিছিল উপরের দিকে মুঠো তুলে চীৎকার করছে। বাসুদেব চীৎকার করবে।

বাসুদেবকে মাঝে মাঝে মনে হয় চার্লি চ্যাপলিনের ধ্রুপদী আবিষ্কার 'দ্য কিডে'র জ্যাক কুগান। তবে জ্যাক কুগানের বাবার পরিচয় না থাক, কিন্তু মার পরিচয় আছে। একজন ভবঘুরে বয়স্ক লোকের জিরল পিতৃস্নেহ আছে। সেমত কারণেই বোধহয় এন. রায়ের ঘরের আপনজন দর্শকরা যখন দেখে টিভির পর্দায়, জ্যাক তার ধনবতী মায়ের কাছে ফিরে গেছে এবং মা তার জারজ সন্তানকে বুকে জড়িয়ে ধরেছে তখন তারা স্বস্তির নিশ্বাস নেয়। আর আমাদের বাসুদেব আরও পাথুরে বাস্তব, আরও ভাষাহীন নির্মম। কারণ তার ধনবতী মা নেই। সেখানে বাসুদেবের আগামীকালের নাগা জীবনে কঠোর শারীরিক পরিশ্রমের বিনিময়েশুধুই বেঁচে থাকা আছে। এ ধরণের চরিত্রকে নিয়ে যদি সত্যজিৎ রায় বা বাংলার তথাকথিত প্রগতিশীল তকমাধারী ফেস্টিভ্যাল সিনেমা বানিয়েরা ফিল্ম করতেন, তাহলে দেখা যেতো বাসুদেব মন্ত্র আওরাচ্ছে আর আকাশ থেকে খাবার এসে যাচ্ছে বা বাসুদেব আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপের সংশোধিত ও পরিবর্তিত সর্বশেষে সংস্করণে পরিণত হয়ে গেছে কোন বাণিজ্যিক লেখকের হাতে।

কিন্তু বাসুদেবের জীবনে তা হবার নয়। দেখা যাক্ বাসুদেবের খিদেটা বাসুদেবকে কোথায় নিয়ে যায়। রাত এখন এগারোটা। ক্লান্ত, খিদে কাতর বাসুদেব এবং মহিলা এ্যালসেসিয়ান জিমি দোতলায় রান্নাঘরে। এবার ওদের খাবারের সময়। 'দ্য কিড' শেষ, রঙিন টিভি বন্ধ। টিভি দেখতে দেখতেই রাতের লুচি মাংস খেয়ে নিয়ে একতলায় দোতলায় শুতে চলে গেছে অনেকেই। একমাত্র জেগে আছে নাগেশ্বরের স্ত্রী অলকানন্দা রায়, সংক্ষেপে অলকা রায় এবং তার বড়ছেলে রমেন রায়। জিমি খেয়ে এলেই এরা যে যার ঘরে শুতে যাবে। জিমির গদির বিছানা ঝেড়ে দিচ্ছে অলকা রায়। তারপর টানিয়ে দেবে জিমির মশারি। রান্নাঘরে বাসুদেব তখনও মুখে খাবার তুলতে পারেনি। কারণ জিমি ওর থালাভর্তি মাংস মাখা ভাত খাচ্ছে না। সে একদৃষ্টে তাকিয়ে বাসুদেবের দিকে। সেই দৃষ্টিতে ক্রোধ নেই, হিংসে নেই। আছে বাসুদেবের মায়ের মতো স্নেহ মাখানো দৃষ্টি। বাসুদেবের কণ্ঠে জোর নেই, তবু বলে—'কি রে খাবি নি। খেগে যা। আমার যে খিদে নেগেছে।' বলেই বাসুদেব হাফ রুটি তরকারি এবং আলুভাজা দিয়ে দেড় মিনিটেই খেয়ে

নেয়। কিন্তু খিদে মরে না। জিমি খায় না। একবারটিও থালাটির দিকে জিমি মুখটা ঘোরায় না। বাসুদেব বলে, 'আমার ঘুম পেয়েছে। খে গে যা। তোর থালা বাসন মাজার পর আমার ছুটি। আবার সেই ভোর পাঁচটায়।'… জিমি খায় না। বাসুদেবের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। বাসুদেবও মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। বাসুদেব জিমির গলা জড়িয়ে ধরে বলে—'খাবি কি? কাটলেট খেয়েছিস। আপেল খেয়েছিস, তাই খিদেটা মরে গেছে। তালে খাবারটা আমি খাচ্ছি। দেখিস কামড়াবি নে।' বলতেই ঢুলু ঢুলু খিদেটা আবার সজাগ হয়ে উঠতেই পেটের চারপাশটা মোচড়ায়। সেজন্যই বোধহয় জিমির ষ্টিলের থালা দেখেও ওর মনে পড়ে না যে বাসুদেব এ্যালুমিনিয়ামের থালায় ভাত খায়। বাসুদেব জিমির চোখের দিকে চোখ রেখে আস্তে আস্তে ষ্টিলের থালার দিকে হাত বাড়ায়। বিশাল চেহারার মাদি জিমির চাহনিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্নেহকণা চিক্ চিক্ করছে। জিমি কুঁই কুঁই শব্দ করে। জিমির মুখের ভাষা শুনে বাসুদেবের মনে হয় জিমি বলছে 'খা খোকা, খা। চটপট খেয়ে নে। ওরা এসে যাবেখন।'

জিমির না-থামা কুঁই কুঁই শব্দ শুনে বড়ছেলে ঠিক এসে যায়। এসে দেখে বাসুদেব জিমির থালা থেকে গোগ্রাসে মাংসের ছাটের ঝোল মাখা ভাত গিলে খাচ্ছে। এই দৃশ্য দেখে বড়ছেলে ক্রোধের উত্তাপ সহ্য করতে না পেরে পা থেকে স্লিপার খুলে বাসুদেবকে মারতে যেতেই জিমি বড়ছেলের হাতটা মুখ দিয়ে চেপে ধরে। অল্প কয়েকটি ঝোল মাখা ভাত তখনও থালায় ছিল। বড় ছেলের হাতে বাসুদেব অনেকবারই মার খেয়েছে। ভয় না পেয়ে বাসুদেব অল্প কয়েকটি তখনও রয়ে যাওয়া ভাত খেয়ে থালাটা হাতে নিয়ে একতলায় নামতে নামতে বলে 'তোমরা সেদ্ধ চাল খাও, আমাকে পচা আতপ দাও কেন? তোমরা ভাল ভাল মাছ মাংস খাও আমাকে কুচো পচা চিংড়ি দাও কেন? তোমরা রাত্তির বেলায় লুচি কষা মাংস খাও, আমাকে রুটি দাও কেন? তোমরা, এমনকি জিমিরও মশারি টানাও, আমাকে মশারি দাও না কেন? আমরা বেশি করে ভাত খাব বলেই তো দিন ভোর খাটি। বেশি করে খেতে দাও কই? থাকবো নি তোমাদের ঘরে। এই চললুম'—বলেই ষ্টিলের থালাটা ছুঁড়ে ফেলে তিনতলা বাড়িটাকে প্রচণ্ড শব্দে কাঁপিয়ে দিয়ে দরজা খুলে বাসুদেব রাতের লক্ষ্মী জোছনায় মিলিয়ে যায়। ছুঁড়ে ফেলা ষ্টিলের থালার প্রচণ্ড শব্দে তিনতলা বাড়িটা তখনও কাঁপছে।

□□□ জ্যোতিষ গণনা □□□

মেসোমশাই, এই মিহির। আসতে চাইছিল না। জোর করে নিয়ে এলাম। কিছুতেই বিয়ে করতে চাইছে না। বলছে পরে ভাবা যাবে।

মেসোমশাই মিহিরের দিকে তাকায়। মিহিরের প্রশ্ন শোনে।

আমাকে প্রশ্ন করার আগে আমার একটি ছোট্ট প্রশ্নের জবাব দেবেন মেসোমশায়। ভাগ্য কি বলুন।

গ্রহ প্রভাবিত অদৃষ্ট শক্তি।

আমার চাকরি পাওয়া, না পাওয়া সেই অদৃষ্ট শক্তির উপর নির্ভর করবে কেন? নির্ভর তো করে একটা সোস্যাল প্রসেসের উপর।

সেই প্রসেসটা ভাগ্য গুণে বলা যায়।

এবসার্ড। এবসারডিটির ওপর কোন কিছুই গণনা চলে না। ওটা অবৈজ্ঞানিক।

মিহির প্লিজ, আমি তোমাকে মেসোমশাইর কাছে নিয়ে এলাম। উনি একজন বয়স্ক লোক। বড় জ্যোতিষ মনে রেখো—

আচ্ছা রুপা, আমি চুপ করলাম। বলুন, আপনি কি জানতে চান?

আপনি কি খাবার ভালবাসেন?

চিকেন বিরিয়ানি।

আপনি কোথায় থাকতে ভালবাসেন?

দক্ষিণখোলা দোতলায় তিন রুমের ফ্ল্যাটে।

আপনি কি রকম চাকরি পছন্দ করেন?

পছন্দ করি পি. আর ও, সাংবাদিকতা বা মেডিক্যাল রিপ্রেজেনটেটিভ, অধ্যাপক।

আপনি টি. ভি. চান?

চাই। রঙিন

ফ্রিজ?

চাই। বড় সাইজের অলউইন

গাড়ি?

মারুতি, ব্রাউন কালার

বাড়িতে ফোন রাখতে চান?

চাই। ইলেকট্রনিক

আপনি স্বপ্ন দেখেন?

দেখি।

কি ধরনের স্বপ্ন ?

এই মাত্র যা বললাম। রঙিন টিভি ফ্রিজ ফ্ল্যাট মারুতি টেলিফোন—

আপনি কোন্ ফুল ভালবাসেন ?

গ্র্যাণ্ড ফ্লাওয়ার

ফ্লাওয়ার নয়, ফ্লোরা। দেখেছেন ?

দেখেছি।

কোথায় ?

ছোটবেলায় জমিদারের বাগানে।

আপনি কোন্ রঙ পছন্দ করেন ?

পিকক্ ব্লু।

আপনার লক্ষ্য কি ?

আমার কোন লক্ষ্য নেই। আজকাল মিনিটের কাটার মতো লক্ষ্য ঘুরছে।

তাতে কি ?

আমরাও ঘুরছি। লক্ষ্যকে ধরতে পারছি না।

মানবিক পরিবর্তনে বিশ্বাস আছে ?

নিশ্চয়ই আছে। একঘণ্টা আগে আমি যা ছিলাম একঘণ্টা পর আমি তা থাকি না। একটু আগে একটি অন্ধ বুড়োকে আমি দশটা পয়সা দিলাম। একটু পরেই ভিড়-ঠাসা বাসে অন্ধকে ধাক্কা মেরে উঠলাম এবং কণ্ডাকটার পয়সা না চাওয়ায় আমি পঞ্চাশ পয়সা মেরে দিলাম। কিম্বা একটু আগেই নারী ধর্ষণ করলাম। আবার একটু পরেই নারীসমিতিতে বিশেষ অতিথি হয়ে নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতা নিয়ে বক্তৃতা দিয়ে এলাম। তাই তো ?

সত্য সম্পর্কে আপনার ধারণা কি ?

এখন আমি পৃথিবীতে আছি পরে আমি পৃথিবীতে থাকবো না। এটাই সত্য।

আপনি সম্পর্ক বা অস্তিত্ব মানেন ?

মানি। আমি এবং আমরা। এই দুয়ের অস্তিত্বেই আমার অস্তিত্ব। এটা সমাজের ক্ষেত্রে যেমন, ব্যক্তির ক্ষেত্রেও তেমন। এরকম সম্পর্ক বজায় রাখা উচিত। আমি হিন্দু, তাই বলে মুসলমানদের দোকান থেকে জিনিস কিনবো না ? মানবিক সম্পর্ক থেকে বিচ্ছিন্ন হবো কি করে ? সমাজ ব্যবস্থাতো পাল্টায়। একদিন আসবে যখন ধর্মই থাকবে না, মানবিক সম্পর্ক থাকবে। তবে বিশেষ এক শ্রেণী ধর্মকে টিকিয়ে রাখার জন্য লড়াই চালিয়ে যাবে।

রূপার সাথে আপনার কি রকম সম্পর্ক ?

রূপার সাথে আমার ভালবাসার সম্পর্ক, যৌনসম্পর্ক, বেঁচে থাকার

সম্পর্ক। আমাকে এভাবে প্রশ্ন করছেন কেন? একজন জোতিষীতো এভাবে প্রশ্ন করে না।

আমি শুধু জ্যোতিষী নই। একজন পাশ করা সাইকিয়াট্রিস্টও বটে। রূপা আমার শালীর একমাত্র মেয়ে। পাঁচ বছর মেলামেশা করছেন। এখনও বিয়ে করছেন না কেন? প্রোব্লেমটা আমায় বুঝতে হবে। আমিই শালীকে বলেছিলাম আপনাকে আর রূপাকে আমার কাছে পাঠাতে। কেন, আপনি কি বোর ফিল করছেন? না, ভালোই লাগছে। আর কোন প্রশ্ন?

বাবা চাকরি করেন?

করেন। বার ঘণ্টা খেটে হাজার টাকা ঘরে তোলেন?

ভাই বোন?

চারজন

কোথায় থাকেন?

কলকাতার বস্তিতে

কটা ঘর?

দুটো, ঘর নয়। খুপরি টালির

লেখাপড়া?

এম· কম পাশ। ভেবেছিলাম সি· এ পড়বো। কিন্তু অর্থের জোর ছিল না।

কোন মাসে জন্ম?

মাঘ মাসে

কোন্ দিন? কখন?

রাত ১১টা ৪৫ মিনিটে। শুক্রবার। ১৯৫৬

কোথায়?

আর. জি কর· হাসপাতালে। ফ্রি বেডে।

কিছুক্ষণ চুপচাপ। টেবিল ল্যাম্পের গোল আলোটা ছককাটা ঘরের উপর। রূপার মেসোমশাইর মোটাসোটা আঙুলগুলো নড়ছে। আঙুলের ফাঁকে দামি কলম। তিনটি আঙুলে সোনা বাঁধানো দামি পাথর। প্যাণ্টের পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করার জন্য হাত ঢোকায় মিহির। মিহিরের হাত টেবিলের তলায় চেপে ধরে রূপা। বুঝতে পেরে মিহির প্যাকেট বের করে না।

আপনি ভয় পান?

পাই।

কিসে ভয় পান?

মুচকি হাসতে।

কেন?

মুচকি হাসলে অনেক মানুষ ভুল বোঝে, ভাবে মতলববাজ।

আপনি অবাক হোন ?

একবার হয়েছিলাম। যেদিন এক ব্রাহ্মণ কন্যা চাকুরিজীবী পাত্রী এস সি. বেকার প্রিয়বন্ধুকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিল।

এস সি বন্ধু। ঠিক বুঝলাম না।

এস. সি মানে সিডুল কাস্ট। এখানে পাত্রপাত্রীটি হচ্ছে আমি আর রূপা।

সিডুল কাস্ট যখন চাকরি পাচ্ছেন না কেন ?

পাচ্ছি না দুনম্বরি সিডুল কাস্টদের জন্য।

তারা কারা ?

বামুন কায়েতরা। এ্যিভডেফিট করে পদবি পাল্টে ফেলে।

কোনদিন লটারির টিকিট কেটেছেন ?

কেটেছি

কত বছর ধরে কাটছেন ?

চার বছর

লাগেনি ?

না

টাকা কোথায় পান ?

টিউশনি করি। খাতা লিখি

আপনার কোন রোগ আছে ?

আছে। যা খাই অম্বল হয়ে যায়। আবার সেরেও যায়

কি খান ?

সকালে চা মুড়ি, দুপুরে ডালভাত আলুপোস্ত, মাঝে মধ্যে মাছ, রাতে রুটি তরকারি।

পুনরায় বিরতি।

মেসোমশাইর পেছনে মাথার উপর মা-কালীর বিরাট ছবি বাঁধানো। ছবিটার উপর একটা টিকটিকি. খানিকদূরে একটা মাকড়সার বাচ্চা। দুজনেই চুপচাপ। চৌকো ঘড়ির মিনিটের কালো কাটা লাফাচ্ছে। মেসোমশাই কি যেন লিখছেন, রূপা সেদিকে তাকিয়ে আছে। মিহির জল চায়। কলিং বেল বাজে। কাজের লোক ঢোকে। জল, শুনতে পায়। কাঁচের গ্লাসে জল আনে।

পাশ করার পর কত বছর ধরে বেকার আছেন ?

অনেক বছর।

চাকরির ইন্টারভু ?

পাই। হয় না

পরীক্ষা দিয়েছেন ?

দিয়েছি। ব্যাঙ্কে, রেলে, পি এস সি, স্টাফ সিলেকশন

আপনি কষ্ট পান ?

পাই, হাঁপানি বাবার শ্বাস কষ্ট দেখে

দুঃখ পান ?

পাই। যখন দেখি মা আমার চাকরির জন্য মায়ের মন্দিরে এখনও পুজো দিতে যান।

ঈশ্বরে বিশ্বাস আছে ?

না, নেই। মানুষের প্রতি বিশ্বাস আছে বলেই, ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস জন্মায় নি। বিবেকানন্দের কথা মতো জীবের মধ্যেই ঈশ্বর খুঁজি। তবে এখন একমাত্র রূপার কথার জন্যই মায়ের পায়ের জবাফুল পকেটে রাখি। আমি রূপাকে কষ্ট দিতে চাই না।

আপনি কি জন্ম থেকেই খোঁড়া ?

না, ছোটবেলায় গোড়ালিতে বড় ধরনের অপারেশন হয়েছিল।

কেন ? কি করেছিলেন ?

চাঁদ ধরতে গিয়েছিলাম। সুপুরি গাছের মগডালে উঠে চাঁদ ধরবো ভেবেছিলাম। পড়ে গেলাম। দাদার বকুনিতে নার্ভাস হয়ে পড়ে গেলাম।

রূপাকে বিয়ে করছেন না কেন ? এতো ভালোবাসেন। রূপাতো গবমেণ্ট সারভিস করে।

সুস্থ সবল শিক্ষিত বেটাছেলে বৌয়ের পয়সায় খাবে ? এখনও ঠিক মানিয়ে নিতে পারছি না। হয়তো ওটা একটা মেল-কমপ্লেক্স

তারমানে এ যুগের প্রগ্রেসিভ ছেলেদের মানসিক পরিবর্তন আসে নি ?

ঐ যে আগে বললাম, মেল-কমপ্লেক্স। তাছাড়া আজকে যেটা ভাবছি কালকে আমি সেটা নাও ভাবতে পারি। পরিবেশ, সময়, সমাজ পাল্টাচ্ছে, সাথে সাথে আমাদের চিন্তাভাবনাও।

খানিক চুপচাপ।

রূপা হাসে। মিহিরের কথা শেষ হতেই হাসি মিলিয়ে যায়। কালীর ফটোর দিকে মিহির তাকায়। টিকটিকিটা শিকার ধরতে পারে নি। কালীর ফটো থেকে সরে গেছে। বাচ্চা মাকড়সাটা জাল বুনে চলেছে। রূপার মেসোমশাই চিন্তিত। কি যেন লিখছেন। আঁক কষছেন।

তারপর মিহিরের দিকে হাত বাড়িয়ে বলেন, ধরেন।

কি লেখা আছে কাগজে ?

ভাগ্যের প্রেসক্রিপসন। ভাগ্য ফিরবে। বড়লোক হবেন। সামনের মাঘে বিয়ে হবেই। আমার প্রেসক্রাইবড পাথর বিফলে যায় না। রত্নগিরি জুয়েলার্স

থেকে কিনবেন, রূপা জানে। রূপা, আই উইশ ইয়র ব্রাইট ফিউচার। মিহির ব্রিলিয়াণ্ট। ভেবো না মাঘেই বিয়ে হবে।

ঘর থেকে মিহির ও রূপা বাইরে আসে। এ্যাস্ট্রোলজিক্যাল ইনস্টিটিউট লেখা সাইনবোর্ডের নিচে দাঁড়ায়। সাইনবোর্ডের মাথায় একটা কাক। কাকের নিচে মিহিরের মাথা। রূপা মিহিরকে সেখান থেকে সরিয়ে আনে। ওরা হাঁটে। গলিটা পেরিয়ে ট্রামরাস্তায় পা দিয়েই মিহির ভাগ্যের প্রেসক্রিপসনটা ছিড়ে ফেলে। তারপর টুকরো টুকরো করে। ছেড়া কাগজের টুকরোগুলো হাতের চেটোয় রেখে ফু দিয়ে উড়িয়ে দেয়। বিস্মিত রূপা এসব লক্ষ্য করে কয়েকটি শব্দ উচ্চারণ করে, 'ছিড়ে ফেল্লে? মেসোমশায়কে অসম্মান করলে?' আর কোন কথা না বলে মিহিরের পাশাপাশি নিঃশব্দে হাঁটে। মিহিরও কোন কথা না বলে রূপার কেঁচোর মতো পাঁচ আঙুলের মধ্যে নিজের বিশ্রী আঙুলগুলো ঢুকিয়ে দিয়ে চাপ দেয়। রূপাও চাপ দেয়। চাপে চাপে কেঁচোর মতো আঙুলগুলো থেতলে যাচ্ছে।

'সামনের মাঘে নয় সামনের বৈশাখে আমরা বিয়ে করবো।' ট্রামের শব্দ মিহিরের কথা টেনে নেয়। কিন্তু কথাটা একজন শোনে। তার নাম রূপা ঘোষাল, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, স্লিম, এম. এ. পাশ, সঙ্গীতজ্ঞা. সুগঠনা, উচ্চতা পাঁচ ফুট এক ইঞ্চি।

—

□□□ প্রিজন ভ্যান □□□

রাস্তা দিয়ে অতিদ্রুত হাঁটতে হাঁটতে হোচটের দরুন অথবা ছুটে গিয়ে মোটারোগা মানুষ ঠেলে বাসের মুখস্থ হ্যাণ্ডেলটা ধরতে গিয়ে খোলা জুতোর এবং পায়ের আঙুলে মাড়িয়ে যাওয়ার দরুণ মুখ দিয়ে এক প্রকার অশ্লীল শব্দ বের হতে গিয়ে আটকে যায়, আমি না শালা ভদ্রলোকের সন্তান ছেঃ। এবং তার পরই প্রতিশোধ নেওয়ার স্পৃহাহীন বাটার তেজি জুতোটা বুকের ভেতরে শীতল রক্তের মতো যৌবন থাকতে যৌবন হারায়।

এরপরও একটা ব্যস্ততার ঠেলাঠেলি গোটা তিন চারজন যাত্রীর। গিয়ে দাঁড়াতে হবে এক চিলতে ফাঁকের ভেতর। তিন-তিনটে শরীর নিয়ে গোজাতে হবে সেখানে। কারণ কিছুটা সময় যৌবনের উত্তাপ পাওয়া যাবে দাঁড়াতে পারলে কাগজের ফুলের মতো মহিলার কাছে। 'সামনে অনেক জায়গা আছে এগিয়ে যান' এ ধরনের মাছিবসা পচা খতের মতো বিবৃতিগুলো আর তেমন সাড়া জাগায় না এইসব হঠাৎ বোবা কালা সেজে যাওয়া কতিপয় যাত্রী জনসাধারণের কাছে। অবশেষে যুৎসই একটা জায়গা পাওয়া গেল কোনরকমে দাঁড়িয়ে থাকার। রাস্তা থেকে দৌড়ে দেখা কাগজের ফুলের মতো সজ্জিত মহিলা বাসের মধ্যে এখন আমার নাভির কাছেই। হুর রে, হুর রে একটা পাশবিক উল্লাস বুঝতে পারি, হায় দমাতে পারি না। শালা সংসারের অভাবে অনটনে থাকতে থাকতে এতোদিনে বিয়ে কাকে বলে হে, ভুলে গেছি। বিপ্লব কাকে বলে হে, ভুলে গেছি। শ্লীলতাবোধ কাকে বলে হে, ভুলে গেছি। সৌজন্যবোধ ভদ্রতাবোধ আত্মসম্মান বোধ কাকে বলে হে, ভুলে গেছি। এমন কি একটু আগে পায়ের একটা আঙুল ছড়ে যাওয়া জ্বালাটাও ভুলে গেছি হে। এমনকি পেছন দিয়ে অশ্লীল মন্তব্যের ছুরি-কাঁচি চালিয়ে যারা আমাকে ইচ্ছাকৃত ভাবে ঠেলে যাচ্ছে, তাদের প্রতি আমার কোন ক্রোধ ফণা তুলে দাঁড়ায় না। বরং পেছনের ঠেলাঠেলিতে তলপেটটা মহিলার ঝোলানো হাতটায় দুএকবার আছড়ে পড়তে চায়। শরীরটা চিন্ চিন্ করে ওঠে।

স্লো-পয়েজনাস্ কি একেও বলা যায়? জনসংখ্যা বাড়ছে, বাসের সংখ্যা কমছে। ঠেলেঠুলে ছেলেমেয়ে উঠে পড়, যেতে তো হবে, কিছুটা সময়তো নষ্ট যৌবনের ইতরামোতে মজে থাকা যাবে। তখন মাথার ভিতর বিষের মতো চিন্তা-ভাবনাগুলো যৌবনের ঈষৎ উষ্ণ জলে চুপসে যাবে।

এমন কায়দা করে চামড়ার ফোলিও আমি ধরেছি যাতে আমার বুড়ো আঙুল দিয়ে মাঝেমধ্যে মহিলার নগ্ন বাহুতে চাপ দেওয়া যায়। দুর্ শালা আমাকে সন্দেহ করবে কে? টেরিলিনের সার্ট গায়ে,টেরিকটের প্যাণ্ট, চোখে চশমা,

এবং ডান হাতে স্টেটস্‌ম্যান। আমি আর এখন কেরানি নই। আর তাছাড়া মহিলা এখন কাঠের পুতুল মাইরি। একটু নড়লে বা বড়বড় চোখে তাকালেই না হয় সরে পড়া যাবে। আট বছরে বাসে যাতায়াতের ইতিহাসে শহুরে যাত্রীর নাড়ি-নক্ষত্র টুকরো টুকরো করে বিশ্লেষণ করা আছে চরম অভিজ্ঞতার চোখ দিয়ে বুদ্ধি দিয়ে।

বাসটা যেন ক্ষুধিত পাষাণের সেই পাগলটার মতো ছুটছে 'তফাৎ যাও, তফাৎ যাও। সব ঝুট হ্যায়'! অফিস টাইমে এ রকম রাস্তা খালি, মাসে একবার পাওয়া যায় কি না ভাবতে হয়। ধুত্তোর, কলকাতার সব বাস ট্রাম লরি ঠেলা টেম্পো আজ গেল কোথায়। অবশেষে শরীরের ঘাম শুকিয়ে যায়। মনে হয় রাস্তার দুপাশের হাওয়া এতোক্ষণে বাসে খেলে বেড়াচ্ছে। কলারগাদির মতো একগাদা মানুষ আটকে রেখেছিল বাতাসকে। বাসের ওজন কমে গেছে। বেশ হালকা হালকা বাস ছুটছে। হঠাৎ মনে হল অতিপরিচিত রাস্তার চলন্ত ফুটপাত দেখে, এইতো ডালহৌসি স্কোয়ার।

আমাকে এখন নামতে হবে। তারপর একটা সিগারেট কিনতে হবে। চিরুনি বের করে চুলে ঠিক করতে হবে। রুমাল বের করে চোখ মুখ ঘাড় মুছতে হবে। অবশেষে কায়দা করে হেঁটে অফিসের সেই কাঠের চেয়ারে বসতে হবে। 'হরি একগ্লাস জল' তিনশ পয়ষট্টি দিন গুনিতক আট বৎসর ছুটি বাদে এতাবৎকাল ধরে একই গলার নবটা ঘুরিয়ে দাও একই সময়ে, হরি এক গ্লাস –

আমাকে না নামিয়ে দিয়ে দেশলাই কাঠি মনের ভিতর জ্বালিয়ে দিয়ে বাসটা ফস্‌ করে দ্রুত পার হয়ে গেল ডালহৌসি। এর পরই আমার শরীরটা অবসাদে নিমগ্ন হতে চায়। বিষের মতো চিন্তাভাবনাগুলো কেমন যেন সার্ফের গুড়ো হয়ে যায়। আর কার যেন একটা কর্কশ সংসারী হাত তলায় নড়তে থাকে। গুড়া সাবানের ফেনার মতো চিন্তা-ভাবনাগুলো ক্রমশই ফাঁপা হয়ে যায়।

'ভাল্‌ লা গে না আজ আর অফিস' আমি জানি বারবার ফিরে ফিরে আসবে আমার ইচ্ছার প্রাচীন শব্দগুলি। 'আমার এখন কয়টা ছুটি পাওনা আছে বড়বাবু' এইসব দগ্‌দগে চিন্তাভাবনার উপর আমি এখন মলম লাগাতে চাই। 'প্রায়ই এভাবে অফিস কামাই করলে, লেটে এলে · ' বড়বাবুর খিচুনি দাদের মতো চুলকায় এবং আমি শালা আট বছর কাজ করেও কেরানিই থাকবো, আর চিরকাল স্টেটসম্যান হাতে নিয়ে ফর্সা প্যান্ট সার্ট লাগিয়ে নকল দাঁতের মতো অফিসার অফিসার খেলে বেড়াব। কিশোরকালেও বড়লোক খেলা খেলেছি যথা, আমি আমেদ তুই পঙ্কজ রায়, আমি উত্তমকুমার তুই দিলীপকুমার, আমি টাটা তুই বিড়লা। এখন বাসের ভিতর হাওয়া খেলে বেড়াচ্ছে। ঘামে ভেজা ভেতরের গেঞ্জি একটু একটু শুকিয়ে যাচ্ছে। অফিস অঞ্চল পিছনে ফেলে রেখে

আমি মনের লাগাম ছেড়ে ঘোড়া ছুটিয়ে বসে আছি। বাসে এখন একটি মাত্র রোগা মহিলা বাচ্চা কোলে বসে আছে। তিনি ঝিমোচ্ছেন। কার্জনপার্কটা এখন বুঝি সুরেন্দ্রপার্ক ঘুরে বাসটা এসে থামল চৌরঙ্গি। সেখানে নেমেই বাঁ পায়ের আঙুলটা একটু দেখার সুযোগ পেলাম।

বাসস্টপের সামনে কাগজের ফুলের মতো যুবকযুবতীরা পৃথক পৃথক ছড়ানো ছিটানো। একজন রঙচঙে যুবতী যেন কেমন কেমন সন্দেহ হয় পর পর তিনচারটে বাস ছেড়ে দিল তবু দাঁড়িয়ে আছে। নেক্স্ট জেনারেশন থেকে আমার মতো কোন মিইয়ে যাওয়া যুবক একা একা দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েদেরকে সটান বলবে: ভাল্ লাগে না এভাবে একা একা। চলুন বেড়ানো যাক। তারপরই হয়তো হাত ধরাধরি করে হাঁটতে থাকবে। আমি আর কতটুকু সাহস দেখাতে পারি, না হয় পাশেই দাঁড়ালাম। সিগারেট ঠোটে রেখে পাশে দাঁড়াই। এখন আমি কি বলতে পারি: চলুন বেড়ানো যাক।

সে যদি উত্তর দেয়: একজন লোক আসবে। সে আমাকে নিযে আমোদ করবে। সে আমাকে টাকা দেবে। সেই টাকায় আমি হাসপাতালে যাব। সেখানে আমার সন্তান মৃত্যুর দিন গুণছে।

এখন এই মহিলা উল্টে যদি আমাকেই প্রশ্ন করেন: আচ্ছা আমার সন্তান যদি একবার বেঁচে যায়। সে কি কোনদিন ভালভাবে বাঁচতে পারবে?

তখনই আমার মুখ দিয়ে ফস্ করে বের হয়ে যাবে: ও রকম স্বপ্ন আমার মা দেখতেন। ভারতবর্ষের দরিদ্র মায়েদেব একই স্বপ্ন ছেলেকে বড়লোক করে গড়ে তোলা। বরং চলুন বেড়ানো যাক, ফুর্তি করা যাক, আপনার শরীরে প্রচুর পরিমাণে ফুর্তির উপাদান আছে।

এসব উদ্ভট-কল্পনা পরিকল্পনা আমাকে টেনে নিয়ে যায় মহিলার খুবই কাছে। কি আশ্চর্য, মহিলা নড়ছেচড়ছে না। এইতো টান টান সময় চোখ টিপে দেওয়ার। এইতো সময় কথা বলার। উঃ আজ কি গরম রে বাবা। আপনার কি মনে হয়? : অথবা আজকাল এই হিপিদের দেখে, যতসব আমেরিকার গুপ্তচর, সিয়ার লোক অথবা, আচ্ছা আপনি একা অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছেন কেন? সত্যি হাসপাতালে যাবেন? কথাগুলো আমি চিবোতে থাকি। অথচ বলতে পারি না। সাধারণত সন্ধ্যার পর এভাবে অনেক মহিলা দাঁড়িয়ে থাকে। সন্ধ্যার পর কয়েক ঘণ্টার বা সারারাতের জন্য কিছু কিছু মেয়ে ভাড়া পাওয়া যায়। কিন্তু এখন, এই দুপুরে? কেন? ক্রমশ সিগারেট শেষ হয়ে আসে। আর একটা সিগারেট ধরাব কি ধরাব না ভাবছি এমন সময় এক কিশোর এসে কি যেন বললো মহিলার কানে আর তার পরই সজ্জিত মহিলা কিশোরকে ফলো করল।

রোদ্দুর যেন অতি দ্রুত গতিতে আকাশ-উঁচু বিল্ডিং ছুয়ে চৌরঙ্গির পশ্চিম

ফুটপাথের দিকে এগোচ্ছে। হঠাৎ একটা কাকের ডাক শুনতে পেলাম। এমন সময় হাতের কাছে একটি সুন্দর হোক কুৎসিত হোক, মোটা হোক রোগা হোক, কালো হোক ফরসা হোক, মেয়ে পেলেই সময় চলে যেত, দ্রুতগতিতে রোদ্দুরের সাথে পাল্লা দিয়ে।

আর দাঁড়িয়ে থাকতে ভাল লাগছে না। পা দুটো যেন কেমন অবশ হয়ে আসছে। আকস্মিকভাবে সাড়ে এগারোটা বেজে গেল। ক্রমশই যেন বুকের ভেতরটা হালকা হয়ে আসছে। বহুদিনের লালিত ধূসর নিশ্বাস ক্রমশ ধোঁয়ার মতো পাক খেতে খেতে বের হয়ে যাচ্ছে। সাদা মেঘের ভিতর দিয়ে এরোপ্লেন চলে গেল। পথের মাঝখানে সাদা দাড়ি মুসলমান বুড়োর কাছে একটা কালো গাড়ি প্রচণ্ড শব্দ করে ব্রেক কষল। তারপরই পাশ কাটিয়ে চলে গেল।

একটি একটি করে ডালমুট মুখে পুরতে পুরতে দুজন জিনস্-পরা কিশোরীর উদ্ধত বুক এগোচ্ছে। ওদের হাইহিলের জন্য বুক উঠছে নামছে। ওরা দ্রুত হাঁটছে, আমিও দ্রুত হাঁটছি। ওদের পিছু পিছু আমি এখন। ট্যাক্সি। ট্যাক্সিইইইই। একটা ট্যাক্সি এসে যায়। ঠিক সেই সাদা দাড়ি বুড়ো মুসলমানটার মতো ড্রাইভার। এই কোলকাতা শহরটা তোমাকে ঘুরতে হবে। যখন খুশি বলবো থামো হে, থামবে। যখন খুশি বলবো, চালাও হে, চালাবে। বুড়ো মাথা নেড়ে সম্মতি জানায়। এই নাও দশটাকা। ট্যাক্সির দরজা খুলতেই শব্দ হয়। নীলকিশোরীকে বলি ঃ তুমি আগে যাও। সে যায়। মাঝখানে আমি। তারপর লালকিশোরীকে বলি ঃ এসো। বাঁ পাশে লালকিশোরী। নীলকিশোরীর হাতে বুবয় আইসক্রীম। সে আইসক্রীম চুষছে। লালকিশোরীর হাতে ক্যাডবেরি। সে ক্যাডবেরি চুষছে। আমার দুহাতে দুটো একশ টাকার নোট। লালু লা লা লা নীলকিশোরী গাইছে। লা-লা-লা লালকিশোরী গাইছে। আমি তখন ওদের বুকে হাত দিয়েছি। কাছে টেনেছি।

ট্যাকসি একটা পনরতলা উচু হোটেলের কাছে এলো। বললাম ঃ থামো হে। পাঁচ টাকা ধরো, আমি না আসা পর্যন্ত থাকবে। নাইস্ রুম। যামিনী রায়ের পেণ্টিং। নীলকিশোরী বলে। ওয়াণ্ডার ফুল। গগ্যার অয়েল পেণ্টিং। লালকিশোরী বলে। আমি বলি ঃ এই ধরো তোমার একশ। এবার তোমার পোষাক খুলে ফেল। লা লা আ আ নীলকিশোরী গাইছে পোষাক খুলছে। আমি সে সময় লং প্লেয়িং চালিয়ে দিই। অলিভারের মিউজিক হচ্ছে। হাউ নাইস—নীলকিশোরী আমাকে জড়িয়ে ধরে চুমো খেল। হাউ চয়েস—লালকিশোরী আমাকে জড়িয়ে ধরে চুমো খেল। টাট-টা-টাবে টা টা টা টা নীলকিশোরী লালকিশোরী ফ্যাগিনের নাচ শুরু করে দিল। সামনেই ছিল মদের বোতল। ঢক্ ঢক্ করে মদ খেয়ে নিলাম। ওরাও খেল

দেখলাম। আমার পা টলতে লাগল। হঠাৎ লালকিশোরীর বুকের ধাক্কায় আমি পড়ে গেলাম। আমি হাত বাড়ালাম শূন্যে।

যে আমার হাত ধরে তুললো, দেখলাম সেই সাদা দাড়ি বুড়ো মুসলমানের মতো সে। উফ্ কী ভীষণ কল্পনা। রাস্তায় হোচট না খেলে আরও কিছুক্ষণ কিশোরীদের বুকে জড়িয়ে নিয়ে অপরাহ্নের রোদের মতো আমার ফাটা যৌবনে আকণ্ঠ নিমজ্জিত থাকা যেত। কী ভীষণ দ্রুত হাঁটিতে হাঁটিতে পার্কস্ট্রিটের পার্ক হোটেলের কাছে চলে এসেছি। পকেটে অন্ততপক্ষে একটা দশটাকার নোট থাকলে কিশোরীদের পিছু পিছু না হয় পার্ক হোটেলের ভিতরে ঢুকে যাওয়া যেতো।

বুঝতে পারলাম রক্ত মাংসের শরীরটা এখন মোহাচ্ছন্ন। বুঝতে পারলাম, রাস্তা পার হতে গিয়ে এখন যদি কোন গাড়ি আমাকে চাপা দিয়ে চলে যায়, তাহলেও এই সময় মৃত্যুর জন্য আমার কোন আক্ষেপ থাকবে না। আর অন্য সময় সর্বদাই আমি মৃত্যুকে ভীষণ ভয় পাই। অবশেষে রাস্তা পার হয়ে ট্রামে উঠে চলে আসি শহীদ মিনারে। সেখানে বসে খানিকক্ষণ স্বাভাবিকভাবে নিশ্বাস নেওয়া যাবে।

শহীদ মিনারে ছায়ার দিকটায় অনেকে বসে আছে বড়ই একা, অনেকে শুয়ে আছে, এমন কি দুজন তিনজন মিলে এখন কেউ আর গল্প করছে না, কোথাও আড্ডা নেই, সবাই চুপচাপ ঝিম ধরা, চুপচাপ বসে কি যেন একটা সর্বদাই ভেবে চলেছে, সবাই কি সহজে বড়লোক হওয়ার পথ ভাবছে, সবাই কি দুঃখের কথা ভাবছে, সবাই কি স্বপ্নময় সুখবাজোর কথা ভাবছে, সবাই কি মৃত্যুর কথা ভাবছে, সবাই কি একটা অজানা ভয়ে গুটিয়ে ফেলছে নিজেকে। আসলে সবাই এখন শহীদ মিনারের ছায়ার চাদর গায়ে জড়িয়ে ছড়ানো ছিটানো নির্জন পাথরের মতো শহীদ হয়ে বসে আছে।

'প্রিয় জনগণ, এটা বসে বসে ভাববার যুগ নয়, এটা সংগ্রামের যুগ। আমাদের সংগ্রাম করতে হবে। এই সংগ্রাম গণতান্ত্রিক সংগ্রাম। লড়াই-এর জন্য আপনাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। আমাদের সম্মুখে এখন সমূহ বিপদ। মেহনতি মানুষের সংগঠনকে আরো শক্তিশালী করে তুলতে হবে। প্রিয় জনগণ, আমরা গণতান্ত্রিক বিপ্লব চাই। সঠিক নির্বাচনই হচ্ছে সেই বিপ্লবের একমাত্র পথ। আসুন·· '

দূর শালা, এই শহীদ মিনারে বসলেই লঙ্কা দিয়ে ছাতুমাখা ঝাল গলায় বক্তৃতা সুড়সুড়ি দেয়। অদূরে গাছের তলায় বসে চকচকে পিতলের থালায় ছাতু গিলছে বাঁ হাতে ধরে পিতলের ঘটি থেকে জল দিয়ে। হ্যাঁ, অফিসে প্রোগ্রেসিভ পার্টি য়ুনিয়ন আমি করি বটে। তবে এক্টিভ মেম্বার নই। নিম্নলিখিত স্বার্থগুলি সেখানে ঘামে ভেজা ময়লা গেঞ্জির মতো জড়িয়ে আছে।

(১) আমার মতো এক কেরানির মতে প্রোগ্রেসিভ পার্টি হচ্ছে একমাত্র মাধ্যম যেখানে লেখাপড়া না শিখেও প্রগতিশীল, ইনতেলেকচুয়াল ও শিক্ষিত হওয়া যায়। যেহেতু আমি ডিগ্রী পরীক্ষায় দু-তিনবার ফেল মেরেছি, সেহেতু লেখা-পড়া আমার দ্বারা আর হবে না ভেবে জনপ্রিয় দাদা হওয়ার চেষ্টায় দলের দাদাদের সাথে আড্ডা মারি। আমার ধারণা সমাজের কিছু বোকা লোক আমাকে এখন শিক্ষিত প্রগতিশীল তার্কিক ভেবে সম্মান করবে ও মর্যাদা দেবে।

(২) আট বছর চাকরি করেও আমার প্রমোশন হবে না আমি বুঝতে পারি। প্রথম প্রথম অনেক অফিসারের পায়ে, আমার একান্ত সবিনয় নিবেদন I beg most respectfully এরকম কিছু তৈলাক্ত শব্দের পুষ্পার্ঘ প্রদান করেছি। আমার এই চাকুরি হয়েছিল দশ টাকা ঘুষের টাকায়, যোগ্যতার বিচারে নয়। অবশেষে অফিস য়ুনিয়নে ঢুকে একটা কিছু স্থান করে নেওয়ার চেষ্টা করছি। যদি প্রমোশন লেগে যায়।

(৩) আমার এই ইচ্ছামতো যাওয়া আসার পরও আমার সুখের চাকরিটা যাতে বজায় থাকে, আমি ও আমার পরিবার শান্তিতে কোনরকমে খেয়ে পরে আমাদের জেনারেশনটা কাটিয়ে দিতে পারি, সে জন্য য়ুনিয়নের সাথে যোগ রাখি।

(৪) আমার ঘুষ নেওয়ার ব্যাপারটা যাতে অতি গোপন থাকে তার জন্যও আমাকে এইসব দলবাজী করতে হয়। যদিও ডিপার্টমেণ্ট এখন পাল্টে দিয়েছে সাময়িকভাবে।

(৫ যদি শালা একবার অফিসার হয়ে যেতে পারি…

*হরি রোজ রোজ এভাবে যদি লেট কর।

স্যার পঞ্চম বাচ্চাটার হাম হয়েছে, হাসপাতালে আউটডোরের ব্যাপারটা তো জানেন স্যার।

*আপনার কি ব্যাপার, ও ভাবে আমার পা জড়িয়ে আছেন কেন ?

স্যার আমার প্রমোশনটা।

*প্রমোশন! কি কোয়ালিফিকেশন্ আছে আপনার ? গেট আউট।

স্যার আমাদের দেশের সরতলা ঘি। গন্ধটা একবার শুকুন, শুকুন না স্যার। মা নিজে হাতে তুলেছেন।

• উফ্ হোপলেশ, আপনারা অফিস ডিসিপ্লিন মেনটেন্ করেন না কেন ? বাড়িতে আপনার বৌমার (আমার সুশিক্ষিত স্ত্রী) কাছে রেখে আসবেন।

স্যার য়ুনিয়নের তরফ থেকে আমাদের একটি মিটিং-এ

* দেখুন আর কেন ? জানেনইতো আমি য়ুনিয়ন ছেড়ে দিয়েছি।

এভাবে যতসব অসম্ভব অসম্ভব বাসি চিন্তা-ভাবনা আমার মাথায়

কাঠালের আঠার মতো যতই জড়িয়ে যাচ্ছিল, ততই আমার ঝিমুনি আসছিল। হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি, এখন প্রায় তিনটা।

অদূরে কয়েকটি কাক মরা এক বস্তুকে ঠোঁট দিয়ে টানাটানি করছিল। চতুর্দিকে এতো রোদ্দুর টানটান করে ছড়ানো আছে যে আমার নাকে রোদ্দুরে হাওয়া লাগায় জ্বালা জ্বালা করছিল। একটা দীর্ঘ হাই তুলি, মুখ দিয়ে বিশ্রী গন্ধ বের হয়। অনেকক্ষণ সিগারেট টানা হয়নি। দুহাত উপরে তুলে কোমরটা বেঁকিয়ে আড়মোড়া ভেঙে উঠে পড়ি। ডান পকেটে হাত ঢুকিয়ে দেখি নেক-টাইটা ভালভাবেই ভাজ করা আছে। মনে হয় বাঁ-পকেটে ব্যাগের ভেতর সাড়ে তিনটাকার মতো আছে। গুণে দেখা গেল পনর পয়সা কম। এরপর একটা অশ্লীল ইচ্ছা ষ্টেটস্‌ম্যানটাকে আমার চোখের সামনে তুলে ধরে। তিন টাকা পয়ত্রিশ পয়সা আমার অশ্লীল ইচ্ছাকে দমন করতে পারে একমাত্র লাইট-হাউসের ফিল্মফেষ্টিভ্যালের এডালট্‌স্‌ পিক্‌চার।

ভাবনা আমাকে পার করিয়ে দেয় অতিদ্রুত লম্বা রোদ্দুরের পথটা। ছায়া খুঁজে খুঁজে ফুটপাথ চলতে চলতে চলে আসি লাইটহাউসে। কাউণ্টারে দেখি সাত এবং দশ তারিখের টিকিট পাওয়া যাচ্ছে না। কারণ ঐ দিন দুটো 'এ' মার্কা ছবি। আমার মতো অশ্লীল ইচ্ছা অনেক ইন্‌তেলেক্‌চুয়ালদের আছে ভেবে পুলকিত হই। অথচ আজ ছয় তারিখ। প্রচুর টিকিট পাওয়া যাচ্ছে। আজকের বইটা একটা রুগ্ন শিশুকে নিয়ে মায়ের হৃদয় শূন্যতার গল্প। কোন সেক্স নেই। এসব বলাবলি চলছে। ভাল্‌ লাগছে না এখন এই বই দেখতে।

মাতৃত্ব কি বস্তু আমি জানি না। পিতৃত্ব কি বস্তু আমি তাও জানি না। কারণ বাল্যকাল থেকেই আমি অন্ধকার দেখেছি চতুর্দিকে। খুপরি ঘরের টালির ছাদের ওপর দিয়ে সূর্য যক্ষ্মারোগীর মতো খুক খুক চলে যেত, আমরা টের পেতাম না। হয়তো একটা মেঘাচ্ছন্ন দিন বয়স্ককুমারী পাত্রীর মতো চুপটি করে বসে থাকত আমাদের টালির ছাদের ওপর। আমরা টের পেতাম না। বস্তুত বাল্যকালের বেশ কয়েক বছর পর জানতে পেরেছি, আকাশে একটা তেজি সূর্য থাকে। সে আলো দেয়।

'আয় আয় চাঁদমামা টিপ দিয়ে যা কিম্বা সূয্যি মামার বিয়ে টোপর মাথায় দিয়ে', এ ধরনের বিলাসি ছড়াগুলোও যেন দরিদ্র মায়েদের জন্য নয়। এসব ছড়া কেমন যেন একটা সুখী সুখী জীবন সংসারে প্রতিষ্ঠিত মায়েদের ব্যবহারে ছড়িয়ে আছে যেন কানে গোঁজা আতর যেন খোপায় দেওয়া যুঁই ফুল যেন সুগন্ধি পানচিবোনো। আসলে জন্মাবধি আমি মায়ের যৌবন মায়ের হাসি দেখিনি। ছেলেবেলায় পেটে প্রচণ্ড খিদে জিইয়ে রেখে আমি থেমে গেছি প্রজাপতির পিছনে ছুটতে। গিয়ে দেখতাম কতিপয় বিলাসি ছেলেরা কি দুরন্ত ছুটছে। আমি কোনদিন বাল্যকালে সবুজ ঘাসে ভরা শিশু উদ্যানে ঘুরে

বেড়াইনি, দেখতাম মায়ের হাত ধরে ছেলেরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমার মা আমার বাবা চিরকাল স্বপ্ন দেখতেন আমাকে নিয়ে অর্থের স্বপ্ন, বড়লোক হওয়ার স্বপ্ন। কিন্তু কোনদিন দরিদ্রতার প্রতি আক্রোশ দেখিনি, দেখিনি কোনদিন বড়লোকের বিরুদ্ধে আস্ফালন। বরং কোন ধনী ব্যক্তি বাড়িতে পদার্পণ করলে নিজেদেরকে ধন্য মনে করতেন, সেদিন কষ্টের অনেক পয়সা খরচ হয়ে যেত। আজ বুঝি, কয়েক বছর আগে এসব বুঝতাম না কারণ আমিওতো সেই মা-বাবারই ছেলে। আমিও ধনীলোক হওয়ার স্বপ্নে আকণ্ঠ নিমজ্জিত এখনও। সেই পরিবারের ইচ্ছা অনিচ্ছার সাথে আমার রক্ত প্রবাহ একই খাদে বয়ে চলেছে। তারপর বয়স বাড়ছে চিন্তার সাথে সাথে, সূর্যের ঘোড়া ছোটাতে অক্ষম আহত মন রেসের ঘোড়া ছুটিয়েছে।

পাপপুণ্যের ক্রীতদাস হয়ে চলতে চলতে আমার রক্ত প্রবাহে এখন আইসক্রীম ভাঙার শব্দ শুনতে পাই। আসল কথা, মেয়ে মানুষের শরীরের কাছে যেতে পারলে ইতিহাসের শব্দগুলো বোবা হয়ে যায়।

এখন ষ্ট্র লাগানো ঠোটের ফাঁক দিয়ে শীতল সরবতের তরল পদার্থ নিঃশব্দে কণ্ঠনালী বেয়ে নিচের দিকে আরও নিচের দিকে চলে যায়। সে সময় আমার চোখের দৃষ্টিস্রোত কাগজের ফুলের মতো মেয়েদের বুকে ঠোকর খেতে খেতে নির্ভার এগিয়ে চলে। একগ্লাস মশলা দেওয়া শীতল পানীয় সময়ের কাছে বাজি রেখে আধঘণ্টাতেও শেষ হয়ে যায়।

এই যে ট্যাক্সি ছুটছে গাড়ি ছুটছে বাস ছুটছে বাইক ছুটছে পুরুষ ছুটছে মহিলা ছুটছে যুবকযুবতী ছুটছে দোকানের আলো ছুটছে বিজ্ঞাপন জ্বলছে নিভছে, রিক্সা ছুটছে, আমি ছুটছি, তুমি ছুটছো সে ছুটছে, বালক-বালিকা ছুটছে কিশোর কিশোরী ছুটছে, তোমরা ছুটছো আমরা ছুটছি তাহারা ছুটছে, কেরানি ছুটছে বড়বাবু ছুটছে ব্যবসায়ী ছুটছে ছাত্রছাত্রী ছুটছে আতুর খোঁড়া ছুটছে পকেটমার ছুটছে খুনী ছুটছে বেশ্যা ছুটছে ডাক্তার ছুটছে অফিসার ছুটছে খেলোয়াড় ছুটছে তিনি ছুটছেন আপনি ছুটছেন অধস্তন কর্মচারি ছুটছে, গাঁয়ের লোক ছুটছে, সাহেব-মেম ছুটছে মারোয়াড়ী-পাঞ্জাবী মাদ্রাজী ছুটছে ফুটপাথের হকার ছুটছে ক্রেতা ছুটছে দালাল ছুটছে, পুলিস-পুলিসের লোক ছুটছে, নর্তকী ছুটছে গায়িকা ছুটছে রোগী ছুটছে এম্বুলেন্স ছুটছে মিলিটারি ভ্যান ছুটছে……আমার ভীষণ ইচ্ছে এদের মধ্যে একটা অজানা চরমতম দুর্ঘটনা ঘটে যাক। তখন সবাই চমকে উঠবে এবং একসাথে বলে উঠবে ঃ এ রকম হওয়ার তো কথা ছিল না। হল কি করে? স্বপ্ন নাকি? সে সময় কি শহীদ মিনার থেকে কোন নেতার কণ্ঠস্বর শুনতে পাওয়া যাবে ঃ প্রিয় নাগরিক আমাদের দুর্ঘটনা ভাল লাগে না। আমাদের কোন বিপদ ভাল লাগে না। আমরা এক আকাশ শান্তি চাই, সম্প্রীতি চাই।

কখন যে আমার চতুর্দিক হতে বিকেল পালায়, বুঝি না। 'ওহে চলমান নগরবাসিগণ মাথার উপর একটা আকাশ আছে নাকি? বিকেলবেলায় পাখিরা ঘরে ফেরে নাকি? গোধূলি হওয়ার কোন সময় আছে নাকি?

পার্ক স্ট্রিটের রাস্তা পুনরায় আমাকে টেনে আনে বুকের ভেতর পুষিয়ে রাখা পুরাতন অশ্লীল ইচ্ছাকে। আলোর সমুদ্রে ভাসমান পার্ক স্ট্রিটের কাছে জানতে চাওয়া বৃথা, এখন সন্ধ্যা না রাত্রি। পার্ক স্ট্রিট আমার সেই পরিচিত অন্ধকারকে কৃত্রিম আলোর মশাল জ্বালিয়ে ঢেকে রাখতে চাইছে। চুরুট টানতে টানতে অসম্ভব দার্শনিকদের মতো সজ্জিত পুরুষগুলো গাড়ি থেকে নেমে আসে, তারপর পিছু পিছু নামে কাগজের ফুলের মতো মহিলাগণ, নিমেষে ঢুকে যায় বার-হোটেল রেস্তোরার গহবরে। দ্রুত পথ চলতে চলতে অনেক যুবক যুবতী ফুল ঝরে পড়ার মতো নিঃশব্দে চলে যায় বার রেস্তোরার ভিতর। দারোয়ান দরজা টেনে ধরলে শব্দ হয় না। কোথায় যেন উগ্র বিদেশি বাজনা চলছে। কারা যেন এখন পোষাক খুলতে খুলতে নেচে চলছে। কারা যেন এখন দামি দামি খাবার খেয়ে চলছে। আর কে যেন মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে গান গেয়ে চলছে। আর বাস্তবে পরাজিত আমি এদের দুপাশের মধ্যিখান দিয়ে বুকে স্বপ্নের ব্যাজ পরে চলছি ফিরছি রাস্তার মেয়েছেলে দেখছি।

হঠাৎ কানের কাছে যাবেন নাকি স্যার? তাকাতেই দেখি অতি পরিচিত একটি লোক। লোকটা পান চিবোচ্ছে। পাজামা ও এলাহিবাদি কাজ করা পাঞ্জাবি,—গিলে করা খোলাহাত। চুলে সুগন্ধি তেলের গন্ধ, কানে গোঁজা আতর। অন্ধকারের আনাচে-কানাচে এরা ঘোরে ফেরে। 'যেতে তো ইচ্ছে হয় ভাই, পয়সা নেই।' হঠাৎ কথা বলে ফেলি। 'যা আছে ওতেই হবে। আমার পিছু আসুন।' আমার উষ্ণ শরীরটা, রোদে ভেজা অবশ স্নায়ুগুলো, শরীরে রক্তের নিঃশব্দ হৈ চৈ, বিন্দু বিন্দু ঘাম, মস্তিষ্কের ভিতর পোকার লড়াই, তলপেটে যন্ত্রণার গোঙানি, গঙ্গার জল না পাওয়া শুকনো যৌবনের খিদের আর্তনাদ, হাড়িকাঠে আটকানো কণ্ঠস্বরঃ এ আমায় কোথায় নিয়ে এলে নিশচার?

অদূরে প্রিজনভ্যান এবং কিছু পুলিশের পথে চলাফেরা। সাদা-পোষাকে সার্জেন্ট। হঠাৎ একটা নরক থেকে উঠে আসা শয়তানের কণ্ঠস্বর শুনতে পাই 'যা আছে দিন'। লোকটা হাত পেতেছে। আমার কণ্ঠ এখন যিশুখৃষ্টের মৃত্যুর পেরেকে বিদ্ধ। দুটাকা এবং কিছু খুচরো পয়সা না গুনে আমি দিয়ে দিই। লোকটা টাকাপয়সা পকেটে রেখে বলে 'আরও আছে, দিন দিন'। আমি দ্বিতীয়বার নরক থেকে উঠে আসা শয়তানের কণ্ঠস্বর শুনতে পাই। অবশেষে আমি পকেটমারের ভয়ে বহু যত্নে লুকিয়ে রাখা নাভির কাছে প্যান্টের ইনার খুদে পকেট থেকে পাঁচটা টাকা বের করে দিই নরক থেকে উঠে আসা আমাদের মতো এক শয়তানকে।

পাঁচটা টাকা হাতে তুলে দেওয়ার আগে ভেবেছিলাম একবার এই শয়তানের পা দুটো জড়িয়ে ধরে বলি : আমার এনেমিক মায়ের জন্য একটা রক্তের টনিক কিনবো। নিও না। দিয়ে দাও।

লোকটার মুখ আমাদের মতো কি না দেখবো ভেবে তাকিয়েছিলাম। কিন্তু লোকটাকে আর দেখতে পাওয়া গেল না। দেখতে পেলাম একটা পুলিশ আমার টেরিলিনের জামার কলার ধরেছে। তারপর আমাকে টেনে নিয়ে প্রিজন-ভ্যান-এ তুললো। আমি এখন সম্পূর্ণ শিথিল। আমার শরীরের ভেতর এখন রক্তের কোলাহল থেমে গেছে। ক্রমশ ক্রমশ চতুর্দিক থেকে একপাল ঘিনঘিনে মাছির মতো নোংরা অবসাদ আমাকে ছেঁকে ধরেছে। এখন আমার মনে কোন কথা নেই, বুকের ভিতর কোন ভাষা নেই। মন ঝিমিয়ে পড়েছে।

প্রিজন ভ্যানের ছোট ছোট জালের জানলা দিয়ে কিছু আলো প্রিজন ভ্যানের ভিতরের অন্ধকারকে ফুটো করে দিয়েছে। আমার মতো কতিপয় ভারতীয় নাগরিক দেখলাম প্রিজনভ্যান এ বসে আছেন। কয়েকজনের হাতে আমারই মতো চামড়ার পোর্ট ফলিও। আর কিছু ভদ্রেতর লোকজনও আছে। দেখলাম ফিসফাস দু-একটা কথাবার্তা চলছে বেশ স্বাভাবিকভাবেই। আমি আমার মতো ভদ্রলোকদের পাশে বসলাম। পেছনের দরজা বন্ধ করে বসে থাকে রাইফেল হাতে দুজন সেপাই। সাদা পোষাক কোমরে রিভলবার, মাথায় টুপি স্বাস্থ্যবান ব্যক্তিটি ড্রাইভারের পাশে। একটা ঝাঁকানি দিয়ে প্রিজন ভ্যান স্টার্ট নেয়। সেসময় পাশাপাশি বসা কয়েকজনের সাথে আমাদের ঠোকাঠুকি হয়। তবুও আমাদের মুখে কোন বিরক্তির চিহ্ন এঁকে দেয় না। সে সময় আমরা রুমালবিহীন মনের ভিতর মুখ লুকাতে চেষ্টা করি। এখন মনে হচ্ছে আমাদের কোনো কণ্ঠস্বর নেই, আমরা কথা বলতে পারি না। হঠাৎ যেন বুঝতে পারলাম আমাদের সারিতে কে এক মহিলা কাঁদছে। আমি প্রিজন ভ্যানের নৈঃশব্দের ভিতর যেন শুনতে পাচ্ছি একটানা কান্নার সি সি শব্দ। সে কি আমার মা। সেকি আমার ভাইবোনেরা।

যদিও প্রিজন ভ্যানের বাইরে পার্ক স্ট্রিট এখন পূর্ণ কোলাহলে। হোটেলে নর্তকীরা তীব্র মিউজিকের তালে তালে পোষাক খুলতে খুলতে নেচে চলছে, গায়িকা শরীর দুলিয়ে মাইক হাতে দীর্ঘ বিদেশি গান গেয়ে চলছে, ধনীলোকেরা রমণীসহ মদমাংস খেয়ে চলছে, যুবকযুবতীরা মিউজিকের তালে তালে হাততালি দিয়ে বেহুস নৃত্যে মগ্ন রয়েছে। আমি এ সব কথা যতই ভাবি ততই আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারি না, প্রিজন ভ্যানটার সামনে এখন বিরাট দুর্ঘটনা ঘটবে। প্রিজন ভ্যানটা দুমড়ে মুচড়ে ভেঙে যাবে। অনেকে কেউ মরে কেউ বেঁচে রাস্তায় ছিটকে ছিটকে পড়বে। পেছনের গাড়ি থেমে যাবে। গাড়ি থেকে নেমে লোকগুলো চারদিকে

ছুটবে নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য। সকল স্ত্রী-পুরুষ ভয়ে কাঁপতে থাকবে। নর্তকী নাচ থামিয়ে দেবে, গায়িকা গান থামিয়ে দেবে, হোটেলের ঘরে যৌনসঙ্গমে লিপ্ত পুরুষরা বেশ্যার মতো প্রিয় রমণীদের ঠেলে দেবে, পথের দুপাশের দোকান পাট বন্ধ হয়ে যাবে। মদমাংস পুরো শেষ না করেই ধনীলোকেরা ভয়ে পাথর হয়ে যাবে। চেঁচাবে দুর্ঘটনা দুর্ঘটনা।

রাস্তায় খালি গাড়ি থেমে থাকবে, দোকানের বাইরের আলো জ্বলতে থাকবে। বিজ্ঞাপনের আলো জ্বলতে থাকবে। ট্রামবাস থেমে থাকবে। যাত্রী থাকবে না একটাও। ট্র্যাফিক সিগন্যাল লাল হয়ে থাকবে। সেই ভীষণ ইচ্ছার ভয়ংকর দুর্ঘটনার জন্য সবাই জীবন রক্ষার জন্য পালিয়ে যাবে। পথে কাউকে দেখা যাবে না। জনমানবশূন্য পথঘাট।

একমাত্র আমি তখন ভাঙা প্রিজন-ভ্যানের খুপরি থেকে বের হয়ে আসবো। এবং প্যান্টের দুপকেটে হাত ঢুকিয়ে শিস্ দিতে দিতে আমার নন-এনেমিক মায়ের কাছে ফিরে যাব। তখন কি আর আমার ভাইবোনরা চল্লিশ বছরের দাদাকে বলবে 'তোকে তাড়াতাড়ি ফিরতে না দেখলে আমাদের বড্ড ভয় করে রে দাদা।'